বিশ্বায়নেরধারণাওইসলামীবিকল্প:একটিতুলনামূলকঅধ্যয়ন

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েপিএইচ.ডিডিগ্রিরজন্য উপস্থাপিতঅভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃশামছুলআলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮৫,শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন কর্তৃক দাখিলকৃত 'বিশ্বায়নের ধারণাও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রিরলক্ষ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ শামছুল আলম)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'বিশ্বায়নের ধারণাও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম বা এর অংশ বিশেষ কোনো প্রকার ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেইনি।

(মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪–২০১৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে, যাঁর অপার কৃপায় এই অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনেতা খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি, যাঁর পথনির্দেশনায় বিভ্রান্ত বিশ্বমানবতা ইসলামের চিরায়ত মুক্তির পথ পেয়েছে।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমার গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক কীর্তিমান শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম-এর প্রতি; যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমাকে চিরঋণী করেছে। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিফল দান করুন।আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ স্যারের নিকট। তিনি এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করেছেন ও উৎসাহিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোহাম্মদ জহির হোসাইন এবং মাতা রাহীমা বেগম, স্ত্রী ফাহমিদা সালমা, পুত্র সাবিব জাইয়ান,জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, সহকারি অধ্যাপক জনাব মোস্তফা কামাল, প্রভাষক মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম,প্রভাষক মোবারক হোসেন সহসকল বন্ধু, সতীর্থ, আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি যাঁরা এ কাজটি করার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন।

গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি যে সকল অগ্রজ লেখক–গবেষকের লেখা ও গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁদের সকলের জন্য জাযায়ে খায়ের কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমার এ কর্মটুকু কবূল করুন এবং এ গবেষণার সাথে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের মুক্তির উসীলা করে দিন। আমীন।

মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন

প্রতিবর্ণায়ন

أ–অ	ط-ত	ع-আ
ب –ব	ظ-য	ع-‘ই
ت –ত	ع-‘	يا-ইয়া
ث –ছ	غ-গ	ي-য়ি
ج –জ	ف-ফ	ي-ী
ح –হ	ق-ক	أي-ঈ
خ –খ	ك-ক	أُ-উ
د-দ	ل-ল	أي-ঊ
ذ –জ	م-ম	وَ-ওয়া
ر –র	ن-ন	يى-য়ী
ز –ঝ	و-ওয়া	وُ-উ
س –স	ه-হ	وُو-ঊ
ش –শ	ء-’	ي-ইয়া
ص –স	ي-য়	ا-আ
ض-দ/য	عُ-‘ই	عو-‘ঊ

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।যেসব আরবি শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে; সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম সম্ভব অনুযায়ী রক্ষা করা হয়েছে।

সংকেত বিবরণী

আ.	: আলাইহিস সালাম
আস-সুয়ূতী	: আবদুর রহমান ইবন আবু বকর
ইমাম আহমদ	: আহমদ ইবন হাম্বল
ইমাম বুখারী	: আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা
ইমাম মুসলিম	: মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী
ইমাম আবূ দাউদ	: আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী
ইমাম তিরমিযী	: আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা
ইমাম নাসায়ী	: আবূ আব্দুর রহমান
ইমাম তাবারানী	: আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমদ
ইবন মাজাহ	: আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ
ইফা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
কুরতুবী	: মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবূ বকর ইবন ফারাহ
রহ.	: রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	: রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
সা.	: সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
BRAC	: Bangladesh Rural Advancement Committee
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
ILO	: International Labour Organization
SAARC	: South Asian Association for Regional Co-operation
UNICEF	: United Nations Children's Fund
ADB	: Asian Development Bank
GDP	: Gross Domestic Product
WHO	: World Health Organization

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র	i
ঘোষণাপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
প্রতিবর্ণায়ন	iv
সংকেত বিবরণী	v
ভূমিকা	vi
প্রথম অধ্যায়: ইসলাম পরিচিতি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়: বিশ্বায়নের ধারণা ও স্বরূপ	৫১
তৃতীয় অধ্যায়: রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন	৬২
চতুর্থ অধ্যায়: সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন	১১২
পঞ্চম অধ্যায়: বিশ্বায়ন ও তৃতীয় বিশ্বের নতুন সংজ্ঞায়ন	১৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: গণযোগাযোগের বিকাশ ও বিশ্বায়নে গণযোগাযোগের ভূমিকা	১৭৩
সপ্তম অধ্যায়: বিশ্বায়ন সমাজ ও শ্রেণিপ্রসঙ্গ	২২৬
অষ্টম অধ্যায়: বিশ্বায়নের সংকট ও সম্ভাবনা	২৪৩
নবম অধ্যায়: বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ	২৭০
দশম অধ্যায়: ইসলামে বিশ্বায়নের ধারণা ও বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্প	২৯০
গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ ও প্রস্তাবনা	৩৩৪
উপসংহার	৩৪০
গ্রন্থপঞ্জি	৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি যুগে যুগে চাহিদানুযায়ী পথভ্রষ্ট লোকদের হিদায়াত করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

বিশ্বায়ন (Globalization) বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। গত কয়েক বছর ধরে 'বিশ্বায়ন' পরিভাষাটি পাশ্চাত্য থেকে অন্যান্য অনেক কিছুর মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র, সকল দেশে বিশ্বায়ন বলতে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমন্বয় গড়ে তোলাকে বুঝায়। অন্য কথায়, পণ্য ও সেবা চলাচলের ক্ষেত্রে সকল প্রকার রপ্তানি ভর্তুকি ও আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দিয়ে বা হ্রাস করে সারা বিশ্বকে একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রূপান্তর করাকে বিশ্বায়ন বলে। এই উদ্যোগ প্রথমে নেয়া হয় ১৯৪৭ সালে গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade) সৃষ্টির মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালে 'গ্যাট' এর উরুগুয়ে সম্মেলনের পরে জন্ম হয় 'বিশ্ববাণিজ্য' সংস্থা (WTO) নামে আরও একটা নতুন সংস্থা যা গ্যাট এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এই সংস্থার নামেই ২০০৫ সালের মধ্যে 'গ্যাট' নীতিমালা পূর্ণ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনেকের মতে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা যদি তার ঘোষণা অনুযায়ী নীতিমালার আলোকে কাজ করতে সমর্থ হয়, তবে তাতে মুসলিম বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ যথেষ্ট উপকৃত হবে।তাদের বাণিজ্য আয় বেড়ে যাবে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাড় ও ব্যবহার সম্ভব হবে, শ্রমিক চলাচল অবাধ হবে এবং বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ পাওয়া সহজ হবে।

দরিদ্র দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির কল্যাণকর কোন উপাদান বিশ্বায়নের মধ্যে অদ্যবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটাকে বরং উপনিবেশবাদের নতুন সংস্করণ বলে মনে করেন অনেকেই। কেননা, বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রায়ণের একটি নতুন ধরন। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ধনী দেশগুলোর পুঁজি ও পণ্য বিশ্বের সর্বত্র অবাধে সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে, দরিদ্র দেশগুলোর একমাত্র সম্পদ শ্রমশক্তি অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করবেনা। এজন্য দরিদ্র দেশগুলোর দর কষাকষির ক্ষমতা থাকবে না। ড. মাহাথির মোহাম্মদের মতে: বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ বিশ্বের সকল দেশকে একটি অভিন্ন সত্তার আওতায় নিয়ে আসা। দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল ও তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করাই এর লক্ষ্য। গতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতির আলোকে ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের ধারণা উদ্ভাবন করে।

কিন্তু বর্তমানে পুঁজির অবাধ সরবরাহ এবং পণ্য বেচাকেনা ও সেবার উপরই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশি। তবে পণ্যের অবাধ গতির মত মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের অবাধ প্রবাহ সম্ভব নাও হতে পারে।

পাশ্চাত্য থেকে বিশ্বায়নের যে আওয়াজ উঠেছে এবং সারা বিশ্বে যা প্রতিনিয়ত হচ্ছে সে বিশ্বজনীনতা বিদ্যমান রয়েছে ইসলামে। আল্লাহর শাশ্বত পথনির্দেশিকা ইসলামের বিশ্বজনীন আহবানআজকের 'বিশ্বায়নের' আহবান থেকে অনেক উন্নত ও ব্যাপক। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য। ইসলামে সকল মানুষই সমান। বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করেনা। ইসলামের এ আহবান সমগ্র মানবতাকে সচেতন করার জন্য রক্ত, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ও অঞ্চলগত মর্যাদার সমস্ত অলীক বাধা মূলোৎপাটন করে মানবতাকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করাই ইসলামের চিরন্তন লক্ষ্য।

ইসলামের কল্যাণ সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। এজন্য ইসলামে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক হিসেবে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) কে বলা হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীন বা বিশ্বজাহানের জন্য করুণা। আর আল-কুরআন হচ্ছে যিকরুল লিলআলামীন বা বিশ্বজাহানের জন্য উপদেশ। এখানেই ইসলামীবিধান, দর্শন ও মানবতার বিশ্বজনীনতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইসলামের আবেদন ও আহবান বিশ্বজনীন বলেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টির উৎসকে এক ও অভিন্ন করে দেখেছে।

আধ্যাত্মিক ও মানবিক মানদণ্ডে সকল মানুষই এক। বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভাল আর মন্দ কখনও এক হতে পারেনা। আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদণ্ডহচ্ছেতাকওয়া বা আল্লাহভীতি। ইসলামের বিশ্বজনীনতা মানুষকে মূল্যায়ন করেছে মানুষ হিসেবে। বিশ্বায়নের ধারণায় সবলের উপর দুর্বলের কোন আধিপত্য নেই, আছে একটা সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। বৃহৎশক্তি ও দুর্বল বলে কিছু নেই। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্য কিংবা তৃতীয় বিশ্বের কোন ধারণাও ইসলাম স্বীকার করে না। বিচারের কাঠগড়ায় ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজায় কোন ভেদাভেদ নেই। সবার জন্য রয়েছে ন্যায়বিচার পাওয়ার সমান অধিকার। মুসলমান সমাজ আবেগ নির্ভর হয়ে নয়, বরং বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করে, ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধারণা দিয়েছে তা অতুলনীয় ও ব্যাপকভিত্তিক। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার যে দ্বীনের অনুসারী সে দ্বীন নিজেই বিশ্বজনীন। কেউ প্রকৃতার্থেই যদি বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়তাহলে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্বায়নের ধারণা এবং ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিদ্যমান বিশ্বায়নের ধারণা, এর প্রকৃতি, প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ইত্যাদির বিস্তারিত মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ শেষে ইসলামী বিকল্পসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা হয়েছে।

পুরো অভিসন্দর্ভটিকে চিত্তাকর্ষক ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য একে ১০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, ইসলামের স্তম্ভসমূহ, ঈমান পরিচিতি ও ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ, সালাত তথা নামায আদায়ের ফযীলত, ইসলামে নামায তরককারীর বিধান, সাওম বা রোযা, সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, রমযান মাসের ফজীলত ও মর্যাদা, রোযার ফযীলত, হজ্জ, হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, হজ্জের ফযীলত ও গুরুত্ব, যাকাত, যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, যাকাতের তাৎপর্য, যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত, যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, যাকাতের বিবিধ উপকারিতা, যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ, ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী, ইসলাম সার্বজনীন ও কল্যাণধর্মী, ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম, ইসলাম পরিপূর্ণ আদর্শ ও ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বায়নের ধারণা, ইতিহাসের দর্পণে গ্লোবালাইজেশন, গ্লোবালাইজেশনের রাস্তা কে সুগম করেছে, বিশ্বায়নের চাহিদা ও বিশ্বায়নের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে স্ববিস্তারে বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রসরমান পদক্ষেপ, রাজ্যনতিক বিশ্বায়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদী-খৃষ্ট ঐক্য, বুশের ভাষণের আলোকে বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, বস্তুবাদ ও বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কর্ম পদ্ধতি, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলোর কী সমাধান পেশ করেছে, পূঁজিবাদী দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদান ৪টি, পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার নীতিসমূহ, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রাচীন পশ্চিমা দর্শন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কিভাবে বিকাশ লাভ করল, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী, বিশ্বায়ন ও বাজার বৃদ্ধির অর্থনীতি, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বায়ন, গ্যাট, গ্যাট

চুক্তিতে কি আছে, 'ডব্লিউটিও' : গ্যাটের উত্তরসূরি, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ও অর্থনৈতিক জোট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতির পরিচয়, ইসলামী সংস্কৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে আলোচনা, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও তার উদ্দেশ্য, বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতা, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব, ভাষাগত বিশ্বায়নের দিকে অগ্রসরমান পদক্ষেপ, ভাষাগত বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, ভাষাগত বিশ্বায়নের প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল টার্গেট মুসলমান, সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়ন, সামাজিক বিশ্বায়নের একমাত্র মাধ্যম ও সামাজিক বিশ্বায়নের কিছু প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন ও তৃতীয় বিশ্বের নতুন সংজ্ঞায়ন সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গণযোগাযোগের বিকাশ ও বিশ্বায়নে গণযোগাযোগের ভূমিকা কতটুকু, গণযোগাযোগের দৃষ্টিতে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ও সামাজিক আন্দোলনে গণযোগাযোগের ভূমিকা এবং জ্ঞাপন গবেষণা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সংবাদজগতের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে সংবাদপত্র কীভাবে বিশ্বায়নের মূলধারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ করে সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন সমাজ ও শ্রেণি প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বায়নের সংকট ও সম্ভাবনা, বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন : নব্য-পুঁজিবাদ-উত্তর চিন্তাধারা, উন্নয়ন পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্বসমস্যার সমাধান, বিশ্বায়ন : জঁটিলতার অবগুণ্ঠন, বিশ্বায়ন : উন্নয়ন পদ্ধতি, বিশ্বায়ন ও পরিবর্তমান বিশ্বনিরাপত্তা, বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা : তত্ত্বীয় পর্যালোচনা, বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন বিখ্যাত দার্শনিকেদের মতামত ও দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম, বিশ্বায়নের ভাষা, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন ও যুদ্ধ, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো, বিশ্বায়ন বিতর্ক, বিশ্বায়নের চালেঞ্জ, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা, শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা,

শিক্ষায় অর্থ সংস্থান, ক্রমাগত পশ্চাদপদতা : প্রান্তিকতা ও সতর্কবাণী, বিশ্বায়ন ও জনসম্পদ উন্নয়ন নীতি : বিবেচ্য বিষয়, প্রচলিত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-কাঠামো : কর্মবিন্যাস ও সমন্বয়ের সমস্যা, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কর্মদক্ষতা : পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের ধরণ : বাংলাদেশ, নারীর শ্রমশক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, নারীর শ্রমশক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে ইসলামের বিশ্বায়ন ও বিশ্বজনীনতা, ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বজনীন ধর্ম, বিশ্বায়ন একটি ইসলামবিরোধী মতবাদ, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ও অনৈসলামী অর্থ ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য, বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর আধুনিকতার আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ, আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ, উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ, মূল্যায়ন, মুসলিম বিশ্বে আধুনিকীকরণ বনাম পাশ্চাত্যকরণ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও আজকের ইসলামে সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্প ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ ও প্রস্তাবনা শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে যেখানে এই গবেষণা থেকে যে তত্ত্ব ও কৌশল উদঘাটিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই উদঘাটনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সমাধানসমূহ প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণার সারনির্যাস সংযোজিত হয়েছে। এতে গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্পসমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা, পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিশ্বায়নের অশুভ প্রভাব থেকে বিশ্ব মানবতাকে বিশেষত পশ্চাদপদ মানবগোষ্ঠীকে সামগ্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে।

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের এ উদ্যোগকে কবূল করুন এবং এটিকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির উসীলা করে দিন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

বিশ্বায়নের ধারণা ও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪−২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম: বিশ্বায়নের ধারণাও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি যুগে যুগে চাহিদানুযায়ী পথভ্রষ্ট লোকদের হিদায়াত করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

বিশ্বায়ন (Globalization) বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। গত কয়েক বছর ধরে 'বিশ্বায়ন' পরিভাষাটি পাশ্চাত্য থেকে অন্যান্য অনেক কিছুর মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র, সকল দেশে বিশ্বায়ন বলতে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমন্বয় গড়ে তোলাকে বুঝায়। অন্য কথায়, পণ্য ও সেবা চলাচলের ক্ষেত্রে সকল প্রকার রপ্তানি ভর্তুকি ও আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দিয়ে বা হ্রাস করে সারা বিশ্বকে একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রূপান্তর করাকে বিশ্বায়ন বলে। এই উদ্যোগ প্রথমে নেয়া হয় ১৯৪৭ সালে গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade) সৃষ্টির মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালে 'গ্যাট' এর উরুগুয়ে সম্মেলনের পরে জন্ম হয় 'বিশ্ববাণিজ্য' সংস্থা (WTO) নামে আরও একটা নতুন সংস্থা যা গ্যাট এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এই সংস্থার নামেই ২০০৫ সালের মধ্যে 'গ্যাট' নীতিমালা পূর্ণ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনেকের মতে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা যদি তার ঘোষণা অনুযায়ী নীতিমালার আলোকে কাজ করতে সমর্থ হয়, তবে তাতে মুসলিম বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ যথেষ্ট উপকৃত হবে। তাদের বাণিজ্য আয় বেড়ে যাবে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাড় ও ব্যবহার সম্ভব হবে, শ্রমিক চলাচল অবাধ হবে এবং বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ পাওয়া সহজ হবে।

দরিদ্র দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির কল্যাণকর কোন উপাদান বিশ্বায়নের মধ্যে অদ্যবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটাকে বরং উপনিবেশবাদের নতুন সংস্করণ বলে মনে করেন অনেকেই। কেননা, বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রায়ণের একটি নতুন ধরন। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ধনী দেশগুলোর পুঁজি ও পণ্য বিশ্বের সর্বত্র অবাধে সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে, দরিদ্র দেশগুলোর একমাত্র সম্পদ শ্রমশক্তি অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করবে না

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য দরিদ্র দেশগুলোর দর কষাকষির ক্ষমতা থাকবে না। ড. মাহাথির মোহাম্মদের মতে: বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ বিশ্বের সকল দেশকে একটি অভিন্ন সত্তার আওতায় নিয়ে আসা। দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল ও তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করাই এর লক্ষ্য। গতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতির আলোকে ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের ধারণা উদ্ভাবন করে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজির অবাধ সরবরাহ এবং পণ্য বেচাকেনা ও সেবার উপরই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশি। তবে পণ্যের অবাধ গতির মত মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের অবাধ প্রবাহ সম্ভব নাও হতে পারে।

পাশ্চাত্য থেকে বিশ্বায়নের যে আওয়াজ উঠেছে এবং সারা বিশ্বে যা প্রতিনিয়ত হচ্ছে সে বিশ্বজনীনতা বিদ্যমান রয়েছে ইসলামে। আল্লাহর শাশ্বত পথনির্দেশিকা ইসলামের বিশ্বজনীন আহবান আজকের 'বিশ্বায়নের' আহবান থেকে অনেক উন্নত ও ব্যাপক। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য। ইসলামে সকল মানুষই সমান। বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের এ আহবান সমগ্র মানবতাকে সচেতন করার জন্য রক্ত, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ও অঞ্চলগত মর্যাদার সমস্ত অলীক বাধা মূলোৎপাটন করে মানবতাকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করাই ইসলামের চিরন্তন লক্ষ্য।

ইসলামের কল্যাণ সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। এজন্য ইসলামে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক হিসেবে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) কে বলা হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীন বা বিশ্বজাহানের জন্য করুণা। আর আল-কুরআন হচ্ছে যিকরুল লিলআলামীন বা বিশ্বজাহানের জন্য উপদেশ। এখানেই ইসলামী বিধান, দর্শন ও মানবতার বিশ্বজনীনতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইসলামের আবেদন ও আহবান বিশ্বজনীন বলেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টির উৎসকে এক ও অভিন্ন করে দেখেছে।

আধ্যাত্মিক ও মানবিক মানদণ্ডে সকল মানুষই এক। বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভাল আর মন্দ কখনও এক হতে পারে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। ইসলামের বিশ্বজনীনতা মানুষকে মূল্যায়ন করেছে মানুষ হিসেবে। বিশ্বায়নের ধারণায় সবলের উপর দুর্বলের কোন আধিপত্য নেই, আছে একটা সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। বৃহৎশক্তি ও দুর্বল বলে কিছু নেই। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্য কিংবা তৃতীয় বিশ্বের কোন ধারণাও ইসলাম স্বীকার করে না। বিচারের কাঠগড়ায় ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজায় কোন ভেদাভেদ নেই। সবার জন্য রয়েছে ন্যায়বিচার পাওয়ার সমান অধিকার। মুসলমান সমাজ আবেগ নির্ভর হয়ে নয়, বরং বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করে, ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধারণা দিয়েছে তা অতুলনীয় ও ব্যাপকভিত্তিক। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার যে দ্বীনের অনুসারী সে দ্বীন নিজেই বিশ্বজনীন। কেউ প্রকৃতার্থেই যদি বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় তাহলে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্বায়নের ধারণা এবং ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিদ্যমান বিশ্বায়নের ধারণা, এর প্রকৃতি, প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ইত্যাদির বিস্তারিত মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ শেষে ইসলামী বিকল্পসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা হয়েছে।

পুরো অভিসন্দর্ভটিকে চিত্তাকর্ষক ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য একে ১০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, ইসলামের স্তম্ভসমূহ, ঈমান পরিচিতি ও ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ, সালাত তথা নামায আদায়ের ফযীলত, ইসলামে নামায তরককারীর বিধান, সাওম বা রোযা, সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, রমযান মাসের ফজীলত ও মর্যাদা, রোযার ফযীলত, হজ্জ, হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, হজ্জের ফযীলত ও গুরুত্ব, যাকাত, যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, যাকাতের তাৎপর্য, যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত, যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, যাকাতের বিবিধ উপকারিতা, যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ, ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী, ইসলাম সার্বজনীন ও কল্যাণধর্মী, ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম, ইসলাম পরিপূর্ণ আদর্শ ও ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বায়নের ধারণা, ইতিহাসের দর্পণে গ্লোবালাইজেশন, গ্লোবালাইজেশনের রাস্তা কে সুগম করেছে, বিশ্বায়নের চাহিদা ও বিশ্বায়নের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে স্ববিস্তারে বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রসরমান পদক্ষেপ, রাজ্যনতিক বিশ্বায়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদী-খৃষ্ট ঐক্য, বুশের ভাষণের আলোকে বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, বস্তুবাদ ও বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কর্ম পদ্ধতি, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলোর কী সমাধান পেশ করেছে, পূঁজিবাদী দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদান ৪টি, পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার নীতিসমূহ, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রাচীন পশ্চিমা দর্শন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কিভিাবে বিকাশ লাভ করল, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী, বিশ্বায়ন ও বাজার বৃদ্ধির অর্থনীতি, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বায়ন, গ্যাট, গ্যাট চুক্তিতে কি আছে, 'ডব্লিউটিও' : গ্যাটের উত্তরসূরি, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ও অর্থনৈতিক জোট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতির পরিচয়, ইসলামী সংস্কৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে আলোচনা, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও তার উদ্দেশ্য, বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতা, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন এবং তার সুদূরপ্রসারী

প্রভাব, ভাষাগত বিশ্বায়নের দিকে অগ্রসরমান পদক্ষেপ, ভাষাগত বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য, ভাষাগত বিশ্বায়নের প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল টার্গেট মুসলমান, সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়ন, সামাজিক বিশ্বায়নের একমাত্র মাধ্যম ও সামাজিক বিশ্বায়নের কিছু প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন ও তৃতীয় বিশ্বের নতুন সংজ্ঞায়ন সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গণযোগাযোগের বিকাশ ও বিশ্বায়নে গণযোগাযোগের ভূমিকা কতটুকু, গণযোগাযোগের দৃষ্টিতে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ও সামাজিক আন্দোলনে গণযোগাযোগের ভূমিকা এবং জ্ঞাপন গবেষণা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সংবাদজগতের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে সংবাদপত্র কীভাবে বিশ্বায়নের মূলধারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ করে সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন সমাজ ও শ্রেণি প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বায়নের সংকট ও সম্ভাবনা, বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন : নব্য-পুঁজিবাদ-উত্তর চিন্তাধারা, উন্নয়ন পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্বসমস্যার সমাধান, বিশ্বায়ন : জঁটিলতার অবগুণ্ঠন, বিশ্বায়ন : উন্নয়ন পদ্ধতি, বিশ্বায়ন ও পরিবর্তমান বিশ্বনিরাপত্তা, বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা : তত্ত্বীয় পর্যালোচনা, বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন বিখ্যাত দার্শনিকেদের মতামত ও দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম, বিশ্বায়নের ভাষা, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন ও যুদ্ধ, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো, বিশ্বায়ন বিতর্ক, বিশ্বায়নের চালেঞ্জ, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা, শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় অর্থ সংস্থান, ক্রমাগত পশ্চাদপদতা : প্রান্তিকতা ও সতর্কবাণী, বিশ্বায়ন ও জনসম্পদ উন্নয়ন নীতি : বিবেচ্য বিষয়, প্রচলিত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-কাঠামো : কর্মবিন্যাস ও সমন্বয়ের সমস্যা, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কর্মদক্ষতা : পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের ধরণ : বাংলাদেশ, নারীর শ্রমশক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, নারীর শ্রমশক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে ইসলামের বিশ্বায়ন ও বিশ্বজনীনতা, ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বজনীন ধর্ম, বিশ্বায়ন একটি ইসলামবিরোধী মতবাদ, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ও অনৈসলামী

অর্থ ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য, বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর আধুনিকতার আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ, আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ, উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ, মূল্যায়ন, মুসলিম বিশ্বে আধুনিকীকরণ বনাম পাশ্চাত্যকরণ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও আজকের ইসলামে সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্প ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ ও প্রস্তাবনা শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে যেখানে এই গবেষণা থেকে যে তত্ত্ব ও কৌশল উদঘাটিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই উদঘাটনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সমাধানসমূহ প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণার সারনির্যাস সংযোজিত হয়েছে। এতে গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্পসমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা, পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিশ্বায়নের অশুভ প্রভাব থেকে বিশ্ব মানবতাকে বিশেষত পশ্চাদপদ মানবগোষ্ঠীকে সামগ্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে।

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের এ উদ্যোগকে কবূল করুন এবং এটিকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির উসীলা করে দিন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়: ইসলাম পরিচিতি

১.১ ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত মানব জাতির একমাত্র জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সুশীতল পরশে জ্ঞানান্ধ, পথভ্রষ্ট, সত্যবঞ্চিত ও বেপথ মানব সমাজ পেয়েছে সত্যপথের দিশা। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী এক আসমানী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল–কুরআনুল কারীম। আর এ গ্রন্থের কারণে পথভোলা মানুষের চোখের সামনে থেকে ভ্রান্তির মোহজাল ছিন্ন হয়েছে; এক অপার্থীব রোশনীতে উদ্ভাসিত হয়েছে তার অন্তর। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে ইসলাম।

১.১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ

ইসলাম (إسلام) শব্দটি (سلم) সালমুন ও (سلم) সিলমুন শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। এছাড়া আরো কিছু অর্থ রয়েছে। যেমন: সন্ধি ও বিরোধিতা পরিত্যাগ, আনুগত্য ও যুদ্ধ-সংঘাত ত্যাগের জন্য শান্তি প্রস্তাব, ইসলামী বিধান, যুদ্ধ পরিহার করার ও আত্মসমর্প করার প্রস্তাব।[১]

আল-কুরআনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাল্‌ম (سلم) শব্দটির উল্লেখযোগ্য অর্থগুলো হলো: সিল্‌ম (سلم) শান্তি, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র থাকা, সন্ধি ও নিরাপত্তা, আনুগত্য ও হুকুম পালন।[২]

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলাম শব্দের অর্থ প্রাকৃতিক শান্তির ধর্ম, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন।[৩]

---

১ আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইবন উমার আল-জামাখশারী, Avj-Kvkkvd Avb nvKwqwKj MvIqwgwRZ Zvbhxj Iqv Dqbj AvKvexj dx DRwnZ Zvߨexj, (মিশর: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮

২ আফীফ আবুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, i{ûÏxb Avj-Bmjvgx, (লেবানন, বৈরুত: দারুল ই'ল্‌ম লিলমালাইন, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৩

৩ ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, e¨enwiK evsjv Awfavb, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪ইং), পৃ. ১৪৪

কেউ কেউ বলেন: ইসলামের (إسلام) আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ও মুসলমান হওয়া।

আল-কুর'আনুল কারীমে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে ইসলাম শব্দটি যুদ্ধ পরিহার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا "যদি তারা যুদ্ধ পরিহারে সম্মত হয়, তাহলে আপনিও তাতে সম্মত হোন।"[৪]

শরীআতের বিধান অর্থেও ইসলাম শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধানের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫]

শান্তি কামনার অর্থেও পবিত্র কুর'আনে ইসলাম শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সালাম ব্যতিরেকে অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না।"[৬]

ইসলামে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে, তাঁর বিরোধিতা পরিত্যাগ দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে। অনুরূপভাবে সাম্যের বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ عَبْدِ للّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ للّٰهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى للّٰهُ عَنْهُ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

---

[৪] Avj-KiŐAvb, সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১

[৫] Avj-KiŐAvb, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০৮

[6] Avj-KiŐAvb, সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৭

আর প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিই মুহাজির যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে হিজরত করে বা পরিত্যাগ করে।”[৭]

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের শাব্দিক অর্থ সকল প্রকারের আনুগত্যকে শামিল করে যখন আত্মসমর্পণ ও দ্বীনদারী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আসে উল্লেখিত অর্থসমূহের মধ্যে ‘শান্তি, পবিত্রতা, দোষ-ত্রুটিমুক্ত’ অর্থগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

১.১.২ ইসলামের পারিভাষিক অর্থ

আল-কুর’আনে আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।”[৮]

উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানবজীবনের সকল প্রকার বিধি-বিধান যে জীবনব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তা হলো ইসলাম। এটিই হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ...

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” [৯]

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইসলাম হচ্ছে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৭ আবূ ‘আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, Avj-Rwgô Avm-mnxn Avj-gmbv' wgb Dgwi ivmj mvjøvjøvû ÔAvjvBwn Iqvmvjøvg wgb mbwbwn Iqv AvBqwgwn, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯, পৃ. ১৫

৮. Avj KiAvb, সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৯

[৯] আল–কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩

আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে সাওম পালন এবং সঙ্গতি থাকলে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করবে।”[১০]

এ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের কতগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে। যেমন:

ক) সাক্ষ্য দেয়া এবং বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল;

খ) সালাত কায়েম করা;

গ) যাকাত প্রদান করা;

ঘ) রমযান মাসে রোজা রাখা এবং

ঙ) সক্ষম হলে হজ্জ করা।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন:

الإسلام هو الدخول في الإسلام أى في الانقياد والمتابعة

“আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের নিমিত্তে ইসলামে প্রবেশ করাই ইসলাম।”[১১]

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

الإسلام هو توحيد الله والانقياد والخضوع وإخلاص الضميرله والإيمان بالأصول الدينية التي جاءت من عند الله

“একনিষ্ঠভাবে ও একাগ্রচিত্তে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর তাওহীদের উপর আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উসূল তথা মৌলিক বিষয়সমুহের উপর বিশ্বাস করার নামই হলো ইসলাম।”[১২]

এ প্রসঙ্গে ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম বলেছেন: “অবশ্যই ইসলাম হলো এক আল্লাহর জন্য অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী আনুগত্য করা, যে সকল বিধান পালনের দ্বারা ইবাদত হয় এবং অনুসরণ ও পরিচালনার দ্বারা হেদায়েত করা হয়।”[১৩]

---

১০ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, mnxn gmwjg, (বৈরুত: ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি,) খণ্ড-১, হাদীস-৯, পৃ. ৪

১১ আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, তাফসীর-ই- কাবীর, (বৈরুত: ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি, ২ খণ্ড), পৃ. ২৬৮

১২ আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ বলেছেনঃ "ইসলাম হলো মনে প্রাণে মেনে নেয়া, যা মুখের স্বীকৃতি দ্বারা হোক, কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনে হোক। আর উহার মূল বস্তু হলো অন্তঃকরণ দ্বারা সত্য বলে মেনে নেয়া।"[১৪]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম (রহ.) বলেনঃ "ইসলাম হলো, আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধানানুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধানানুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।"[১৫]

সারকথা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধানসমূহকে পালন করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করতঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করার নামই ইসলাম।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতে, পবিত্র কুরআন শরীফ ও সুন্নতে ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে তিনটি ধারা রয়েছে। এগুলোর সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। এগুলো হলোঃ

১. ঈমান তথা আকীদা। একে শাহাদাহও বলা হয়। শাহাদাহ বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের এবং রাসূলের রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করা। ইসলামী পরিভাষায় একে ঈমানও বলা হয়। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনকে প্রকৃত ঈমান বা শাহাদাহ বলা হয়।

২. ইসলাম তথা আহকাম (ইবাদত)

৩. আখলাক তথা চরিত্র সংশোধন।

পবিত্র কুরআন শরীফে এই তিনটি ধারাকে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। কেননা রসুলে করীম (সা.) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার ভিত্তি হল ৩টি (১) ঈমান (২) চরিত্র গঠন (৩) আল্লাহর বিধিবিধান।[১৬]

---

[১৩] ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম, Avj-gmwjnvZj ÔAvg¤§v wjk kixAwZj Bmjwgqv, (বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি),পৃ. ২০৮

[১৪] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, Av'Øxb, (মিশরঃ আসসায়াদাঃ ১৩৮৯ হিজরী) পৃ. ৪৪, ও আশ-শাইখ মুস্তফা আব্দুর রাজ্জাক এর গবেষণা প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, (রিয়াদঃ দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়াহ, তারীখ বিহীন) পৃ. ৭৯

[১৫] মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ৩৩

১৬ .ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃ. ১৬-১৮ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, gmwjg e¨w³MZ AvBb (ঢাকাঃ পানকৌড়ি প্রকাশন, তা.বি.), পৃ. ৭-১৭

১.২ ইসলামের স্তম্ভসমূহ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবনবিধান। এ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মোট মৌলিক বিষয় বা উপাদান পাঁচটি। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة والحج وصوم رمضان.

অর্থাৎ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তা'আলার রাসূল এ কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা।[১৭] এ গুলোকে একত্রে “আরকানুল ইসলাম” তথা ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভ বলা হয়।

১.২.১ ঈমান পরিচিতি ও ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান হল ইসলামী শরীআতের যাবতীয় হুকুম–আহকাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দ্বীন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া। পরিপূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যিনি শরীআতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। মানবজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান বা বিশ্বাস। মুসলমানদের জীবনে ঈমানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান হলো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ তাঁর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ এবং তাঁর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। কারণ কাফির-মুশরিকরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তবুও তারা আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে কাফির। কাজেই কোনো ধরনের ইবাদত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। সুতরাং কোনো প্রাণী যবেহ করতে হবে আল্লাহর নামে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। তেমনিভাবে মান্নত করতে হবে আল্লাহর নামে ও শুধুই তাঁর উদ্দেশ্যে। দুআ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া বা কোনো আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না। অন্য কারো উপর কোনো ব্যাপারে ভরসা করা যাবে না।

---

১৭. বুখারী, A\m-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ৭

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে রুকু সিজদা, সালাত, সিয়াম, যিকির হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহর আইন পরিহার করে মানবরচিত আইনের অনুসরণ করা যাবে না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ক্ষেত্রে বা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ক্ষেত্রে ওলামা, মাশায়েখ, পীর, ফকীর, নেতা, নেত্রী কারো হুকুম অনুসরণ করা যাবে না।[১৮]

ক. ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ

ঈমান (الإيمان) শব্দটি আরবি। ইহা (أ-م-ن) মূলধাতু হতে গঠিত। যা বাবে إفعال এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। নিম্নে ঈমানের আভিধানিক অর্থ আলোকপাত করা হলো:

১. أمن অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। আরবি ভাষায় ঈমান (الإيمان) শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে এর অর্থের মধ্যেও কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষ তা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৯]

২. ঈমানের আভিধানিক অর্থ التصديق بالقلب বা অন্তরে বিশ্বাস করা।

৩. আর-রাগিব আল-ইসফাহানীর মতে, ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- إذعان النفس للحق على سبيل التصديق বা আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত কোনো ব্যক্তির সত্যের (আল্লাহর অস্তিত্ব) স্বীকৃতি প্রদান এবং উহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে ঈমান বলে।

খ. ঈমান শব্দের পারিভাষিক অর্থ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর আনীত আদর্শকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া এবং তৎপ্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাকে শরীআতের পরিভাষায় ঈমান বলে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফাহ (রহ) বলেছেন:

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان و المعرفة بالقلب

অর্থাৎ ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইকরার), আন্তরিক বিশ্বাস (তাসদীক বিল-জিনান) এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ওয়া মা'রিফা বিল-কালব) এর নাম।[২০]

---

[18] প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, Av‡gwiKvi AvMvmb gmwjg Dম্§vni Kg‡KŠkj, (ঢাকা: ইসলামী ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, মে ২০০৩), পৃ.১৫

[19] ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, Avj-Kvjvg AvKv‡q‡' Bmjvgx, (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ.৬৭

২০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২) ৫খণ্ড, পৃ. ৪৫১

গ. ঈমানের মৌলিক উপাদানসমূহ

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাবসমূহের উপর যা তিনি রাসূলগণের উপর নাযিল করেছেন, ঐ কিতাবের উপর যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।"[২১]

উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কস্মিনকালেও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন তাকেই মু'মিন বলা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন:

من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

"যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলে, এবং পরকালে, সে নিশ্চিতরূপে সঠিক পথ হতে অনেক দূরে সরে গেছে।"[২২]

এ ছাড়া ঈমানে মুফাস্সাল শীর্ষক বাক্যে এ বিষয়গুলোর সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. "আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তাক্দীরের ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।"

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

... الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر...

"ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি এবং তার ফিরিশতাগণের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস তথা ঈমান আনবে আর তকদীরের (ভাগ্যের) ভাল মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।"[২৩]

---

২১. আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৬

২২ আল-কুর'আন, সূরা আন- নিসা, আয়াত: ১৩৬

[২৩] বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, ১৪খণ্ড, পৃ. ৪৫২, হাদীস নং-৪৪০৪

তকদীর সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير

"দুনিয়ায় (সাধারণত) এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ পৌঁছে থাকুক না কেন, তা তোমাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) নির্ধারিত করা আছে।"[২৪]

কিয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে রয়েছে: "এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই আর নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের, যারা কবরে আছেন।"[২৫]

আলোচ্য আলোচনার পরে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো স্পষ্ট দেখতে পাই।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সমগ্র সৃষ্টিজগতের ইলাহ (প্রভূ, উপাস্য) একমাত্র আল্লাহ। সত্তার দিক থেকে তিনি যেমনি এক, অনুরূপ গুণাবলির দিক থেকেও তিনি একক, অনন্য, তাঁর কোনো শরীক নাই। এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও শৃঙ্খলা বিধানে তাঁর কোনো শরীক বা সহযোগী নাই। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। ইরশাদ হয়েছে: "বলুন তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ তার সমতুল্য নয়।"[২৬]

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের পর ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "... যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাগণের, তাঁর কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের এবং কিয়ামতের দিনের উপর অবিশ্বাস করবে অতঃপর সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হবে।"[২৭]

---

২৪. আল-কুর'আন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২

২৫ আল-কুর'আন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭

২৬ আল-কুর'আন, সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪

২৭. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন: ... وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
Avj-KiÔAvb, সূরা আন-নিসা, আয়াত, ৪: ১৩৬

ঈমান বিল মালাইকার অর্থ হচ্ছে, অন্তরে এমন দৃঢ়বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলার অনেক ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, যাঁদের নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, যেমন জিবরীল, ইসরাফীল, মিকাঈল, আযরাঈল প্রমুখ তাদের প্রতি নির্দিষ্টভাবে। আর যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের প্রতি সামগ্রিকভাবে। এবং এ সকল ফেরেশতাদের কর্ম ও গুণাবলি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জেনেছি সবই বিশ্বাস করি।

৩. আসমানি কিতাবের উপর ঈমান

'ঈমান বিল কুতুব'-এর অর্থ হচ্ছে, এমন দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী-রাসুলগণের উপর নিজ বান্দাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এ সকল কিতাব তাঁর কালাম বিশেষ। এসব কিতাব যে সকল বিষয়বস্তু ধারণ করেছে, সবই হক ও সত্য। এগুলোতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কিছু কিছু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে নামসহ উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক আছে যার সংখ্যা ও নাম আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

৪. নবী–রাসূলগণের প্রতি ঈমান

ইসলামের মৌল বিশ্বাসের মধ্যে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান অন্যতম। নবী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংবাদদাতা। আর রাসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ দূত, বার্তা বাহক বা বাণী বাহক। নবুওয়াত শব্দের অর্থ সংবাদ বহন বা বার্তাবহন এবং রিসালাত শব্দের অর্থ দূতালি বার্তাবহন বা সংবাদ বহন। ইসলামী পরিভাষায়, ফিরিশতার মাধ্যমে অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যাঁর প্রতি বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ বা ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁকে নবী বলে। আর রাসূল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে মানুষের নিকট তাঁর পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনে তাদের সংখ্যা নির্ধারিতভাবে বলা হয়নি। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: "আমরা তো (হে নবী) আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। তাঁদের কারো কারো কথা আপনার নিকট বিবৃত করেছি এবং তাঁদের অনেকের কথা আপনার নিকট বিবৃত করিনি।"[২৮]

৫. তাকদীরের উপর ঈমান

২৮ আল-কুর'আন, সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৭৮

তাকদীরের উপর বিশ্বাস ইসলামের মৌল আকীদাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যেমন ফরয, তেমনি কাযা ও কাদর বা তাকদীরের উপর ঈমান আনাও ফরয। তাকদীর শব্দটি কাদরুন (قدر) বা কাদারুন (قدر) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। কাদারুন অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ করা, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। যেমন. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وخلق كل شئ فقدره تقديرا

"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথার্থ অনুপাতে।"[২৯]

পরিভাষায় তাকদীর এর সংজ্ঞা হলো, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারণ করা। এর ব্যাখ্যা হল, সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারণ। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মধ্যে কার কী প্রকৃতি, কার কী কর্ম, কার কী দায়িত্ব, কার কী গুনাগুণ, কার কী বৈশিষ্ট্য, কার জন্য মৃত্যু কখন, কোথায় কীভাবে হবে ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে সৃষ্টির কোনো ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ তা'আলার এ নির্ধারণকে তাকদীর (ভাগ্যলিপি) বলে।

৬. কিয়ামত ও আখিরাতের উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে একদিন এ পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর সকল মানুষের রূহকে একদিন হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের দুনিয়ার ভাল-মন্দ কাজের হিসাব নিবেন। যারা দুনিয়ায় ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন। জান্নাত হলো চির সুখের স্থান। আর যারা দুনিয়ায় মন্দ কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নাম হলো ভয়ানক শাস্তির স্থান।

কিয়ামত শব্দটি (قوم) ধাতু থেকে গঠিত। قيام শব্দমূলের অর্থ হল উঠে দাড়ানো, সোজা হয়ে দাড়ানো ইত্যাদি। কিয়ামত শব্দটি ইয়াওম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। ইয়াওমুল কিয়ামাহ এর অর্থ পুনরুত্থানের দিন। তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের অর্থ পুনরুত্থানের দিন, যেদিন সকল মানুষকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হতে হবে। [৩০]

---

২৯. আল-কুর'আন, সূরা আল-ফুরকান, আয়াতঃ ২

৩০. ইবনু মানযুর, ॥jmvbj Avive, (বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি, ১২ খণ্ড), পৃ.৫০৬

পরিভাষায় জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার সিংগায় ফুৎকার দেয়া থেকে জান্নাতবাসীগণের জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে গিয়ে স্থির হওয়া পর্যন্ত সময়কে ইয়াওমুল কিয়ামত বা কিয়ামতের দিবস বলে।

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহ.) বলেন: মহাপ্রলয় সংগঠিত হওয়ার নাম কিয়ামত। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে: (ويوم تقوم الساعة)"যে দিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে "।[৩১]

এ দিনটিকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন يوم الدين (ইয়াওমুদ্দীন) কর্মফল দিবস, يوم الحاقة (ইয়াওমুল হাক্কাহ) বা অবশ্যম্ভাবী দিবস, يوم القارعة (ইয়াওমুল কারীয়া) বা আঘাতকারী দিবস, يوم الحساب (ইয়াওমুল হিসাব) বা হিসাব দিবস, يوم البعث (ইয়াওমুল বা'ছ) বা পুনরুত্থান দিবস, يوم الاخرة (ইয়াওমুল আখিরাত) বা শেষ দিবস ইত্যাদি। এ ধরনের বহু নাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দিবসটির ভয়াবহতা ও বিভিন্ন অবস্থার চিত্র তুলে ধরা।[৩২]

৭. পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান

আখিরাতের জীবন ও দেহ রূহ সমন্বিত হবে। তবে সে জীবন হবে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কুরআনুল কারীমে পুনরুত্থানের বহু দলীল রয়েছে এবং তাতে প্রথমবার সৃষ্টি করাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। অতএব পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যপারে তিনি অপারগ নন। তাঁর অসীম ইলম থেকে তিনি কিছু বিস্মৃতও হন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "সে আমার সম্পর্কে উপমা উত্থাপন করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলুন অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন সেগুলো পঁচে যাবে? এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সন্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৩৩]

ঘ. ঈমানের স্তর বিন্যাস

ঈমানের নিজস্ব একটি স্বাদ আছে, মজা ও মাধুর্য আছে এবং তার নিজস্ব একটি প্রকৃতি ও হাকীকত আছে। ঈমানের স্বাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হযরত আব্বাস (রা) ইবন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি

---

[৩১] আল-রাগিব, Avj-gdiv'vZ, (বৈরুত: ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি), পৃ. ৪১৭

৩২. শিবলী নু'মানী, mxivZbex (mv), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তা.বি.), ৪খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

৩৩. আল-কুর'আন, সূরা ইয়াসীন, আয়াত:৭৮-৭৯

আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল বলে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন ও অনুভব করতে পারবে।"[৩৪]

ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন: "হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিনটি বিশেষ গুণ, যার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান থাকবে সে ঈমানের মজা অনুভব করতে পারবে। যার নিকট আল্লাহ ও রাসূল পৃথিবীর অন্য সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে এবং যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে, কুফরে ফিরে যাওয়াকে ঠিক অনুরূপ অপছন্দ করবে।"[৩৫]

আর ঈমানের হাকীকত, যে ব্যক্তির মাঝে দ্বীনের মৌলিকত্ব ও সঠিক বুঝ বিরাজমান থাকবে, দ্বীনের জন্যে চেষ্টা করবে, শ্রম দেবে; ইবাদত করবে, দাওয়াত দেবে, হিজরত করবে, জিহাদ করবে, অর্থ ব্যয় করবে বরং দ্বীনের জন্যে চেষ্টা-মেহনত করতে গিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজে অংশ গ্রহণ করে সামর্থ্যের শতভাগ নিংড়ে দেবে সে-ই প্রকৃত অর্থে ঈমানের হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে এবং তা নিজের মাঝে ধারণ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ .
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যখন আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) ও কালাম পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পালনকর্তার প্রতি ভরসা পোষণ করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যে রয়েছে স্বীয় পালনকর্তার নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।"[৩৬]

---

৩৪. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, ১খণ্ড, পৃ. ১৩৭, হাদীস নং ৪৯

৩৫. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১খণ্ড, পৃ. ২৬, হাদীস নং ১৫

৩৬ আল-কুর'আন, সূরা আনফাল, আয়াত: ২-৪

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন: আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে তাঁরাই হল সত্যিকার মু’মিন। তাঁদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।’[৩৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ‘তারাই মু’মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জীবন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারাই সত্যনিষ্ঠ।’[৩৮]

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ঈমানের হাকীকত তথা প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছেছে বলে বিবেচনা করা হবে না যতক্ষণ না সে এ বিশ্বাস করবে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা রদ হওয়ার ছিল না, আর যা তার পর্যন্ত পৌঁছেনি সেটি পৌঁছার ছিল না, অর্থাৎ যা হওয়ার তা হবেই সেটি কেউ রদ করতে পারবে না, আর যা হয়নি তা কেউ জোর করে বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

৬. ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন

ঈমানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন রয়েছে, এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হলো:

১. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)কে ভালবাসা: ঈমানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন হলো রাসূল (সা.)কে ভালবাসা। কেননা আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা পেতে হলে অবশ্যই রাসূল (সা.)কে ভালবাসতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: “(হে নবী! আপনি বলে দিন) তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ তা‘আলা হলেন মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।”[৩৯]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে: “সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ মু’মিন বলে স্বীকৃত হবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান ও অপরাপর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব।”[৪০]

৩৭. Avj-Ki0Avb, সূরা আনফাল, আয়াত: ৭৪

৩৮. Avj-Ki0Avb, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫

৩৯. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৫২৪

৪০. মূল হাদীস: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪

২. আনসারদের ভালবাসা: আনসারদের ভালবাসাও ঈমানের একটি নিদর্শন। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাহাবী আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে, আনসারদেরকে ভালবাসা আর নিফাকের (কপটতা) আলামত হচ্ছে তাদেরকে ঘৃণা করা।'[৪১]

৩. মু'মিন বান্দাদেরকে ভালবাসা: ঈমানের অন্য একটি অনুপম নিদর্শন হলো মু'মিন বান্দাদের ভালবাসা। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মু'মিন না হলে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ না হলে মু'মিন বলে বিবেচিত হবে না। আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব না? যা বাস্তবায়ন করলে তোমরা পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ হতে পারবে? নিজেদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।' [৪২]

৪. মুসলিমকে ভালবাসা: ঈমানের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন হলো দুনিয়ার সকল মুসলিম ভাইকে ভালবাসা। এ প্রসঙ্গ হাদীসে এসেছে: "আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ মু'মিন বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যে অথবা বলেছেন প্রতিবেশীর জন্যে-সে বস্তু পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে (পছন্দ) করে।"[৪৩]

৫. মেহমান, প্রতিবেশীর সম্মান করা ও কল্যাণমূলক কথা ব্যতীত নীরব থাকা: হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণমূলক কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ আআলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন স্বীয় মেহমানকে সম্মান করে।'[৪৪]

---

৪১. মূল হাদীস: عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৬২১

৪২. মূল হাদীস: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السّلام بينكم. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৫৪

৪৩. মূল হাদীস: عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৬০১২

৪৪. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০১৮

৬. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা: আবূ সাঈদ আল-খুদুরী (রা.) হতে বর্ণিত: 'সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায়-অসৎকাজ সংঘটিত হতে দেখলে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। না পারলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে এরও সামর্থ্য না থাকলে মনে-প্রাণে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচে দুর্বল ঈমান।'[৪৫]

৭. কল্যাণ কামনা ও সদুপদেশ প্রদান: কোনো মানুষের ক্ষতি কামনা করা কখনই একজন মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না। এজন্য ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতার একটি নিদর্শন হলো সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা ও সদুপদেশ দেয়া। এ প্রসঙ্গে তামীম আদ-দারী (রা.) হতে বর্ণিত: 'সাহাবী তামীম আদ-দারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কল্যাণকামনাই হল দ্বীন, আমরা বললাম, কার জন্যে? নবীজী বললেন: আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমান ও তাদের নেতৃবর্গের জন্যে।'[৪৬]

১. ২. ২. সালাত

ঈমান আনয়নের পর ব্যক্তির উপর প্রথম ফরয হলো সালাত বা নামায। ঈমান দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর নামায দ্বারা সে সম্পর্ক হয় গাঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। রাসূল করীম (সা.) মি'রাজে আল্লাহর সাক্ষাত পান। আর মু'মিনের মি'রাজ হলো নামায। এতে আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি মিলন ও আলাপ হয়। মানুষ এ দ্বারা আধ্যাত্মিক সফলতার চরম শিখরে উপনীত হয়।

১. ২. ২. ১. সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

সালাত নামায এর আরবি শব্দ। আর নামায একটি অতি সুপরিচিত ফার্সী শব্দ। নামায শব্দের অর্থ ইসলাম ধর্ম মতে-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা দৈনিক এ পাঁচবার অবশ্য করণীয় (ফরয) এবাদাত বা উপাসনা। আর সালাত অর্থ-নামায, ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইবাদত বা উপাসনা, দূরূদ, দুআ, আশির্বাদ। "সালাত" এর আভিধানিক অর্থ– কারো দিকে মুখ করা, নিকটবর্তী হওয়া, অগ্রসর হওয়া

---

৪৫. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৪৯

৪৬. মূল হাদীস: عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم.-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ৮২

এবং দোয়া করা। লিসানুল 'আরব এর প্রণেতা বলেন: الصلاة: الركوع والسجود " রুকু" এবং সিজ্দাহ্ করা।[৪৭]

পারিভাষিক অর্থে সালাত সেই সুনির্দিষ্ট 'ইবাদতের নাম যা আরকান-ই ইসলাম তথা ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্তর্গত'।

এ ছাড়া শরী'য়াতের পরিভাষায় সালাতের কয়েকটি অর্থ করা হয়। যেমন:

ক. প্রশংসা করা: সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা হয় বলে এর অর্থ প্রশংসা করা।

খ. অনুনয়-বিনয় করা: কেননা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশ করা হয়।

গ. ক্ষমা প্রার্থনা করা: সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কৃত গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

ঘ. আত্মসমর্পন করা: সালাতের মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয়।।

ইসলামের পাঁচটি মূলস্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হ'ল সালাত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি করণীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে সালাত কায়েম করা হল প্রথম এবং প্রধান 'ইবাদত। একজন মানুষ এ সালাত আদায় করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।"[৪৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "মুমিন এবং কুফরের মধ্যে সালাতই পার্থক্যকারী।"[৪৯]

নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটি সুযোগ এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"[৫০]

---

৪৭. ইবন মানযুর, wjmvbj Avive, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৮

৪৮. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন: ...أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- Avj-KiÔAvb, সূরা লুকমান: ১২-১৭

৪৯. এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন: .الفرق بين الكفر والإيمان ترك الصلاة - আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি, Rv‡g AvZ-wZiwgwh, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী, ১৪২১হি.) হাদীস নং: ২৫৪৩

৫০. এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন: . أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد-মুসলিম, *আস-সহীn*, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ৭৪৪

১. ২. ২. ২. সালাত তথা নামায আদায়ের ফযীলত

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায পড়াই যথেষ্ট নয়, বেনামাযীর নামাযকে সুষ্ঠুভাবে ও সঠিকভাবে পড়াও জরুরি। সঠিকভাবে নামায না পড়া, নামায না পড়ারই শামিল। আর জামাআতে নামায আদায় করার মর্যাদা অধিক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

“যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে, এবং লোকদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নিচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হচ্ছিল। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করতো।”[৫১]

এ আয়াতের প্রথমাংশে কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাদের ওপর অবমাননার ছাপ থাকবে। অথচ দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হতো। ইবরাহীম তামীমী এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ আযান ও ইকামাত দ্বারা তাদেরকে ফরয নামাযের দিকে ডাকা হতো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) বলেন: তারা আযান শুনতো, অথচ সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও জামাআতে হাজির হতো না।

কা’ব আল আহবার (রা) বলেন: এ আয়াত কেবল নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকা লোকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এ থেকে বিনা ওযরে জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার কী ভীষণ পরিণাম, তা জানা যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হোক, তাতে আমি একজন ইমাম নিয়োগ করি, অতঃপর শুকনো কাঠ বহনকারী একদল লোক সাথে নিয়ে যারা জামাআতে আসেনি তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিই।”[৫২]

হাদীসে আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললো: “হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ নেই। আমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যেতে উদ্যত হলে তাকে ডেকে বললেন: তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তাহলে মসজিদে যাবে।”[৫৩]

---

৫১ Avj-Ki0Avb, সূরা আল কালাম: আয়াত ৪২-৪৩

৫২. বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-২১৫

৫৩. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৪১২৫

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূল (স)-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (স)! মদীনা অনেক হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ শহর। আমি চোখে দেখি না। বাড়িও অনেক দূরে। আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন একজন আছে বটে। তবে সে আমার উপযুক্ত নয়। আমি কি বাড়িতে নামায পড়তে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন: হ্যাঁ, পাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি মসজিদে যাবে। আমি তোমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিতে পারি না।"[৫৪]

এ হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে জামাআতে হাজির না হওয়া কোনো ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অন্ধ ব্যক্তিকেও বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। এজন্য ইবনে আব্বাস (রা) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি সব সময় দিনে রোযা রাখে ও রাতে নামায পড়ে, কিন্তু জামাআতে নামায পড়ে না। তার কি হবে? তিনি বললেন: এরূপ করতে থাকা অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে।"[৫৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি নামাযের ডাক শুনলো কিন্তু কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে হাজির হলো না, তার একাকী পড়া নামায কবুল হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো যে, কি ধরনের ওজর? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রোগ অথবা বিপদের আশংকা।"[৫৬]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ লা'নত করেছেন: (১) যে ব্যক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নেতা হয়। (২) যে নারীর ওপর স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। (৩) যে আযান শুনেও জামাআতে উপস্থিত হয়না।"[৫৭]

আলী (রা) বলেন: "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে ছাড়া জায়িয নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি বললেন: যে বাড়িতে বসে আযান শুনতে পায়।"[৫৮]

---

৫৪. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশ, mbwb Ave 'vD', (দারুল ফিক্‌র, তাবি), হাদীস নং-৮৫৪

৫৫. তিরমিযী, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৮১২

৫৬. আবূ দাউদ, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৭৪৫

৫৭. আবু আব্দুল্লাহ আল হাকিম, আল নিশাপুরী Avj gmZv'ivK ÔAvjvm mnxnvBb, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং-৪১২৫

৫৮. আবূ আব্দিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল, gmbv' Avng', (কায়রো : মুয়াস্‌সাসাতু কুরতুবা, তাবি), হাদীস নং-১২৩৬৫

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ "আমরা নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মুনাফিক অথবা রোগী ছাড়া আর কিছু ভাবতাম না।"[৫৯]

ইবনে উমর (রা) জানান যে, একবার উমর (রা) তাঁর খেজুরের বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন আসরের জামাআত শেষ হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ খেজুরের বাগান দরিদ্র লোকদের নামে সাদকা করে দিলেন, যাতে সে দান জামাআত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

জামাআতে নামায পড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে ইশা ও ফজরের নামাযকে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এই দুটি নামায অর্থাৎ ফজর ও ইশা মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এ দুটি নামায জামাআতে পড়ার সাওয়াব কত তা জানলে লোকে কিছুতেই তা ত্যাগ করতো না।"[৬০]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শিক্ষক উবাইদুল্লাহ বিন উমার কাওয়ারীরী বলেন যে, আমি কখনো ইশার নামায জামাআতে পড়তে ভুলতাম না। কিন্তু একদিন আমার বাড়িতে এক মেহমান আসায় তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণে ইশার জামাআত পড়তে পারলাম না। পরে ইশার নামায ২৭ বার পড়লাম। কারণ, হাদীসে আছে, জামাআতে নামাযের সাওয়াব ২৭ গুণ বেশি। কিন্তু রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক দল ঘোড়া সাওয়ারের সাথে দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছি। কিন্তু আমি পেছনে পড়ে যাচ্ছি। যারা আগে ছিল তারা বললো, তুমি কখনো আমাদেরকে ধরতে পারবে না। কেননা, আমরা ইশার নামায জামাআতে পড়েছি আর তুমি আদায় করেছো একাকী।

১. ২. ২. ৩. ইসলামে নামায তরককারীর বিধান

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী অথবা নামাযের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হতে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে নামায তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে নামায আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি সম্পর্কে

---

৫৯. বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৫১২

৬০. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কঠোরতা বর্জন করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুসল্লীর জন্য। যারা তাদের নামায থেকে উদাসীন। 'যারা তা লোকদেরকে দেখায়।"[৬১]

অলস ও লোক দেখানো মুছল্লীদের আল্লাহ মুনাফিক ও প্রতারক বলেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে। অথচ তিনি তাদেরকেই ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।"[৬২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল না ...সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ক্বারূণ, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সঙ্গে থাকবে।"

১. ২. ৩. সাওম বা রোযা

১. ২. ৩. ১. সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

রোযা (صوم) শব্দটি আরবি। ফারসী ভাষায় একে রোযা বলা হয় এবং বাংলা ও উর্দূ ভাষায় তা বহুল প্রচলিত। রোযার আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে লিসানুল আরব গ্রন্থের প্রণেতা বলেন: "রোযা হচ্ছে খানাপিনা, অনর্থক কথা ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা। এখানে রোযা অর্থ চুপ থাকা।"[৬৩] যেমন আল-কুরআনে এসেছে, "নিশ্চয়ই আমি প্রভুর জন্য একটি রোযা মান্নত করেছি।"[৬৪]

আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ বলেন: "রোযা অর্থ হচ্ছে, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা।"[৬৫]

পারিভাষিক অর্থে রোযা সম্পর্কে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন: "রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে।"[৬৬]

---

৬১ . মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ., আল-কুরআন, সূরা মাউন, আয়াত: ৫-৭

৬২ . মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১৪২

৬৩.ইবনুল মানযুর, wjmvbj Avie, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

৬৪. আল-কুর'আন, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ২৬

৬৫. আফীফ আবুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, i/ûÏxb Avj-Bmjvgx, i/ûÏxb Avj Bmjvgx, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

৬৬. সাইয়েদ আস-সাবিক, wdKûm-mbvn, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ২৫ তম সংস্করণ. ১৯৮৫), পৃ.৩২১

এ প্রসঙ্গে আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ বলেন: "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় খাবার, পানাহার ও যৌন সংযোগ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে রোযা।"[৬৭]
মোটকথা, রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযা পালনকারীর জন্য মিথ্যাকথা ও মিথ্যা কাজ এবং পরনিন্দা–পরচর্চার মতো নিকৃষ্ট কাজ থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য।

১. ২. ৩. ২. রমযান মাসের ফযীলত ও মর্যাদা

রমযান মাসের আগমনে মুসলিমগণ আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "বল, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সঞ্চয় করে এটা তার চেয়ে উত্তম।"[৬৮]
পার্থিব কোনো সম্পদের সাথে আল্লাহর এ অনুগ্রহের তুলনা চলে না, তা হবে এক ধরনের অবাস্তব কল্পনা। যখন রমজানের আগমন হত তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হতেন, তাঁর সাহাবাদের বলতেন: তোমাদের দ্বারে বরকতময় মাস রমযান এসেছে।[৬৯]
এরপর তিনি এ মাসের কিছু ফযীলত বর্ণনা করে বলতেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য রোযা পালন ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দি করা হয়। এ মাসে রয়েছে একটি রাত যা হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল।[৭০]
রমযান মাসে সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইজ্জতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এক সাথে নাযিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার রমযান মাসে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-

৬৭. আফীফ আত-তাব্বারা. i/ûÏxb-Av j-Bm jvgx, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

৬৮. আল-কুর'আন, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৮

৬৯ নাসাঈ, Avm-mbvb, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ১৯৮৫), হাদীস নং-২১০৫

৭০ নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১০৫

এর প্রতি নাযিল হতে শুরু করে। কুরআন নাযিলের দুটি পর্বই রমযান মাসকে ধন্য করেছে। শুধু আল-কুরআনই নয় বরং ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল সহ সকল ঐশী গ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাবারানী বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ মাসে মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা যেমন নাযিল হয়েছে তেমনি আল্লাহর রহমত হিসেবে এসেছে রোযা। তাই এ দুই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরীল রাসূলুল্লাহ(সা.)-কে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং রাসূল (সা.)-ও তাঁকে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। আর জীবনের শেষ রমজানে আল্লাহর রাসূল দু'বার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। যা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১. রোযা পালন ইসলামের একটি রুকন: হজ জিলহজ্জ মাসের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সে মাসের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনিভাবে রোযা রমযান মাসে হওয়ার কারণে এ মাসের মর্যাদা বেড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি ফরয করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।"[৭১]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসলাম যে পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হল রোযা পালন। এ রোযা জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম ; যেমন হাদীসে এসেছে: "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, রোযা পালন করল রমযান মাসে, আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো...।"[৭২]

২. কুরআন নাযিলের মাস হল রমযান: আল্লাহ তা'আলা যত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোর কোনো কিতাবই রমযান মাসে নাযিল করেননি। একমাত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই রমযান মাসে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "রমযান মাস, এতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন, যা মানুষের দিশারী এবং স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী।"[৭৩]

৩. এ মাসে জান্নাত, জাহান্নাম ও শয়তানের অবস্থা: রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় শয়তানদের। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ

৭১ আল-কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩

৭২. বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৭৪২৩

৭৩. আল-কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, শয়তানদের শিকল পরানো হয়।"[৭৪]

তাই শয়তান রমজানের পূর্বে যে সকল স্থানে অবাধে বিচরণ করত রমযান মাস আসার ফলে সে সকল স্থানে যেতে পারে না। শয়তানের তৎপরতা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, ব্যাপকভাবে মানুষ তওবা, ধর্মপরায়ণতা ও সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হয় পাপাচার থেকে দূরে থাকে। তারপরও কিছু মানুষ অসৎ এবং অন্যায় কাজ-কর্মে তৎপর থাকে। কারণ, শয়তানের কু-প্রভাবে তারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।

৪. রমযান মাসে লাইলাতুল কদরের অবস্থান: উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজাতি হলো মানবজাতি। এ মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি হাদীয়া দিয়েছেন যা দেখে পূর্ববর্তী নবীরাও পর্যন্ত আফসোস করেছে। তন্মধ্যে একজন মু'মিনের নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো লাইলাতুল কৃদর। যা আল্লাহ তা'আলার কাছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আর এটি রমযানুল মুবারকেই অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।"[৭৫]

৫. রমযান মাস দুআ কবুলের মাস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমজানের প্রতি রাতে ও দিনে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং প্রতি রাত ও দিবসে মুসলিমের দুআ-প্রার্থনা কবুল করা হয়।[৭৬]

তাই প্রত্যেক মুসলমান এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের কল্যাণের জন্য যেমন দুআ-প্রার্থনা করবে, তেমনি সকল মুসলিমের কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে।

৬. রমযান ক্ষমা লাভের মাস: যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েও তার পাপসমূহ ক্ষমা করানো থেকে বঞ্চিত হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ঐ ব্যক্তির

---

৭৪. মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-২৫৪৭

৭৫. আল-কুর'আন, সূরা আল-কদর, আয়াত: ৩-৫

৭৬. আলবানী, gvRgD gAvjøvdwZj Avjevbx, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ১৯৮৯), হাদীস নং-১০০২

নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যার কাছে রমযান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করা হয়নি।[৭৭]

৭. রমযান জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের প্রথম রজনীর যখন আগমন ঘটে তখন শয়তান ও অসৎ জিনগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে একটি দরজাও খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে তা আর বন্ধ করা হয় না। প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকে যে, হে সৎকর্মের অনুসন্ধানকারী তুমি অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের অনুসন্ধানকারী তুমি থেমে যাও! এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।[৭৮]

৮. রমযান ধৈর্য ও সবরের মাসঃ এ মাসে ঈমানদার ব্যক্তিগণ খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদি ও অন্যান্য সকল আচার-আচরণে ধৈর্য ও সবরের এত অধিক অনুশীলন করেন তা অন্য কোনো মাসে বা অন্য কোনো পর্বে করেন না। এমনিভাবে রোযা পালন করে যে ধৈর্যের প্রমাণ দেয়া হয় তা অন্য কোনো ইবাদতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ ধৈর্যশীলদের তো বিনা হিসাবে পুরস্কার দেয়া হবে।[৭৯]

১. ২. ৩. ৩. রোযার ফযীলত

মুসলমানদের জন্য রোযা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ নিআমত। পার্থিব কোনো সম্পদের সাথে আল্লাহর এ নিআমাতের তুলনা চলে না। রোযার ফযীলত অত্যন্ত বেশি। যেমন,

১. রোযা শুধু আল্লাহর জন্যঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোযার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগী থেকে রোযাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন তিনি এক হাদীসে কুদসীতে তিনি বলেনঃ الَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা তার ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।[৮০]

---

৭৭ আলবানী, Rv‡gDj Dmj wd Avnw'wmi ivmj, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪২৯

৭৯ আল-কুর'আন, সূরা যুমারঃ আয়াত ১০

৮০ মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ২৭৬০

২. রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে প্রদান করবেন: রোযা আদায়কারী বিনা হিসাবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী ও সৎ কর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হয় না। বরং প্রত্যেকটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: কিন্তু রোযার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব।"[৮১]

সারা জাহানের সর্বশক্তিমান প্রতিপালক আল্লাহ নিজেই যখন এর পুরস্কার দেবেন তখন কি পরিমাণে দেবেন? ইমাম আওযায়ী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আল্লাহ যে রোযা আদায়কারীকে প্রতিদান দেবেন তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না।

৩. রোযাদারের জন্য রোযা কু-প্রবৃত্তি প্রতিরোধের ঢাল স্বরূপ: রোযা পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন: "হে যুবকেরা! তোমাদের মাঝে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত করে ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা পালন করে। কারণ এটা তার রক্ষাকবচ।"[৮২]

এমনিভাবে রোযা সকল অশ্লীলতা ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "রোযা হল ঢাল। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে রোযা পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। যদি তার সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারিতে লিপ্ত হতে চায় তবে তাকে বলে দেবে, আমি রোযা পালনকারী।"[৮৩]

রোযা পালনকারী যেমনি নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তেমনি সকল অশ্লীল আচরণ, ঝগড়া-বিবাদ, অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করে।

---

৮১ মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৫১

৮২ মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪০০

৮৩ মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৫১

৪. রোযা রোযাদারের জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল: যেমন হাদীসে এসেছে, 'রোযা হল ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দূর্গ।'[৮৪]

৫. রোযা জান্নাত লাভের সহজ পথ: হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন: "তুমি রোযা পালন কর। কেননা, এর সমকক্ষ আর কোনো কাজ নেই।"[৮৫]

৬. আল্লাহর কাছে রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ মেশকের চেয়েও উত্তম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যার হাতে মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।"[৮৬]

মুখের গন্ধ বলতে পেট খালি থাকার কারণে যে গন্ধ আসে সেটাকে বুঝায়। দাঁত অপরিষ্কার থাকার কারণে যে গন্ধ সেটা নয়।

৭. ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মাধ্যম রোযা: যেমন হাদীসে এসেছে, "রোযা পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ: একটি হল ইফতারের সময় অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।"[৮৭]

৮. রোযাদারের জন্য রোযা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে: এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "রোযা ও কুরআন কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, রোযা বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ

---

৮৪ আহমদ, gmbv', পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ৯২১৪

৮৫. মূল হাদীস: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.-নাসায়ী, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ২২২০

৮৬. মূল হাদীস: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.-*বুখারী, আস-*গnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-১৭৯০, মুসলিম, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ১১৫১

৮৭. মূল হাদীস: للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه eLvix, Avm-mnxn, c‡ev³, হাদীস নং- ১৭৯০; মুসলিম, Avm-mnxn, c‡ev³, হাদীস নং- ১১৫১

কবুল কর। কুরআন বলবে হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন: অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।"[৮৮]

৯. গুনাহ মাফের কারণ ও গুনাহের কাফফারা হলো রোযা: রোযা হল অনেক নেক আমলের সমষ্টি। আর নেক আমল পাপকে মুছে দেয়। আল্লাহ বলেন: "সৎকর্ম অবশ্যই পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়।"[৮৯]

বহু হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, নেক আমলকে বিভিন্ন ছোট খাট পাপের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ নেক আমলের কারণে গুনাহগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে, "মানুষ যখন পরিবার–পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন–সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে, তখন সালাত, রোযা, সদকা সে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।"[৯০]

আর রমযান তো গুনাহ মাফ ও মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 'যে রমযান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা পালন করবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[৯১]

ইহতিসাবের অর্থ হল: আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্ট চিত্তে রোযা ও কিয়াম আদায় করা। হাদীসে আরো এসেছে, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান হল মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা, যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।"[৯২]

১. ২. ৪. হজ্জ

১. ২. ৪. ১. হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

---

৮৮ আহমদ, Avj-gmbv', c‡ev³, হাদীস নং- ৬৬২৬

৮৯ আল-কুর'আন, সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪

৯০ eLvix, Avm-mnxn, c‡ev³, হাদীস নং- ১৭৯৫; মুসলিম, Avm-mnxn, c‡ev³, হাদীস নং-৭৪৫০

৯১ eLvix, Avm-mnxn, cv¸³, হাদীস নং-২০১৪; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১৭

৯২ মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭৪

হজ্জ (حج) শব্দটি আরবি শব্দ। (ح-ج-ج) শব্দমূল থেকে বাবে نصر এর মাসদার। লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন: الحج: القصد বা ইচ্ছা করা, حج إلينا فلان أى قدم বা আগমণ করা।[৯৩] মোটকথা হজ্জের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ বলেন: الحج لغة: القصد إلى معظم অর্থাৎ: হজ্জ অর্থ হচ্ছে, মহান কাজের নিয়াত বা ইচ্ছা করা।[৯৪]

হজ্জের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন: "তাওয়াফ এর নিয়তে মক্কা শরীফ পরিভ্রমণ করাকে হজ্জ বলে।"[৯৫]

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, হজ্জ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত তারিখ ও নির্ধারিত নিয়মে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহকে যিয়ারত করা।

১. ২. ৪. ২. হজ্জের ফযীলত ও গুরুত্ব

হজ্জের ফযীলত ও মর্যাদা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্জ আদায় করে এবং হজ্জের কার্যাবলি আদায়কালে কোনোরূপ অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজে লিপ্ত না হয়, সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করল।"[৯৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এক উমরা থেকে অন্য উমরা আদায় করা পর্যন্ত অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারাহ এবং মাকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৯৭]

অন্য হাদীসে আছে: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করে সে যেন তাড়াতাড়ি আদায় করে।"[৯৮]

---

৯৩ ইব্ন মানযুর, wjmvbj Avie, c‡ev³, পৃ. ৫৬

৯৪ আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ, i|nÏxb Avj-Bmjvgx, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

৯৫ সাইয়্যেদ সাবিক, wdKûm-mbvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

৯৬ বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ১৪২৪

৯৭ বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ১৬৫০

৯৮ আবু দাউদ, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ১৪৭২

অপর এক হাদীসে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ আল্লাহর মেহমান। তারা যে দুআ করে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।"[৯৯]

হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা দ্রুত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীআত সম্মত ওজর ব্যতীত শুধু অলসতা বা পার্থিব স্বার্থের কারণে যদি কেউ হজ্জ আদায় না করে তবে সে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মতই হবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أم سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا

অর্থাৎ অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক কিংবা কঠিন রোগ যদি কাউকে হজ্জ পালনে বিরত না রাখে, আর সে হজ্জ পালন না করে মারা যায়, তবে তার যেন ইয়াহুদী বা নাসারাদের মতই মৃত্যু ঘটে।[১০০]

সুতরাং শর্ত অনুযায়ী হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে তা আদায় করা একান্ত কর্তব্য। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার পর যদি কেউ তা আদায় না করে মারা যায়, তাহলে ফরয ত্যাগ করার কারণে সে মারাত্মক পাপের অধিকারী হবে এবং ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ হচ্ছে পঞ্চম। এটা হচ্ছে আর্থিক ও দৈহিক ইবাদত। এতে যেমন অর্থ ব্যয় হয়, তেমনি হয় দৈহিক পরিশ্রম। তাই দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। নামায রোযা ও যাকাত আদায়ের পর একজন মু'মিন বান্দা অন্তরের অনাবিল শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে গমন করেন পবিত্র কাবায়। এখানে একজন মানুষ বান্দা হিসেবে আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরই আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো প্রশ্ন না তুলে ঘুরে বেড়ায় কাবার চারপাশে, চুম্বন করে কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ; সায়ী করে সাফা ও মারওয়ায়, ছুটে যায় আরাফাহ, মুযদালিফা ও মিনার ময়দানে, পশু কুরবানীর সাথে সাথে কুরবানী দেয় নিজের সকল পাশবিকতা। এমনিভাবে সে তার খিলাফতের দায়িত্বকে উপলব্ধি করার জন্য আরাফার ময়দানে শামিল

---

৯৯ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ, Avm-mbvb, (দারুল ফিকর, বৈরুত, তাবি), হাদীস নং: ২৮৮৩

১০০ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ 'আব্দির রহমান আদ-দারিমী, Avm-mbvb, (বৈরুত: দারুল্ কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭, প্রথম সংস্করণ), হাদীস নং: ১৭১৯

হয় মুসলিম উম্মাহর মহাবিশ্ব সম্মেলনে। সেখানে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভাষায় ভাষায়, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে মহামিলন। ইহরামের একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে সব ধরনের ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে যায় সকলেই। সেখানে সারা বিশ্বের মুসলমানের খোঁজ-খবর নিতে পারে একজন আরেকজন থেকে। তারা নিজেদের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায় আর সেই আলোকে নিতে পারে সমস্যাসমূহের সমাধান।[১০১]

বস্তুত হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশ্ব সম্মেলন এবং ইসলামী ঐক্যের প্রতীক। এ ধরনের মহাসম্মেলন অন্য কোনো ধর্ম বা জাতির মধ্যে কখনো অনুষ্ঠিত হয় না। একমাত্র তৌহিদবাদী মুসলিম জাতিই পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে ছুটে আসে কাবায় পরম করুণাময়ের নৈকট্য লাভের আশায়।এখানে বর্ণ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে একই সুরে উচ্চারণ করেন, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লাশারীকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিআমাতা লাকা ওয়ালমুলক, লাশারীকা লাক – আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির। আমি হাজির। কোনো শরীক নেই আপনার, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই, আর সকল সাম্রাজ্যও আপনার, কোনো শরীক নেই আপনার।

অশ্রুসিক্ত নয়নে লক্ষ লক্ষ আল্লাহ প্রেমিক বান্দার কণ্ঠের এ আওয়াজ কাবায় ধ্বনিত হয়ে আরশে মুয়াল্লা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর তখন আল্লাহ তার বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন: হে আমার প্রিয় বান্দা ! আমি তোমার সাথেই আছি। আজ তুমি যা চাও তা আমি তোমাকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইহরাম অবস্থায় কোনো ভেদাভেদ থাকে না। দুইখানা সাদা কাপড় পরিহিত লক্ষ লক্ষ মানুষ একই কাতারে কাধে কাধ মিলিয়ে ইবাদতের এ দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ভাষা ও বর্ণে ব্যবধান থাকলেও পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, হাতে হাত মিলিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

১. ২. ৫ যাকাত

১. ২. ৫. ১ যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

---

[101] প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, Av‡gwiKvi AvMvmb gmwjg D¤§vni Kg‡Kškj, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত শব্দের অর্থ শুচিতা ও পবিত্রতা, শুদ্ধি ও বৃদ্ধি। যাকাত শব্দটি আরবি (ز-ك-و) শব্দমূল হতে গঠিত। এটি বাবে ضرب এর মাসদার। অর্থ পরিবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, কোনো জিনিসের উত্তম অংশ।[১০২]

লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন: زكاة المال معروفة وهو تطهيره অর্থাৎ মাল বা সম্পদকে পবিত্র করা।[১০৩]

আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ বলেন: الزكاة:صدقة والصدقة زكاة অর্থাৎ যাকাত হচ্ছে সাদ্‌কাহ আর সাদ্‌কাহ হচ্ছে যাকাত।[১০৪]

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন: "শরীআতের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাকাত পাবার যোগ্য লোকদের ফরযকৃত নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ প্রদান করাকেও যাকাত বলা হয়।"[১০৫]

সাইয়্যেদ সাবিক বলেন: .الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء "যাকাত হচ্ছে এমন সম্পদের নাম যা আল্লাহ্‌র আদেশে ফকীর তথা গরীবদেরকে মানুষ ধন দিয়ে থাকে।"

আল-আজহাবীর মতে, যাকাত দরিদ্রকেও প্রবৃদ্ধি দান করে। দরিদ্রের জন্য বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি ব্যক্ত করে, এ শব্দটি এ অর্থের দিকে সুন্দর এক দৃষ্টিপাত বা ইঙ্গিত করে। সেই সাথে ধনশালী ও বিত্তবান ব্যক্তির মনে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করে একথাও বুঝায়।[১০৬]

এককথায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোনো নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলে।

১. ২. ৫. ২. যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব

যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব তারা তিন প্রকার:

---

১০২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত Bmjvgx wek‡Kvl, ২১শ খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯৯), পৃ. ৪৭৫

১০৩ ইব্‌ন মানযুর, wjmvbj Avie, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১০৪ আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, i“nÏxb Avj-Bmjvgx, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩

১০৫. আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, Bmjv‡gi hvKvZ weavb, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রাহীম, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম খণ্ড, ২০০০ ইং), পৃ. ৪৬

১০৬ সাইয়্যেদ সাবিক, wdKûm-mbœvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

১. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

২. যাদের সম্পদের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। তবে ফসলের ক্ষেত্রে এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয় বরং ফসলের যাকাতের সম্পর্ক ফসল পাকার সাথে।

৩. ফলের যাকাত ওয়াজিব হয় যখন তা পরিপক্কতা লাভ করে এবং খাওয়ার উপযোগী হয়।

৪. যাকাত ওই সব লোকের ওপর ওয়াজিব হয় যাদের নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তৎসমান অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বছর যাবৎ রিজার্ভ বা জমা আছে।

১. ২. ৫. ৩. যাকাতের তাৎপর্য

যাকাত ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে একটি। যাকাত ছাড়া দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। যারা যাকাত অস্বীকার করে তাদের হত্যা করা হবে এবং যারা যাকাতের ফরয অস্বীকার করে তাদের কাফের বলে গণ্য করা হবে। যাকাত ফরয করা হয় ২য় হিজরিতে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় ইরশাদ করেছেন:

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ

"আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর।"[১০৭]

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায এবং রোজার সম্পর্ক মানুষের দৈহিক পরিশ্রম ও মনের সাথে সম্পৃক্ত, পক্ষান্তরে যাকাত ও হজ্বের সম্পর্ক অর্থের সাথেও রয়েছে। বিশেষভাবে যাকাত ধনী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ওপরই ফরয হয়ে থাকে।

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। একজনের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ জমা হওয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম চায় ধনী-গরিব সবাই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুক। তাই দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। হযরত আবু সায়ীদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নসিহত করছিলেন। তিন বার শপথ করে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অবশ্যই বেহেশতের দরজা খুলে দিয়ে বলবেন, তোমরা নিরাপদে তাতে প্রবেশ কর।"[১০৮]

---

১০৭ আল-কুর'আন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩

১০৮. নাসায়ী, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ২৩৯৫

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالُك أنا كنزك

“আল্লাহ তা‘আলা যাকে সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামত দিবসে তার সম্পদকে দুই চোখ বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত করা হবে। তারপর সাপটিকে কিয়ামতের সে দিবসে তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। সাপ তার দুই মুখে দংশন করতে করতে বলতে থাকবে, আমি তোমার বিত্ত, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ।”[১০৯]

যাকাত গরিবের প্রতি কোনো করুণা নয় বরং তা তার হক-যা ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, ““যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে একটি উটের রশিও যাকাত হিসেবে আদায় করত আর এখন তারা যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।”[১১০]

তার এ ভাষণের মর্মার্থই ছিল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা যাতে কেউ কাউকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করতে না পারে।

১. ২. ৫. ৪. যাকাত ফরয হওয়ার হিকমত

যাকাত ফরয হওয়ার পেছনে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। যেমন– সম্পদ উপার্জনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়েছে। আর এ তারতম্য কমিয়ে ধনী-গরিবের মাঝে ভারসাম্য আনার জন্য মহান আল্লাহ যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দেখা যায়, কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ছে, অর্থ-কড়ি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত আছে এবং প্রাচুর্যের চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছে আর কিছু লোক দারিদ্র্য সীমার একেবারে নীচে অবস্থান করছে। মানবেতর জীবন যাপন করছে। আল্লাহ এ ব্যবধান দূর করার জন্যই তাদের সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমে যায় এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। অন্যথা দেশে বা সমাজে হিংসা–বিদ্বেষ, ফিতনা–ফাসাদ ও হত্যা–লুণ্ঠন ছড়িয়ে পড়বে। বিঘ্নিত হবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতি।

---

১০৯. বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৬৪, হাদীস নং- ৪২৮৯

১১০. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩১২

এছাড়া যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, যাকাত মানুষকে কৃপণতা থেকে বিরত রাখে। মানুষকে পরোপকারী, অন্যের ব্যথায় সমব্যথী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হতে সাহায্য করে।

অধিকাংশ দেশেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় যাকাত দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহায়তা করে দারিদ্র্য দূর করতে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ভাবমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে এবং আত্মমার্যাদা ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়।

যাকাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ এবং ধন-সম্পদের বরকত বাড়িয়ে দেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সদকা করার কারণে কখনো সম্পদ কমে না।" দান-খয়রাত করলে সম্পদের পরিমাণ কমলেও সম্পদের বরকত কমে না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পদকে তার ভবিষ্যতের জন্য বরকতময় করে দেন এবং তার দান খয়রাতের কারণে তাকে এর চেয়ে উত্তম সম্পত্তি দান করেন।

যাকাত একটি সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই বর্তমান অর্থব্যবস্থার সব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানাবিধ সমস্যার যুৎসই সমাধান।

যাকাত আদায় করা মুমিনদের বিশেষ গুণ। যাকাত আদায় করা আল্লাহর ঘর আবাদকারীদের বিশেষ গুণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন করিমে তাদের সম্পর্কে বলেন: "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর ঘরের আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে ও যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না।"[১১১]

১. ২. ৫. ৫ যাকাতের বিবিধ উপকারিতা

১. দারিদ্র্য বিমোচন: আগেই উল্লেখ করেছি যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। ধনী-গরিবের মধ্যকার বৈষম্য দূর করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর ধনীদের শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধে সহায়তা করে। 'ধনীরা আরো ধনী আর গরিবরা আরো গরিব' হওয়ার নীতিহীন সনাতনী ধারা বন্ধ করতে পারে একমাত্র এ যাকাত ব্যবস্থা। ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান মাত্র চল্লিশ ভাগের একভাগ। অর্থাৎ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট চল্লিশ লাখ টাকা থাকলে সেক্ষেত্রে অপর জনের নিকট এক লাখ টাকা

১১১ আল-কুর'আন, সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১৮

থাকবে। এভাবে ঠিক মতো যাকাত আদায় করা হলে ক'দিন পরে গরিব বা যাকাত গ্রহণ করার মত লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

২. যাকাতের দ্বারা মানুষের সম্পদ বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তাদের সম্পদ হতে আপনি যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদের পবিত্র করবে এবং করবে তাদেরকে পরিশুদ্ধ।" মানুষের সম্পত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা আর মরীচিকার প্রবেশ ঘটে। এসব দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেছেন। সেহেতু যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সম্পত্তি কলুষ ও আবর্জনামুক্ত এবং পবিত্র হয়।

৩. যাকাত মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করেঃ যাকাত আদায় করার দ্বারা মানুষের ধন-সম্পদ বাড়তে থাকে। বরকতে কানায় কানায় ভরে ওঠে মানুষের সম্পদ।

৪. যাকাত মানুষকে কৃপণতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেঃ যাকাত আদায়ের মাধ্যমে কৃপণতা দূর হয়। মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের উদ্রেক হয়। সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত প্রলম্বিত হয়।

১. ২. ৫. ৭. যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধু যাকাত আদায় করার জন্য তাগিদ প্রদান করেননি বরং যাকাতের অর্থ বণ্টনের খাতগুলোও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"[১১২]

উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে।

১। ফকীর : যাদের অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়, লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না তাদেরকে ফকীর বলে। যাকাত দিয়ে দরিদ্র, অভাবী, ফকীর শ্রেণির পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১১২] আল–কুরআন, সূরা তওবা, আয়াত: ৬০

ওয়াসাল্লাম বলেন: "মুসলিম সমাজের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

২। মিসকীন: মিসকীন বলতে দৈহিক অক্ষম বিত্তহীন ব্যক্তিদের বুঝায়। যেমন-বিত্তহীন, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকীন বলা হয়।

৩। যাকাত আদায়কারী কর্মচারী: যারা যাকাত আদায় ও বণ্টন করে এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের বেতন-ভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৪। নও মুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা: যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে নও মুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। যে কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আশা করা হয়। অথবা যাকাতের দ্বারা যার ঈমান কিংবা ইসলাম বা তার অনুরূপ ব্যক্তির ইসলাম মজবুত হওয়ার আশা করা যায়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যাকাত হতে তাদেরকে প্রদান করতে হবে।[১১৩]

৫। দাসত্ব মোচন: যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে বা কোনো ভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায়।

৬। ঋণমুক্তি: অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য ঋণ করে তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তাদের ঋণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৭। আল্লাহর পথে (ফী সাবিলিল্লাহ): এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এর ব্যাখ্যাও বিস্তৃত। সাধারণভাবে এটা জিহাদের অর্থ বুঝায়। আল-কুরআনুল কারীমে যত স্থানে জিহাদের কথা এসেছে সবখানে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে। তবে আভিধানিক অর্থে একে জিহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সকল প্রকার কল্যাণময় ও নেক কাজকে এর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একে কায়েম রাখার জন্য যেসব বিশাল কাজের আঞ্জাম দিতে হয় সে জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।[১১৪]

অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত দল ও সংগঠন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মর্যাদা পেতে পারে; যদি তাদের নীতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহর

---

[113] আহমাদ সাজ্জাদ, hvKvZ : bZb weke¨e¯'vi Av‡jv‡K, (ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৫), পৃ.২৪

[114] প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, Av‡gwiKvi AvMvmb gmwjg D¤§vni Kg‡KŠkj, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮

যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম ও দ্বীনের কালেমাকে সমুন্নতকরণ। এক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দাওয়াতের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় একটি বড় ক্ষেত্র। মূলত ইসলামী অনুশাসন যেখানে উপেক্ষিত, যেখানে ইসলামী আদর্শকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে ইসলামের সঠিক আদর্শ ও নীতিকে জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্য দাওয়াতী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন ফি সাবিল্লিাহর অর্ন্তভুক্ত। যারা ইসলামের নীতি, আদর্শ ও বিধানকে যুগপোযোগী ভাষা, রীতি ও পদ্ধতিতে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শিক সাহিত্য রচনা এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণসমূহ কাজ করতে সক্ষম। এমনকি নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংসকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিপরীতে আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া গঠন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী ও কথা প্রচারের কাজে নিয়োজিত প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ এখানে ব্যয় করা যেতে পারে।

৮। মুসাফির (ইবনুস সাবীল): যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে সর্বশেষ খাত হচ্ছে 'মুসাফির' পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ খাতকে বলা হয়েছে ابن السبيل (ইবনুস সাবীল) এর অর্থ পথে চলমান ব্যক্তি, ভ্রমণকারী বা পর্যটক। সফর বা ভ্রমণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন:

১) আল্লাহর দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা।

২) পড়ালেখার জন্য ভ্রমণ করা।

৩) চাকরি বা জীবিকার্জনের জন্য ভ্রমণ করা।

৪) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রহস্য অবলোকনের জন্য ভ্রমণ করা।

ইবনুস সাবীলে উল্লিখিত সব দলই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য এক শহরে বা দেশে প্রবেশ করেছে যেখানে তার কোনো সহায় সম্বল নেই। নিজের দেশে তার অনেক কিছু থাকলেও এখানে তা ব্যবহার করতে পারছে না; তাকেই ইবনুস সাবীল বা মুসাফির হিসাবে গণ্য করা হয়। সফরকালীন তার রসদপত্র, খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তা সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। তবে তার সফরটি শরীআ অনুমোদিত হতে হবে।[১১৫]

---

[115] আহমাদ সাজ্জাদ, hvKvZ : bZb weke¨e¯'vi A\‡j\‡K, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

সকল মুসলিম একমত যে, যাকাত একটি ফরয বিধান। সুতরাং যাকাত ফরয জেনেও যদি কোনো ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে যাকাত প্রদানে কৃপণতা করবে বা পরিমাণের চেয়ে কম দিবে, সে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

১. ৩. ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলি

১. ৩. ১. ইসলাম সার্বজনীন ও কল্যাণধর্মী

ইসলামের আহবান সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্যে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবতার জন্যে। আল-কুরআনের ভাষায়: "বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।"[১১৬]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: "যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।"[১১৭]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "এবং আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।"[১১৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও জাতীয়তা ভেদে সব মানুষ সমান। ইসলাম নিজেকে বিশ্বমানবতার বিবেক রূপে দাবি করে এবং গোত্র মর্যাদা ও সম্পদের ভিত্তিতে সৃষ্ট মিথ্যা বাধাসমূহ অপসারিত করে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, এ ধরনের বাধা সব সময় ছিল, এমনকি আজকের দিনে তথাকথিত সুসভ্য যুগেও আছে। ইসলাম এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে এবং দাবি করে যে, সকল মানুষ এক আল্লাহর পরিবারভুক্ত (বান্দা)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:"সকল মানুষ আদম সন্তান আর আদম (আ) মাটির তৈরি।"[১১৯]

---

১১৬. আল-কুর'আন, সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৮

১১৭. মহান আল্লাহ্ বলেন:.لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيراً - Avj-Ki‌Avb, সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ১

১১৮. মহান আল্লাহ্ বলেন:.وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالَمِيْنَ - Avj-Ki‌Avb, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭

১১৯. মূল হাদীস:.والناس بنو آدم وآدم من تراب -তিরমিযি, Avm-mbvb, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ৩৮৯১

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: “তোমরা দুনিয়াবাসীর উপর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার কর আল্লাহও তোমাদের দয়া করবেন।”[১২০]

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেদন আন্তজার্তিক বর্ণ, গোত্র, রক্ত সম্পর্ক অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভেদ যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের পূর্বে ছিল প্রবলতর এবং বিভিন্ন চেহারায় আজকের যুগেও তার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। ইসলাম এসবের স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম সব মানুষকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। জাতিগত শত্রুতা ও কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এ পৃথিবীকে ইসলাম আহবান জানায়, জীবন ও আশার পথে এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।[১২১]

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক টয়েনবি কতকগুলো চমৎকার মন্তব্য রেখেছেন। ‘সিভিলাইজেশন ইন ট্রায়াল’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘দু’টি সুস্পষ্ট সংকট দেখা দিয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক অপরটি বস্তুগত। কসমোপলিটন প্রলেতারিয়েতের (তথা পাশ্চাত্য মানবতা) যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে গোষ্ঠী সচেতনতা ও অ্যালকোহল। এ দু’টি কুৎসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামী চেতনা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে, যা ভেবে দেখার বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজে যদি তা গৃহীত হয়, তবে উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে।

মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার বিলোপ ইসলামের উল্লেখযোগ্য নৈতিক সাফল্য। সমকালীন দুনিয়ায় যা ঘটছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইসলামের এ নীতি প্রচার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এটা সহজেই বোধগম্য যে, ইসলামী চেতনা সৃষ্টির কাজ হবে বিশ্বে শান্তি ও সহনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

অ্যালকোহলের কুপ্রভাব এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ তাকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ অরোপ করেও কোনো একটা সম্প্রদায়কে সামাজিক অনাচার থেকে মুক্ত করা যায় না, যতক্ষণ না তাদের মুক্তির আকাঙ্খা থাকে, সে আকাঙ্খাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তৎপরতায় রূপায়িত করার

১২০. মূল হাদীস:.ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء -তিরমিযি, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ১৮৪৭

১২১. ড. মোঃ রেজাউল করিম, Bmjvg I AvawbK wek, (ঢাকা: সুচয়ন, ২০০৮), পৃ.৩

ইচ্ছা সৃষ্টি না হয় এবং সে জনগোষ্ঠীর অন্তর থেকেই নেটিভদের ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি কমই আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রেও ইসলাম যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

১. ৩. ২. ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা বা ফিতরাত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা-ই হল 'ফিতরাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[১২২]

আল-কুরআনে মানুষের ঐ সুপ্ত প্রেরণাকে তৃপ্ত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে: "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর ফিতরাত তথা প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[১২৩]

এখানে ফিতরাত বা ইসলামের কথা উল্লেখ করে হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে উচ্চতর শক্তির সামনে আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিআপ্লুত হৃদয়ে সে নিজেকে একান্ত করে সঁপে দিয়ে পেতে চায় আত্মিক পরম তৃপ্তি। এ সুপ্ত প্রেরণা-জযবাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে কখনও কখনও মানুষ হয়েছে দিকভ্রান্ত। কেউ তো চন্দ্র-সূর্যকে মহাশক্তি মনে করে সেগুলোর কাছে মাথা নত করেছে। কেউবা আগুনের পুজা করেছে। আবার কেউ নিজের চাইতে অধিকতর শক্তিমান মানুষের পুজায় আত্মনিয়োগ করেছে। কখনো তারা নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করে সেগুলোর সামনে নতশির হয়েছে। আবার কখনো অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে প্রভূ বলে ঘোষণা করেছে। এককথায়, মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা

---

১২২. রাসূলুল্লহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: .كل مولود يولد على الفطرة -বুখারী, Avm-mnxn, পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ১২৯৬

১২৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ.- Avj-Ki0Avb, সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান করেছে। মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে মানুষের এ সহজাত প্রেরণার চাহিদা এটাই ছিল যে, মানুষ এমন এক মহান ও শাশ্বত সত্তার সামনে নিজেকে উৎসর্গিত করবে যিনি সকল শক্তি, সকল ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের উৎস; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে যাঁর অবস্থান, যিনি মানুষের সকল দাবি ও চাহিদা পূরণে এবং তাদের সহজাত প্রেরণা ও উচ্ছ্বাসকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। এ পূর্ণতম সত্তাই হলেন মহান রাব্বুল আলামীন-সারা জাহানের পালনকর্তা।

১. ৩. ৩. ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।”[১২৪]

ইসলাম এমন এক জীবনাদর্শ যেখানে মানুষ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কোনো একটি মুহূর্তও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে থাকতে পারে না। মুসলমানদের জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র ফেলে রাখা হয়নি, যেখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের সাথে তার আখিরাতের ভাগ্য জড়িত নয়। মোটকথা, ইসলামে এমন কোনো পরিত্যক্ত বিষয় নেই, যার উপর ধর্ম কোনো দাবি পেশ করেনি। একারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন: “হে

---

১২৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - Avj-KiÔAvb, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩

বিশ্বাসীগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”[১২৫]

ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপনের ইসলামের এ ধারা ও ধারণা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা এনে দিয়েছে। এর আগে মনে করা হতো যে, বস্তু ও ভাব পরস্পরবিরোধী সত্তা। ধর্মের কাজ আত্মাকে নিয়ে, মানুষের পার্থিব কাজ-কর্মের ব্যাপারে ধর্মের কিছুই করার নেই; এগুলো পাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[১২৬] ইসলাম এ ধারা বদলে দিয়েছে পুরোপুরি।

ইসলাম মানুষকে স্বেচ্ছায় ও দ্বিধাহীনভাবে দুনিয়ায় বসবাস করতে বলে। দুনিয়ায় সব কিছু থেকে উদাসীন, স্থবির ও ছেড়ে-ছুঁড়ে দেয়ার মনোভাবের স্বীকৃতি এধর্মে নেই। মানুষ হবে জীবন সংগ্রামের একজন অংশীদার। এখানে বস্তুজগত বা ইন্দ্রিয় জগতকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করা হয় না বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে রূপায়িত করা হয়। ইসলামের মতে, এ দুনিয়া কোনো নির্যাতন সেল নয় যে, মৌলিকভাবে দুর্বল মানব জাতি তার আত্মার দোষ স্খলনের জন্যে সমাজে বসবাস করতে হবে। এ দুনিয়ার সকল সম্পদ মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত, যার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং পার্থিব জগতকে ত্যাগ করা যাবে না বরং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। দেহ আত্মার জন্যে বন্দীখানা নয় বরং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে একটি ফলদায়ক উপকরণ। ইসলাম এ বিষয়ে দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মের স্পষ্ট বিরোধী। অন্যান্য ধর্মে জীবনকে অস্বীকৃতি ধার্মিকতার তুল্য অথচ ইসলামে ধার্মিকতার অর্থ জীবনে বিশ্বাস করা এবং নিঃশঙ্ক ও সানন্দচিত্তে দৃঢ়তার সাথে নিজেকে তাতে সমর্পণ করা। একদিকে রয়েছে জীবনকে আপসহীনভাবে অস্বীকৃতি জানানো, অপরদিকে রয়েছে তুলনাহীন আশা ও আকাঙ্খা।

ইসলাম মানুষের মনে প্রথমেই যে বিষয়টির ছাপ ফেলে তাহলো, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তা কোনো তুচ্ছ কারণে সৃষ্টি করা হয়নি, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

১২৫. Avj-KiÕAvb, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০৮

১২৬. ড. মোঃ রেজাউল করিম, Bmjvg I AvawbK wek, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

আল্লাহ ইরশাদ করেন: "আসমান ও যমীনে এবং যা এর অন্তবর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম, আমি তা করিনি।"[১২৭]

পবিত্র কুরআনের সূরা 'দুখান'-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্যে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[১২৮]

এরপর পবিত্র কুরআনে মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?"[১২৯]

আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে শুধুমাত্র একটি খোদায়ী উদ্দেশ্য সাধনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কোনো খুঁত বা ক্রটি নেই। বস্তু জগতের ক্ষুদ্র কণা থেকে শুরু করে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কি আশ্চর্য সুন্দরভাবেই না সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে উন্নত জীবকুলের সকলেই আল্লাহর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার প্রকাশ মাত্র। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: "তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি জ্ঞানত প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"[১৩০]

এ আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যায় মানুষ পাপী নয়। এগুলো সুন্দর, যথার্থ এবং যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে কাজের উপযোগী। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে, এমনকি মালায়িকা বা ফেরেশতাগণকে তার প্রতি অভিবাদন জানাতে বলা হয়েছিল। দুনিয়ায় যা কিছু

---

১২৭. মহান আল্লাহ্ বলেন: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. - Avj-KiÔAvb, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৬ -১৭

১২৮. মহান আল্লাহ্ বলেন: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. - Avj-KiÔAvb, সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩৮-৩৯

১২৯. Avj-KiÔAvb, সূরা আল-ম'মিনুন, আয়াত: ১১৫

১৩০. Avj-KiÔAvb, সূরা আস-সিজদা, আয়াত: ৬-৭

আছে সব কিছু তারই সেবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামের মতে মানুষের আজন্ম কোনো কলঙ্ক বা তার কোনো পূর্ব পুরুষের পাপের পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে না।[১৩১]

ইসলামের মতে মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। দৈহিক কামনা মানব প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা কোনো আদি পাপের ফলশ্রুতি নয়, সুতরাং এগুলো মানুষের জন্যে ইতিবাচক, তাই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে এবং আত্মিক উন্নতির জন্যে সংগতভাবে ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম বলে যে, দৈহিক চাহিদাকে দমন করে পরহেজগার হওয়া যায় না। ইসলাম মানুষের দৈহিক চাহিদাকে আত্মিক চাহিদার সাথে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করতে চায় যেন জীবনকে সৎ ও পূর্ণতায় ভরে দেয়া যায়। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতকে নিজেদের জন্যে নিষিদ্ধ না করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: "বল আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্যে যে শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছেন। বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে, এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে তাঁর শরীক করা-যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি। এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নাই।"[১৩২]

দৈহিক চাহিদাসমূহ মানুষের ব্যক্তিত্বের অবিভাজ্য অংশ এবং ইন্দ্রিয় কামনাসহ স্বভাবগত অন্যান্য বিষয়ের সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামের মতে বস্তুজগতে আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতকে উপেক্ষা করার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই বরং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা বা পরিহার করে চলার মধ্যেই প্রকৃত পুণ্য নিহিত রয়েছে। রিপুর চাহিদা পূরণ করাকে ইসলামে সরাসরি নিন্দা করা হয়নি, যতদুর পর্যন্ত একজন মানুষ সংযত হতে পারে এবং নৈতিক সচেতনতার আলোকে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ততটুকু ব্যবহার করতে হবে।[১৩৩]

সংসার থেকে দূরে একাকিত্ব বরণ করে শুধুমাত্র ধ্যান উপাসনা ধারণা থেকে ইসলামী চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এ-তো তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে

১৩১. Avj-KiÖAvb, সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৬৪

১৩২. Avj-KiÖAvb, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৩২-৩৩

১৩৩. Avj-KiÖAvb, সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৫১

অথচ আমি এর বিধান দেইনি, (নির্দেশ দিয়েছিলাম) দিয়েছিলাম শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজতে, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে করেনি, তাদের তা করা উচিত ছিল।"[১৩৪]

আল্লাহ অবশ্যই মানুষকে অলসভাবে সুখভোগ থেকে দূরে থাকতে এবং তার ইন্দ্রিয় আকাঙ্খাগুলোকে পুরো নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলেছেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সে উদ্দেশ্যহীন অবসাদগ্রস্ত জীবন যাপন করবে বা শুধু নীরবে উপাসনা করে যাবে। সংঘাতমূখর এ দুনিয়ায় নিষ্কলুষ জীবন যাপনের মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে আগত বিভিন্ন বাণীতে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, "ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।"[১৩৫]

ইসলাম শান্তি সম্প্রীতির ধর্ম। এ কথা বুঝা ও বুঝানোর জন্যে খুব বেশি গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামে মানবাধিকার বলতে তা বুঝায় যা ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শামিল করে থাকে। ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য। এককথায়, মানবজাতির মধ্যে সুখ–শান্তি ও সৌহার্দ–সম্প্রীতি সৃষ্টির জরুরী ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এবং এ বিষয়টি অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে বড় ধরনের ভুমিকা পালন করে থাকে।

১. ৩. ৪. ইসলাম পরিপূর্ণ আদর্শ

সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করে যে, পার্থিব জীবনের গণ্ডিতে থেকেই ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণতা লাভ সম্ভব। খ্রিস্টীয় শিক্ষার মত ইসলাম তথাকথিত দৈহিক কামনার অবদমন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা লাভকে স্থগিত রাখে না অথবা হিন্দু ধর্মের মত ক্রমগত উচ্চতর পর্যায় জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয় না, ইসলাম বৌদ্ধ ধর্মের সাথেও একমত নয়, যেখানে ব্যক্তিগত আত্মার নির্বাণ লাভ ও পৃথিবীর সাথে তার আবেগতাড়িত সংযোগসমূহ ছিন্ন করে জীবনের পূর্ণতা ও মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে না। ইসলাম অত্যন্ত জোরালো এবং দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে যে, মানুষ ব্যক্তিগত ও পার্থিব সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই পূর্ণতায় পৌছতে পারে।

'পূর্ণতা' কথাটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জীবতাত্তিকভাবে মানুষের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অবিমিশ্র পূর্ণতার কথা বিবেচনা করতে পারি না, কারণ যা

---

১৩৪. Avj-KiÖAvb, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৭

১৩৫. আহমদ, Avj-gmb', পূর্বোক্ত, হাদীস নং: ২৪৭০৬

কিছু পূর্ণতা, তা শুধু আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক দিক থেকে মানবীয় পূর্ণতা হবে অবশ্যই আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগতভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এতে সকল প্রকার চিন্তনীয় গুণরাজির অধিকার লাভ করা বা অর্জন করা বুঝায় না বা বাইরে থেকে ক্রমাগত নিত্য নতুন গুণ আয়ত্ত করা বুঝায় না বরং ব্যক্তির আগে থেকেই যেসব গুণের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল তারই পূর্ণ বিকাশ বুঝায় –যাতে করে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহ জাগ্রত হতে পারে। জীব–প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য হেতু প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব সহজাত গুণের ক্ষেত্রে আলাদা।

উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের এ নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে এ ধারণা যে, মানুষ মূলত অপরিহার্যরূপে সৎ। অন্যদিকে খ্রিস্টধর্ম মনে করে মানুষ পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে অথবা হিন্দু ধর্মের শিক্ষানুসারে সে মূলত নীচ ও অপবিত্র। তাই পূর্ণতা অর্জনের জন্য তাকে ক্রমাগত একটি বেদনাদায়ক জন্মান্তরের পথ অতিক্রম করতে হয়। ইসলাম এ সকল ধারণার সরাসরি বিরোধিতা করে এবং বলে, প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করে পবিত্র হয়ে, তার ভেতর থাকে পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করি সর্বোত্তম উপাদানে।"[১৩৬]
কিন্তু পরক্ষণেই বলা হয়েছে: "পরে আমি তাকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায় আনয়ন করি।"[১৩৭]

উপরিউক্ত আয়াতে এ তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে যে, মানুষ মূলতঃ সৎ ও পবিত্র এবং আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও সৎ কর্মের অভাবে তার মৌলিক পূর্ণত্ব ক্ষুন্ন হয় পক্ষান্তরে মানুষ যদি সচেতনভাবে আল্লাহর একাত্ম অনুধাবন করে এবং তার বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে, তাহলে তার মৌলিক পূর্ণত্ব রক্ষা করতে পারে বা অর্জন করতে পারে।

সুতরাং ইসলামের মতে পাপ কখনই মানুষের মৌলিক বা অপরিহার্য কিছু নয়। এগুলো মানুষ জন্মের পরবর্তী জীবনে অর্জন করে, আর তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে যে অন্তর্নিহিত সৎ গুণাবলি দান করেছেন তার অপব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই গুণসমূহ স্বতন্ত্র, যদিও সম্ভাবনার দিক থেকে তা সব সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আমরা স্বীকার করি যে, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থার দরূন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আমাদেরকে এনে দেবে পুরোপুরি নতুন গুণ ও শক্তি, যাতে আরো বেশি মানবাত্মার

---

১৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: .لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ- Avj-Ki0Avb, সূরা আত-ত্বীন, আয়াত: ৪

১৩৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: .ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ- Avj-Ki0Avb, সূরা আত-ত্বীন, আয়াত: ৫

অগ্রগতি সম্ভব হবে। কিন্তু এ হচ্ছে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত ব্যাপার। ইসলামী শিক্ষায় আমরা প্রত্যেক পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি, যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারি।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মানুষের আত্মিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে পার্থিব জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। খ্রিস্টীয় ধারণা থেকে এ ধারণা বড় বেশি স্বতন্ত্র। খ্রিস্টধর্ম মতানুসারে মানব জাতি আদম ও হাওয়ার কৃত পাপের উত্তরাধিকার বহন করে ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছে। ফলে সমগ্র জীবনকে দেখা হচ্ছে দুঃখের অন্ধকার উপত্যকা হিসেবে, অন্তত ধর্মতত্ত্ব অনুসারে জীবন হচ্ছে দুটি বিরোধী শক্তির সংগ্রাম ক্ষেত্র। পাপের প্রতীক শয়তান এবং কল্যাণের প্রতীক যীশুখ্রিস্ট। শয়তান দৈহিক লোভ দেখিয়ে শাশ্বত আলোকের পথে মানবাত্মার অগ্রগতি ব্যাহত করছে। আত্মা খ্রিস্টের অধিকারে আর দেহ হচ্ছে শয়তানি প্রভাবের লীলাভূমি। অন্যভাবে বলতে গেলে, বস্তুজগত হচ্ছে অপরিহার্যরূপে শয়তানের এবং আত্মিক জগত হচ্ছে আল্লাহর যা কল্যাণময়। মানব প্রকৃতিতে যা কিছু বস্তুগত বা খ্রিস্ট ধর্মতত্ত্বে যাকে রক্ত-মাংসের দেহ সংক্রান্ত বলা হয়েছে তা হচ্ছে অন্ধকারময় ও নারকীয় প্রিন্সের (শয়তানের) কুমন্ত্রণায় আদমের পতনের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মুক্তির জন্যে মানুষের আত্মাকে পার্থিব দুনিয়া থেকে আত্মিক জগতের দিকে ফেরাতে হবে। এভাবে যদি মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের আত্মাদানের দায় শোধ করা যায়।

আমরা জানি, মৌলিক পাপ বলতে ইসলামে কিছু নেই, এ ধরনের বক্তব্যকে আমরা মনে করি আল্লাহর ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা পিতার কৃতকর্মের জন্য সন্তানকে দায়ী করেন না, তাহলে কি করে তিনি এক দূরতম পূর্বপুরুষের কৃত অবাধ্যতার পাপের জন্য অসংখ্য যুগ ধরে সকল মানুষকে দায়ী করতে পারেন? নিঃসন্দেহে এ বিচিত্র ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু কোনো মুক্তবুদ্ধির লোকের কাছে এ ধারণা সব সময়ই থাকবে কৃত্রিম ও ত্রিত্ববাদের ধারণার মত অসন্তোষজনক। ইসলামের শিক্ষায় যেমন কোনো পাপের উত্তরাধিকার নেই, তেমনি মানব জাতির সার্বজনীন পাপ মুক্তির অবকাশও নেই। পাপমুক্তি ও অধঃপতন এ দুই-ই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মুসলিম নিজেই তার মুক্তিদাতা; তার অন্তরেই রয়েছে আত্মিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা মানব ব্যক্তিত্ব

সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "তার পক্ষে রয়েছে তাই, যা সে অর্জন করেছে আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে তাই যার জন্যে সে দায়ী।"[১৩৮]

বলা হয়েছে, "মানুষ যার জন্যে সংগ্রাম করেছে তাছাড়া তার জন্যে আর কিছুই গণ্য করা হবে না।"[১৩৯]

১. ৩. ৫. ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম

ইসলাম খ্রিস্ট ধর্মের মত শুধু জীবনের অন্ধকার দিকটাই মানুষের কাছে তুলে ধরে না, আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মত পার্থিব জীবনের উপর বাহুল্যপূর্ণ গুরুত্বারোপ করতেও শিক্ষা দেয় না। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পার্থিব জীবন অবাঞ্ছিত। এ কারণে আধুনিক পাশ্চাত্য জগত খ্রিস্টীয় এ মতবাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবনকে এমনভাবে পুঁজা করছে, পেটুক যেমন পুঁজা করে তার খাদ্যবস্তুকে – সে গলধঃকরণ করে মাত্র, কিন্তু খাদ্যবস্তুকে কোনো মর্যাদা দেয় না। পক্ষান্তরে ইসলাম পার্থিব জীবনকে দেখে প্রশান্তি ও মর্যাদার দৃষ্টিতে। তবে তাকে মনে করে তার উচ্চতর অস্তিত্বের পথে একটা আংশিক পর্যায় মাত্র এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ও বটে। সুতরাং পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করা অথবা অবমূল্যায়ন করার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহর পরিকল্পনার এক প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে এ দুনিয়ায় মানুষের নির্দিষ্টকালীন সফর। যে কারণে দুনিয়ায় মানব জীবনের এক অপরিসীম মূল্য রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে এটা ভুললে চলবে না যে, এটা নিছক যান্ত্রিক ধরনের মূল্য। আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য যেমন বলে: আমার রাজত্ব কেবল এ দুনিয়াকে নিয়ে, ইসলামে তেমন কোনো আশাবাদের স্থান নেই। তেমনি ইসলাম জীবনবিমুখ খ্রিস্টবাদের মতো বলে না যে, আমার রাজত্ব এ দুনিয়ায় নয়। ইসলাম এখানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআন আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে, "হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের কল্যাণ দান কর দুনিয়ায় এবং কল্যাণ দান কর আখিরাতে।"[১৪০]

ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক মুসলিম তার চারপাশের ঘটনাবলির ব্যাপারে নিজেকে দায়ী মনে করতে হবে এবং সব সময়ে ও সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে উৎখাত করার সংগ্রামে রত থাকতে হবে। কুরআনে এ

---

১৩৮. لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. - Avj-Ki0Avb, সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬

১৩৯. মহান আল্লাহ্ বলেন: وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ - Avj-Ki0Avb, সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৯

১৪০. Avj-Ki0Avb, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১

মনোভাব গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশ লক্ষণীয়: "তোমরাই হচ্ছো মানব জাতির কাছে প্রেরিত শ্রেষ্ঠউম্মত; তোমরা ন্যায় কাজের আদেশ দাও ও অন্যায়কে প্রতিরোধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনো।"[১৪১]

ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা এর আচার-আচরণ, আইন-কানুন ও বিধি-বিধানসহ প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। গবেষকের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থার বিষয়টি উম্মোচন করে তাহলে এ বিষয়টি তার কাছে সূর্যালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা জটিল ও কঠিন কোনো বিষয় নয়। আবার একেবারে সহজ-সাধারণ বিষয়ও নয়। বরং এর গতিপথের আগাগোড়াই মধ্যমপন্থায় পাওয়া যাবে।

১৪১. মহান আল্লাহ্ বলেন: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ. - Avj-Ki0Avb, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিশ্বায়নের ধারণা ও স্বরূপ

বিশ্বায়নের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ইতিবাচক আর কিছু নেতিবাচক। বিশ্বায়নের মধ্যে যেমনিভাবে প্রাচ্য জাতি তথা মুসলমানদের ব্যাপারে কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনিভাবে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। পশ্চিমা চিন্তাবিদ যারা বিশ্বায়নের জোরালো প্রবক্তা এবং কিছু আরব চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করেন, তাদের পূর্ণ চেষ্টা এই যে, কীভাবে এই নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে দুনিয়াবাসীর সামনে সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ও লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে উদাসীন যে, এর নেতিবাচক দিকসমূহ বিশ্ববাসীর ওপর কী প্রতিক্রিয়া ফেলবে সে ব্যাপারে তাদের কোনো গবেষণা বা নির্দেশনা নেই।

অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকসমূহ সামনে রেখে এর সংজ্ঞা দান করেন। তখন আবার তারা এর ইতিবাচক দিকসমূহ উপেক্ষা করেন। অথচ বিশ্বায়নের নিরপেক্ষ, নির্মোহ ও উদার বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়, একই সাথে প্রত্যয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

২. ১. বিশ্বায়নের ইতিবাচক সংজ্ঞা

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা World Trade Organization (WTO) তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে: "বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল দেশের মাঝে সেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার নাম, যা পণ্য ও সেবার বিনিময় বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে সে সকল দেশের পুঁজি ও মূলধনেও প্রবৃদ্ধি হয় সেই সাথে বিশ্বের প্রতিটি কোণে অতি দ্রুত আবশ্যক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। এটি এমনই এক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য সামাজিক ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক সীমারেখা তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক ও অভিন্ন বাজারে পরিণত করা।"[১৪২]

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কাস্টম আইন চালু আছে, যা সাধারণত বাণিজ্যসামগ্রীর ওপর প্রযোজ্য হয়। এই আইনের কারণে এক দেশ হতে অন্য দেশে ব্যবসার পণ্য-সামগ্রী স্থানান্তরিত করতে সেই দেশকে ট্যাক্স দিতে হয়। এই ট্যাক্স পণ্যের আসল দামের সাথে যুক্ত হয় এবং কখনো কখনো তা ২০০%

---

১৪২. হাম্মাদ আল-জুহানী, Avj-Avl jvgvn lqv ZvQxiænv-Avjvj-Avjg-Avj-Bmjvgx, পাক্ষিক আর-রায়েদ, (লক্ষ্ণৌ, সংখ্যা যিলহজ্জ-১৪১৯ হি.) পৃ.৭৭

বা তারও বেশি হয়ে থাকে। অনেক দেশে তো কাস্টমের এই ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে দেশের মেরুদণ্ড সমতুল্য হয়। আজ যখন বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এই যে, এক দেশের পণ্যসামগ্রী সকল দেশে বিক্রয়ের জন্য অবাধে উপস্থাপনের সুযোগ, তখন এ ইচ্ছার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ট্যাক্স সিস্টেম। এই সিস্টেমের কারণে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা–বাণিজ্য করতে অক্ষম। কেননা তাদের স্বীয় পণ্যসামগ্রী অন্য দেশে এক্সপোর্ট বা রপ্তানি করার জন্য বিরাট অংকের ট্যাক্স আদায় করতে হয়। সুতরাং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এ ধরনের দেশের নিকট এই দাবি করে যে, তারা কাস্টম ডিউটির এই সিস্টেমকে খতম করে দেবে (এখন তো অনেক দেশে এই সিস্টেম খতম করে দেয়া হয়েছে অথবা ট্যাক্স কমিয়ে দেয়া হয়েছে) যাতে বিদেশী, বিশেষ করে আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান কোম্পানি স্বাধীনভাবে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে।

যদি বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এই হয়, তাহলে বাহ্যিকভাবে এতে কোনো ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং এ দ্বারা আরো অনুমিত হয়, বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য হলো এক দেশের কোম্পানির পণ্যসামগ্রী দ্বারা অন্য দেশের জনগণকে উপকৃত করা, যাতে যে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধতা না থাকে, বরং প্রত্যেক ভোক্তা যাতে সর্বনিম্ন মূল্যের মাধ্যমে হলেও তা পেতে পারে। কিন্তু যদি চিন্তা করা হয় তাহলে এই বাস্তবতা সামনে আসে যে, যখন ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান কোম্পানির মালামাল এশিয়া ও অনুন্নয়নশীল দেশের বাজারগুলো ছেয়ে ফেলবে তখন স্থানীয় ও আঞ্চলিক কোম্পানি তাদের সামনে টিকতে পারবে না এবং বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় তারা পেছনে পড়ে যাবে। সুতরাং সে সকল দেশ কোনো ধরনের ট্যাক্স না পাওয়ার ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানির দয়ার পাত্রে পরিণত হবে এবং রাষ্ট্রসমূহ স্বীয় দেশ পরিচালনার জন্য হয়তো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হতে ঋণ গ্রহণ করবে কিংবা বিশ্বব্যাংকের সামনে হস্ত প্রসারিত করবে। উভয় অবস্থায় সে দেশ পশ্চিমা তথা ইহুদীদের আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হবে। এভাবেই সে সকল দেশ পশ্চিমা তথা যায়নবাদী শক্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। সাথে সাথে সে সকল দেশের বাজারে যেহেতু বিদেশী কোম্পানির ইজারাদারি হবে সেহেতু জনসাধারণের কষ্টের উপার্জন অন্য দেশে বসে থাকা কোম্পানির মালিকদের পকেটে চলে যাবে। সে দেশের সম্পদ তার উন্নতি-অগ্রগতির কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে তার ধ্বংসের কারণ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকান রাজনীতিবিদ জেমস রাওয়ানো বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেনঃ বিশ্বায়ন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও আইডোলজি তথা মতাদর্শ পরিবর্তনের একটি পন্থা, যে পন্থায় চলার পর শিল্প ও পণ্যদ্রব্য এক দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হতে পারে এবং মানুষের ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে অভিন্নতা আসতে পারে।[১৪৩]

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক উইলিয়াম গ্রেডার ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'একক বিশ্বঃ মানতে প্রস্তুত আছে কি-না' শীর্ষক স্বীয় গ্রন্থে বিশ্বায়ন সম্পর্কে লেখেনঃ এই বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্যে সৃষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাস্তব রূপ লাভ করা একটি কর্মপদ্ধতি। এই কর্মপদ্ধতি উন্নয়ন ও ধ্বংস দু'টির ওপর একই ধরনের শক্তি ও সামর্থ্য রাখে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা উপেক্ষা করে স্বীয় লক্ষ্য ও পথে ধাবমান থাকে। এটি যত বড় উন্নতির কারণ তত বড় ভয়ংকরও।[১৪৪]

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বুনিয়াদ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে হওয়া বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই আন্দোলন বিশ্বের কোনো ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।[১৪৫]

বিশ্বায়ন আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস তথা পণ্য ও সেবার কাজকর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার প্রসারের নাম।[১৪৬]

বিশ্বায়ন দাবি করে, দেশ ও জাতি গোষ্ঠীর সাথে বিদ্যমান অনৈক্য ও বিরোধ বিদূরিত হোক। মানব সমাজ অনৈক্য ও মতানৈক্যের শিকার না হোক, বরং নানা রাস্তায় চলার পরিবর্তে একই রাস্তায় ধাবিত হোক। স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সমঞ্জস বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করুক এবং গোটা বিশ্ব একই মূল্যবোধ গ্রহণ করুক।[১৪৭]

---

১৪৩. ড. সালেহ আর-রাকাব, Avj-Av‡j gvqvn, (দিল্লিঃ দারুল হাদীস, তা.বি.), পৃ. ৫

১৪৪. ড. সালেহ আর-রাকাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৪৫. ড. সালেহ আর-রাকাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৪৬. ড. সালেহ আর-রাকাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৪৭. ড. আহমদ মোস্তফা ওমর, Avj-g¯ÍvKwejj Avivex, (রিয়াদঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ.৭২

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা *The International Encyclopedia of Business and Management* শীর্ষক গ্রন্থে বিশ্বায়নের ব্যাপারে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে এবং বিশ্বসভ্যতার প্রসার এবং ব্যাপকতা দান করার ক্ষেত্রে একে একটি পথ নির্দেশক বা রোড ম্যাপ বলে অভিহিত করেছে।[১৪৮]

আলী হারব বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দেন এভাবে-"বিশ্বায়ন একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের নাম, যার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সংগঠিত হয় এবং খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও ধন-সম্পদ স্থানান্তরিত হয়ে যায়।"[১৪৯]

উল্লেখিত সকল সংজ্ঞার সারকথা এই যে, বিশ্বায়ন এমন একটি ধারণা যা কোনো দেশের অর্থনৈতিক সীমারেখার স্বীকৃতি না দিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বের যে কোনো দেশে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়। রাজনৈতিক ময়দানে বিশ্বায়ন যে কোনো দেশে সেখানের আঞ্চলিক শাসন এবং সে দেশের সীমান্ত স্বীকার করে না, বরং তাকে এক প্রত্যাশিত ও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ও শাসনের অধীন বলে স্বীকার করে। সভ্যতা, সংস্কৃতির ময়দানে বিশ্বায়ন গোটা বিশ্বে একই সভ্যতা সংস্কতি এবং একই তাহযীব-তামাদ্দুন বাস্তবায়ন করতে চায়। বিশ্বায়ন শ্রেণি নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি মিশন হলেও এটি আরো বড় শোষক গোষ্ঠী তৈরির এক অব্যর্থ হাতিয়ার। গোটা মানবতাকে এক ও অভিন্ন সুতায় গ্রথিত করার এক প্রয়াস এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষের মাঝে বিদ্যমান সকল স্বাতন্ত্র ও পার্থক্য নির্মূল করার একটি পদক্ষেপ। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম Information Technology এই ময়দানে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতি এক অনন্য স্মারক। যেমন ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্যপূজারী চিন্তাবিদদের পক্ষ হতে কৃত এ সকল সংজ্ঞায় কেউই স্পষ্ট করে না যে, অর্থনৈতিক ময়দানে যাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার অর্জিত হবে তারা কোথাকার বাসিন্দা হবে? যেই বিশ্বরাষ্ট্রের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তার সুপ্রিম বা প্রধান কে হবেন? গণতন্ত্রকে দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে ধারণাকারীরা এই বিশ্বরাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে? যেই সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা দুনিয়ায় বাস্তাবায়ন করা হবে, তা কোন অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি হবে? কিসের ভিত্তিতে এই তাহযীব-তামাদ্দুনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে? যেই সভ্যতাকে বিশ্বজনীনতা দান করা হবে, কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার এই অধিকার অর্জিত হবে যে, সে আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন সভ্যতার একক ও অবিভাজ্য

---

১৪৮. *The International Encyclopedia of Business and Management*- 1996, P,1649

১৪৯. ড. মাহমুদ তাহমিদ, Avm-mvdxi, (রিয়াদঃ সংখ্যা ৮০, ১৯৯৮,) পৃ. ৫২

ভাষ্যকার হবে? বিশ্বায়নকে কি জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে নাকি এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও সন্তোষের অবস্থান থাকবে? পাশ্চাত্যের ঠিকাদাররা যে বিশ্বায়নকে সাম্য প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম ও উপায় বলে মনে করে তা বাস্তবিকই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে নাকি শ্রেণি বৈষম্যকে আরো বেশি গভীর ও গাঢ় করবে? বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে তারা যে সেতু নির্মাণ করতে চায়, বিশ্বায়ন কি এ সেতু নির্মাণ করবে, নাকি নির্মিত সেতুকে আরো ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে?

এমন অসংখ্য জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস ও আশংকায় বিশ্বায়নের পরিচিতির নতুন নতুন দিক ও বিভাগ প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে।

২. ২. বিশ্বায়নের নেতিবাচক সংজ্ঞা

বিশ্বায়নের নেতিবাচক সংজ্ঞা প্রদানে ড. তুকী উল হামদ বলেন: বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শুধু উন্নতি ও অগ্রগতির কর্মপদ্ধতিই নয়, বরং তা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার একটি সাবর্জনীন দাওয়াতের নাম। এটি গোটা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে পরোক্ষভাবে অস্তিত্ব দানের একটি মাধ্যম বা উপায়। সংক্ষেপে ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং প্রতিটি ভাল ও উপকারী বস্তুকে নির্মূল করার নাম বিশ্বায়ন।[১৫০]

ড. তুকী সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন, “সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন হলো, বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুনকে লুন্ঠন ও নির্মূল করে পশ্চিমা তাহযীব-তামাদ্দুনকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়ার নাম।”[১৫১]

ড. মোস্তফা আন-নাশশার বলেন, বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য কখনই বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে একে অপরের নিকটবর্তী করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য সকল আঞ্চলিক ও জাতীয় তাহযীব-তামাদ্দুনকে বিলুপ্ত করে তাবৎ দুনিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ ও মুল্যবোধে প্রশিক্ষিত করে তোলা।[১৫২]

ড. আব্দুল ওয়াহাব আল–মুসীরী বলেন, বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল চিন্তাধারার দাওয়াত ও আন্দোলনের নাম, যার উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের চিরনির্মূল করা।[১৫৩]

---

১৫০. ড. মাহমুদ তাহমিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৫১. ড. মাহমুদ তাহমিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

১৫২. শিহাব আল-মাশরিক, Av j -gbZv ‘v, (বৈরুতঃ সংখ্যা-১৯৩ আগস্ট ১৯৯৯,) পৃ.৮৯

১৫৩. gwmK Av j -g ¯ ÍvKwe j সংখ্যা-১৩০ মে ২০০২, ৫৪

ড. মোস্তফা মাহমুদ বলেন, বিশ্বায়ন দেশের দেশাত্মবোধ ও জাতির জাতীয়তাবোধ খতম করার জন্য অস্তিত্বশীল হয়েছে। এটি যে কোনো জাতির ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্মূল করার প্রবক্তা, যাতে সে জাতি বড় শক্তির নগণ্য খাদেমে পরিণত হয়।[১৫৪]

বিশ্বায়ন এমন কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং জীবনের চাল–চলন, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের অবকাঠামোর নাম যাকে গোটা দুনিয়ার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হবে এবং লোকদেরকে তার চিত্রিত সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হবে।[১৫৫]

বিশ্বায়ন বস্তুবাদী দর্শন ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতি-মূল্যবোধ, আইন-কানুন, নীতিমালা ও চিন্তা-ভাবনাকে তাবৎ দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার নাম।[১৫৬]

ড. সাদেক জালালুল আযম বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে করেন, বিশ্বায়ন বিশ্বকে একটি কেন্দ্রীয় দেশ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ ও বিশ্বাসে দীক্ষিত করার নাম।[১৫৭]

উল্লিখিত সকল সংজ্ঞায় যদিও শব্দের বৈপরীত্য এবং বাকরীতি গঠনে ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু এই বিভিন্ন শব্দ প্রকৃতপক্ষে একই অর্থ ও একই মর্মকথা বর্ণনা করে। উল্লিখিত চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কৃত এ সকল সংজ্ঞা বিশ্বায়নের স্বরূপ সুস্পষ্ট করে তোলে; মানুষ, জাতি, গোষ্ঠী ও সংস্থাসমূহের প্রকৃত চেহারা হতে পর্দা উন্মোচন করে দেয়। পশ্চিমা জায়নবাদী শক্তিসমূহ গোপন তথ্য, ছবি সংরক্ষণ করে বিশ্বায়নের নামে অহেতুক বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে নাক গলায় এবং নানাবিধ অসুবিধা তৈরি করে। বিশেষ করে মার্কিন ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর পড়ে থাকা পর্দা উন্মোচন করে দেয়া এবং যে সমস্ত লোক স্বীয় হৃদয়ে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশ ও জাতীয়তা এবং ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের দরদ রাখে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যে, তাদের ক্ষুদ্রতম ভুলও সামান্য অসতর্কতা ও ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্রাজেডি বয়ে আনতে পারে। এমন এক ট্রাজেডি ও দুর্ঘটনা, যখন তা প্রকাশিত হবে

---

১৫৪. gwmK Avj-Bmjvg Iqvj IqvZb সংখ্যা-১৩৮, ১৯৯৮, পৃ.১৪২

১৫৫. gwmK Avj-Bmjvg Iqvj IqvZb সংখ্যা-১৩৮, ১৯৯৮, পৃ.১৪৩

১৫৬. মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-মাবরুক, Avj-AvIjvgv Iqvj Bmjvg, (মিশরঃ মাকতাবাতুল ইহসান, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০১

১৫৭. হাসান হানাফী ও সাদেক জালালুল আযম, Avj AvIjvgvn, (করাচীঃ কুতুব খানাহ, তা.বি.), পৃ. ১৩৬

তখন বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর স্বীয় অতীতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মানুষ ভবিষ্যতের ফলাফল হতে বেখবর হয়ে বর্তমানের মায়াবী প্রতারণার মধ্যে হারিয়ে যাবে। সম্ভবত সে ট্রাজেডি হতেই তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার অমানিশার যুগের সূচনা হবে।

২. ৩. ইতিহাসের দর্পণে বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন বা Globalization শব্দটি যেহেতু দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অর্থ প্রকাশ করে, সেহেতু বিশ্বায়ন-এর পরিভাষাটি নতুন হলেও এর অর্থ অনেক প্রাচীন, এমন কি বলা হয়ে থাকে, হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই এই শব্দের সাথে বিশ্ববাসী পরিচিত ছিল। এই অবস্থা শুধু বিশ্বায়ন শব্দের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং এছাড়া আরো অনেক পরিভাষা রয়েছে, সেগুলো যদিও নতুন যুগের সৃষ্টি কিন্তু তার অর্থের সাথে বিশ্ববাসী বহু শতাব্দী পূর্ব হতেই পরিচিত। যেমন মতবাদ বা Ideology পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ফরাসি দার্শনিক দিসটুট দেট্রাসীর গ্রন্থের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ করে, অথচ প্রাচীন যুগ হতেই বিভিন্ন মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বায়ন শব্দটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সৃষ্ট। কিন্তু এর অর্থের সাথে প্রাচীন যুগ হতেই বিশ্ববাসী পরিচিত ছিল। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের গোটা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন এই চিন্তাধারারই ইঙ্গিত বহন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্বায়নের বাহ্যিক অর্থ হলো, প্রতিটি দেশের আয় ও উপার্জন দ্বারা একটি বিশেষ শ্রেণি ও গোষ্ঠীকে লাভবান করা। এই অর্থ হিসেবে বিশ্বায়নের অস্তিত্ব আমরা আব্বাসীয় যুগেও পাই। প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ মেঘের একটি টুকরোকে দেখে বলেছিলেন "তুমি যেখানেই বর্ষিত হও, তোমার ট্যাক্স কিন্তু আমার কাছে আসবেই।"[১৫৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে বিশ্বায়নের অর্থের বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও বিশ্বায়নের অর্থের বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও বিশ্বায়নের পরিভাষা তখনও অস্তিত্বে আসেনি। ১৮৯৭-এর জুনে সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর বাসেল-এ বিশ্বায়নবাদীদের বিশ্ব কনফারেন্স জায়নবাদী নেতা 'তিওয়াদ হরতাযেল'-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ৫০টি আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদী সংগঠনের ৩০০ ইহুদী সদস্য অংশ গ্রহণ করে। উক্ত কনফারেন্সে তারা ৫০ বছরের ভেতরে বিশ্বে জায়নবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা ও গোটা বিশ্বকে গোলাম বানানোর

---

১৫৮. ড. ইযযত সাইয়্যেদ আহমদ, Avj-wnhviæ gvhwqwgj Avl jvgvn, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৭

পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাকে ইহুদীবাদী শাসকদের প্রটোকল বলে।[১৫৯]

এ ক্ষেত্রে যে কাজটি করা আবশ্যক তাহলো: মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো নিজেদের দখলে আনতে হবে যাতে জনমত গঠনে সহজ হয়। বিশ্বায়ন আজ অর্থনৈতিক ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের একশ' বছর পর আজ ইহুদী প্রজন্ম স্বীয় পিতৃপুরুষদের উপদেশ বাস্তবায়ন করছে।

১৮৯৭-এ বিশ্ব জায়নবাদী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই অনুষ্ঠানে পাশকৃত সিদ্ধান্তবলির ক্রমশ ধীরগতিতে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক ইহুদী ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বসে বিশাল ইসরাইলের স্বপ্ন দেখে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।[১৬০]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান অব্যাহত অসহিষ্ণুতা ও ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক কিছু ব্যর্থতার পর 'লিগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা সামনে অগ্রসর হয়ে এ সংস্থাটিকে প্রশ্নাতীত করার একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও লিগ অব নেশনস ইহুদীদের হীন স্বার্থ পুরণে ব্যর্থ হয়। তাদের হীন সংকল্প পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা এটাকে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে যায়। এর পরিবর্তে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। যা আজ ইহুদী স্বার্থ রক্ষার জন্য তার সকল শক্তি-সামর্থ ব্যয় করছে।

২. ৪. বিশ্বায়নের পথ যেভাবে সুগম ও উন্মুক্ত হয়

বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারণী সংস্থাগুলো নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য যে সমস্ত উপায়-উপকরণের মাধ্যমে বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করেছে, তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মুক্ত ও স্বাধীন বিশ্ববাণিজ্য: এ বাণিজ্য পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে উন্নত, সমৃদ্ধিশালী ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বাণিজ্য ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই বাজারের দরজা সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি ও শক্তিসমূহের জন্য খোলা থাকবে, তারা স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক মূলনীতির অধীন হবে।[১৬১]

---

১৫৯. হাম্মাদ আল-জুহানী, Avj-Avlj vgvn lqv ZvQxiænv-Avjvj-Avjg-Avj-Bmjvgx, পাক্ষিক আর-রায়েদ, (লক্ষ্ণৌ), সংখ্যা যিলহজ্জ-১৪১৯ হি. বুরোতূকোলাতু হুকামা-ই সাহয়ূন সফর, ১৪২৪ হি. আত তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা সংখ্যা-১০-এর সৌজন্যে, পৃ.২৩১

১৬০. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, (New York: Harper Leans Publishers, 2002), p.27

১৬১. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.28

২. সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ: কোনো দেশে বিদেশী কোম্পানির বাণিজ্য করা, নিজেদের কোম্পানি খুলে দেয়া এবং সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করাকে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বলে। অর্থনৈতিক পরিভাষায় একে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১৬২]

উপরন্তু এ সমস্ত কোম্পানির উন্নয়নশীল দেশে আসার উদ্দেশ্য এত বহুমুখী যে, সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ দ্বারা যেমনিভাবে তারা নিজেরা স্বয়ং ফায়দা লোটে, তেমনিভাবে কিছু ইহুদী প্রভাবাধীন বিশ্বব্যাংকেরও প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। কারণ আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো যা কিছুই বিনিয়োগ করে তা সেই বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমেই বিনিয়োগ করে। এ জন্য এসব বিশ্বব্যাংক এই বিনিয়োগ দ্বারা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে বাণিজ্য লেনদেনের ওপরও খবরদারি করে এবং নিজ দেশের অর্থনীতিকেও মজবুত এবং সুসংহত করে।

৩. প্রযুক্তির ময়দানে বিপ্লব: প্রযুক্তির ময়দানে উন্নতি, অগ্রগতি ও বিপুল চলমানতা এ যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে দেশই এই ময়দানে অগ্রগামী সে দেশই অর্থনীতির সকল বিভাগে পরিব্যাপ্ত। এই উন্নতি, অগ্রগতি ও বিপ্লবের ফলে গোটা দুনিয়া একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং দূরত্ব শব্দের আর কোনো বাস্তবতা ও আবেদন বাকী নেই। এই উন্নতির ফলে মাল, সম্পদ ও সেবাসমূহ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা কোনোই কঠিন থাকেনি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি বোতাম টিপে প্রত্যাশিত বস্তুকে অর্জন করা একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতিটাও আবার শিল্পোন্নত দেশের ভাগ্যে এসেছে। যারা এই প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের শিল্পকে মজবুত ও সুসংহত করছে এবং নিজেদের পণ্য ও শিল্প বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে দিচ্ছে। প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বায়নের পথের সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে দিয়েছে।[১৬৩]

৪. বহুজাতিক কোম্পানির সম্প্রসারণ: যেমনিভাবে চলমান যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয় তেমনিভাবে মালটিন্যাশনাল তথা বহুজাতিক কোম্পানির যুগ নামেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ এ সমস্ত কোম্পানি বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে এগুলোর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ভৌগোলিক সীমারেখায় বাধ্য না হওয়ার ভিত্তিতে এ সমস্ত কোম্পানি কয়েকটি দেশে বিনিয়োগ করে

---

১৬২. ড. সালেহ আর-রাকাব, A\j-A\l j\gn, পূর্বোক্ত, পৃ.৮

১৬৩. আবদে সাঈদ ও আবদে ইসমাঈল, আল-আওলামাহ ওয়াল আলম আল-ইসলামী : আরকাম ওয়া হাকায়েক, (মিশর: মাকতাবাতুল ইহসান, ১৯৮৯,) পৃ. ৫১২

এবং তাদের অর্থনীতিতে কালসাপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে সব দেশের অর্থনীতিতে কোম্পানি যা বলে তাই হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সামনে অসহায় হয়ে যায়। কমপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মর্জি অনুযায়ী আইন-কানুন তৈরি ও বাতিল হয়। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের সামনে আর কোনো উপায় থাকে না।

২. ৫. বিশ্বায়নের চাহিদা

বিশ্বায়নের পশ্চিমা প্রবক্তা ও তাদের প্রাচ্য অনুসারীরা এই ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বিশাল কৃতিত্ব, সফলতা ও সামষ্টিক কল্যাণ দাবি করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের গ্যারান্টি প্রদান করে। প্রতিটি জাতি তার ছায়ায় নিজের ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে পারে। প্রত্যেক মানুষ তার মাধ্যমে উজ্জ্বল জীবন কাটাতে পারে। এটা আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যম সম্ভব হয়, যার ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, সেলফোন এমনকি সাধারণ ডাটাবেজের মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। বিশ্বায়ন বিদেশী বাজারে ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ সরবরাহ করে। এ দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি উন্নতি ও অগ্রগতির সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।[১৬৪]

ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ফ্রান্সের জাতীয় দিবস (১৪ জুলাই ২০০০) উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলেন, "বিশ্বায়নের ওপর অবরোধ আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এটা সামাজিক অনৈক্যের কারণ। তন্মধ্যে প্রথম ভয়াবহতা হলো, এই ব্যবস্থা সমাজের ওপর সরাসরি আগ্রাসন চালায়। দ্বিতীয় ভয়াবহতা হলো, এর কারণে বিশ্বে অন্যায়-অপরাধ বৃদ্ধি পায়। আর তৃতীয় ভয়াবহতা হলো, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী।[১৬৫]

প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক উইলিয়াম গ্রেডার ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *One world ready or no* শীর্ষক গ্রন্থে বিশ্বায়ন সম্পর্কে লেখেন, "বিশ্বায়ন একটি আশ্চর্য ও অদ্ভুত পদ্ধতি, যা বিশ্বশিল্প ও বাণিজ্য বিপ্লবের ফলে অস্তিত্ব লাভ করে। এই ব্যবস্থা যেমনিভাবে উন্নতির মাধ্যম তেমনিভাবে ধ্বংসেরও কারণ।"[১৬৬]

২. ৬. বিশ্বায়নের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র

১৬৪. gwmK Av¨j-Avnivg, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১; ড. সালেহ অর-রাকাব, Av¨j-Av¨l jvgvn, পৃ. ১৪

১৬৫. gwmK Av¨j nvlqv‡'m (ceÜ) g¯Íwejm mvnvdwZj Aviweqv dx wh jwjj Av¨l jvgvn, সংখ্যা স্মারক ২০১০ খ্রি. পৃ. ৫৪

১৬৬. ড. সালাহ আর-রাকাব, Av¨j-Av¨l jvgvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা এই আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে, যাতে মানব জীবনের কোনো দিকই এমন না থাকে, যা জায়নবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এজন্য বিশ্বব্যবস্থার অন্তরালে ক্রিয়াশীল এই নৈরাজ্যবাদী ও স্বার্থান্ধ মস্তিষ্কগুলো এই ব্যবস্থাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে এবং প্রতিটি ময়দানের খেলোয়াড়দের মাধ্যমে আলাদা আলাদা টিমও তৈরি করে দিয়েছে, যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। মৌলিকভাবে বিশ্বায়নের আবেগ ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা ও সাহিত্য।

এ সকল ময়দানের প্রতিটি বিষয়ের সাথে অপর বিষয়ের সম্পর্ক খুব গভীর এবং নিবিড়। কারণ বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোটা দুনিয়াকে মার্কিন তথা জায়নবাদী আদর্শে উজ্জীবিত করে একে তাদের স্বার্থ উদ্ধার ও ক্ষমতা রক্ষার পক্ষে ব্যবহার করা এবং সমগ্র বিশ্বে আমেরিকার মাধ্যমে ইহুদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং যেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার মানচিত্র পাল্টানো প্রয়োজন এবং রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অসহায় ও নিঃস্ব বানানো আবশ্যকীয়, তদ্রুপ তা অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরাজিত করা এবং এই রাস্তা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করাও জরুরী। এমনিভাবে এই ইজারাদারিকে স্থায়ীত্বকরণের জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়াও অত্যাবশ্যকীয় যাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয় তখন পশ্চিম থেকে আসা যে কোনো বাতাসে তারা আত্মা প্রশান্তি অনুভব করবে। সেখানের জীবন ব্যবস্থাকেই উন্নত ও মাপকাঠি মনে করবে এবং সেখানে অবস্থান ও বসবাসকেই স্বীয় আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করবে। পশ্চিম হতে আসা প্রতিটি বস্তুকে বুকে লাগাবে এবং তার ব্যবহারকেই ফ্যাশন ও উন্নত জীবন পদ্ধতির আলামত মনে করবে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রাস্তা ধরেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকার আধিপত্য অত্যন্ত সহজ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

৩. ১. রাজনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

জায়নবাদী লবি গোটা বিশ্বকে স্বীয় হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা এবং তার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব চালানোর স্বপ্ন বহু বছর পূর্বেই দেখেছিল। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর ব্রাসেলস-এ তাদের নীতি নির্ধারকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তারা ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ তাদের অতীত ইতিহাস থেকে সাহায্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে তারা তাদের পরিকল্পিত বিশাল ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গোটা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারে, ভূগর্ভে লুক্কায়িত সম্পদ আহরণ করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা বহু শতাব্দী পূর্বে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার যে চাদর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা যেন দূর করতে পারে। বিশ্বায়ন মূলত জায়নবাদী শয়তানী মস্তিষ্কের উৎপাদন। বিশ্বায়ন আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ধাবমান। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো এমন একটি বিশ্বের প্রতিষ্ঠা করা, যার নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও অভ্যন্তরীণভাবে ইহুদীদের হাতে থাকবে। দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করে দেয়া হবে। তাদের শুধু 'ল এন্ড অর্ডার' আয়ত্বে রাখার অধিকার থাকবে। তাদের ক্ষমতা কোনো কমিটি বা সংগঠন থেকে বেশি হবে না। আর প্রতিরক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্বের এই ঠিকাদাররা।

৩. ২. আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রসরমান পদক্ষেপ

বিশ্বায়নের মাধ্যমে ইহুদী লবি যেই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে, তা শুধু একটি মতবাদ কিংবা কোনো চিন্তাধারা হিসেবেই রয়ে যায়নি, বরং তার প্রতিষ্ঠার রাস্তায় অগ্রসরমান পদক্ষেপ খুব দ্রুত হয়ে উঠছে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবতার লেবাস পরানো হচ্ছে। পশ্চিমা নেতৃবর্গ ও ইহুদী এজেন্টদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রকে জনগণ ও সর্বসাধারণের পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য জনমত গঠনের নিরলস প্রয়াস চালানো হচ্ছে, যাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানা যায় এবং সে প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপও নেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যের জন্য বিশ্বায়ন-এর ধারক-বাহকরা তাদের বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রকে একটি বাস্তবতা ও

অবশ্য গ্রহণীয় বস্তু বানিয়ে উপস্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। যেমন,

(১) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালী ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁর AvšÍRwZK ivó শীর্ষক গ্রন্থে লেখেন, "জাতিসংঘ এক হিসেবে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম ইট।"[১৬৭]

(২) আমাদের সামনে বর্তমানে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমাদের জন্যেও এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও। বাস্তবিকই আমাদের সামনে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এটা এমন ব্যবস্থা হবে যার মধ্যে জাতিসংঘ সবচেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী হবে। (জর্জ বুশের বক্তৃতা হতে সংগৃহীত) [১৬৮]

(৩) বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা কি হবে? আমরা এমন একটি স্পর্শকাতর পরিস্থিতি অতিক্রম করছি যার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের স্তর হতে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের ক্ষমতায় রূপান্তরিত হচ্ছে।[১৬৯]

(৪) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা অর্জিত আছে তা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের কাছে রূপান্তরিত করে দেয়া উচিত।[১৭০]

(৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের দায়িত্বহীন ব্যয়ের ওপর অবরোধ আরোপ করা জরুরী আর এই কাজ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমনিভাবে আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন রাষ্ট্রের হিসাব-নিকাশ নেয়, তেমনিভাবে আমরা সকল দেশকে একটি গণ্ডির মধ্যে আনতে চাই।[১৭১]

(৬) ২য় পর্যায়ে ধীরে ধীরে জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খুব দ্রুত গতিতে সকল দেশকে রাসায়নিক ও আণবিক অস্ত্র হতে বঞ্চিত

---

167. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.85

168. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.89

169. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.80

170. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.81

171. Philip Trueman, N*ew York Times*, 4 August 1999, p.20

করে দেয়া হবে। এভাবে জাতিসংঘের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা কোনো দেশের জন্য সম্ভব হবে না।[১৭২]

৩. ৩. রাজনৈতিক বিশ্বায়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের আসল উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বের ওপর মার্কিন ও ইহুদী ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এছাড়াও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে তাদের আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন সেটাকে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া নাম দেয়াও যেতে পারে, আবার তার উদ্দেশ্যও আখ্যা দেয়া যেতে পারে। নিম্নে রাজনৈতিক বিশ্বায়নের কিছু প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলোঃ

(১) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় এটা নিশ্চিত যে, দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর জোরপূর্বক পশ্চিমা পলিসি চাপিয়ে দেয়া হবে। আমেরিকা ও তার রাজনীতিতে "কুন ফায়াকুন" (হও, সুতরাং হয়ে যাবে)-এর মত শক্তির অধিকারী ইহুদী শক্তির স্বার্থের খাতিরে সকল দেশের রাজনৈতিক পলিসি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ অধিকার এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। চাই তা সে সমস্ত দেশের জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ধর্ম বিশ্বাস আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পলিসির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক অথবা সংঘর্ষপূর্ণ! ইহুদী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার প্রভাবেই পেনসিলভানিয়া ব্যাংকের চেয়ারমান জোনবুটিং-এর একথা বলার দুঃসাহস হয়ে ছিল যে, বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব, কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে আর কার মরে যাওয়া উচিত![১৭৩]

(২) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টি ও দলের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হবে এবং তাদেরকে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ও শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সংগঠন বিশ্বায়নের নেতৃত্বের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নেবে। এগুলো জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্য থেকেই হবে।[১৭৪]

৩) ইসলামী বিশ্বের শক্তিশালী নেতৃত্বকে হটিয়ে দুর্বল ও অযোগ্য নেতৃত্বকে ক্ষমতার মসনদে বসানো এবং মার্কিন স্বার্থের পক্ষে কর্মরত সকল নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা এবং রক্ষা করাও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের

---

১৭২. gwKb ciivó wel‡q cKwkZ e‡jwUb ৭২৭৭ সেপ্টেম্বর- ১৯৬১

১৭৩. w'ivmvZ nvlivj eÕw'ËvixLxj gAwmi wjgvdûwgj Avljvgvn, (পাকিস্তানঃ দারুল হাদীস, তা.বি.), পৃ. ৮০

১৭৪. ড. জামাল ক্বান্নান, মাসিক-আল মুস্তাকবিলুল আরাবী, wbhvgb Avjwgqb Avg mvqZvivZb G‡¯Ígwiqvb RvZx'vZb, সংখ্যা-১৮০ ফেব্রো-১৯৯৪, পৃ.৬০

কর্মকৌশলের অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব যদি পাশ্চাত্যের গোলামী করে তাহলে সেখানের জনগণ ও তাদের সকল সম্পদের ওপর আমেরিকারই অধিকার বহাল থাকবে এবং ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যা ইহুদী জাতির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, খুব সহজেই মার্কিন পলিসি ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে ইহুদীদের হাতে চলে আসবে।[১৭৫]

৪) আঞ্চলিক ক্ষমতাকে দুর্বল করা, তার প্রভাব খর্ব করা কিংবা শিকড় থেকেই তাকে নির্মূল করে দেয়া এবং জনগণের হৃদয় হতে জাতীয়তার চেতনা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়াও বিশ্বায়নের এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. ৪. ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদী-খ্রিস্ট ঐক্য

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম ও তার সত্যিকার অনুসারীরা। যারা এখনো ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্মতৎপরতা মুসলমানদের স্বার্থে পরিচালনা করছেন এবং এ কারণে তাদেরকে সন্ত্রাসীর মত উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হচ্ছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বুলন্দ হিম্মত ও উন্নত শির নিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছেন এবং জায়নিস্টদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর ইসলামপন্থীদের এই সংগ্রাম যেহেতু জায়নবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বরদাস্ত করতে পারছে না, এজন্য ১১ সেপ্টেম্বরের মত বহু উদ্দেশ্যসম্বলিত নাটক মঞ্চস্থের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ভাবমূর্তি, ঐক্য, শক্তি ও আদর্শকে পরাজিত করার কাপুরুষোচিত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে সে সকল দেশের ওপরও আগ্রাসন চালানো হচ্ছে যেসব দেশ ইসলামী জাগরণ ও দ্বীনী চেতনাবোধের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এ সব দেশের সাধারণ জনগণকে অন্ধকারে রেখে তাদের উপর নির্মম গণহত্যা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অঞ্চলের পর অঞ্চল ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অগণিত নিষ্পাপ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ধ্বংসের তো হিসাবই সম্ভব নয়। জায়নিস্টরা তাদের সংকল্প বাস্তব রূপ দানের জন্য খ্রিস্টানদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর সওয়ার হয়ে আছে। আজ বিশ্বের যে প্রান্তেই মুসলিম উম্মাহ ধ্বংস ও নির্যাতনের শিকার সেখানে বাহ্যত অন্য কোনো জাতি এই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হলেও কিন্তু এর পশ্চাতে ইহুদী মস্তিষ্কই কাজ করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, খ্রিস্টানরা ইহুদীদের গোলামী ও তাঁবেদারী করাকে গর্ব মনে করছে এবং তাদের ইশারায়ই নাচছে।[১৭৬]

১৭৫. ড. জামাল ক্বান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

[১৭৬] সরদার সৈয়দ আহমদ, 'বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি' evsjv‡'‡ki A_bxwZ mwgwZ mvgwqKx, ২০০৭, খণ্ড-২ (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি-ঢাকা, ডিসেম্বর,২০০৭) পৃ. ৭৫৫

নিম্নে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাষণের অনুবাদ পেশ করছি, যে ভাষণ তিনি ইহুদী–খ্রিস্ট ঐক্য পরিষদের মার্কিন শহর নিউ মেক্সিকোর এলবোক ইয়ার্ক-এ অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে দিয়েছিলেন। এই ভাষণ ওয়াশিংটন পোস্ট ম্যাগাজিন ১৩ মে ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। আর এর আরবি অনুবাদ আহমদ বশীর বাকের w.w.w islamway.com নামক ওয়েব সাইটে উপস্থাপন করেছেন। এ ভাষণ দ্বারা একথা সহজেই অনুমান করা যায়, আজ আমেরিকা ও জায়নবাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও পথ এক এবং অভিন্ন হয়ে গেছে। স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ ও হীন সংকল্পকে বাস্তব রূপ দানের জন্য তথাকথিত সভ্য দুনিয়া যে কোনো কিছু করতে পারে, এমন কি সে সমস্ত জাতিকে নির্মূল ও গণহত্যাও করতে পারে যারা জায়নবাদী বিশ্বায়নের বিরোধী এবং জালেম ও অত্যাচারী জাতির আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ভাষণের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ:

অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি, কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ও মার্কিন জনগণ!

আজকের রাতে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আপনাদেরকে বলছি, শ্বেতাঙ্গ ইহুদী-খ্রিস্ট ঐক্য বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাসে এ রকম আর কখনো হয়নি যে, মার্কিন মূল্যবোধ এমন মর্যাদা, বড়ত্ব ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যেমন আজ এই ইহুদী-খ্রিস্ট ঐক্যের ফলে অর্জিত হয়েছে। মার্কিন ঝান্ডা, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ, সি.আই.এ. এবং এফ.বি.আই সন্ত্রাসবাদের ভয় হতে বিশ্বকে মুক্তি দান এবং শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার খাতিরে এক শতকেরও উর্ধ্ব দেশে বিদ্যমান রয়েছে। মার্কিন নাগরিকদের তাদের সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানদের নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত, যারা বিশ্বব্যাপী মার্কিন ব্যবস্থা বিস্তারের খাতিরে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ কুরবান করছে।

প্রিয় দেশ ও জাতি,

আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতে গর্ববোধ করছি, তালেবান নির্মূল হয়ে গেছে। কাবুল স্বাধীন হয়েছে। মোল্লা ওমর ও উসামা বিন লাদেন হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিংবা গ্রেফতারের পথে। এদিক ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু বেশি দিন নয়, কারণ আমি তাঁকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ইস্পাত-কঠিন সংকল্প করে রেখেছি।

আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতেও গর্ব অনুভব করছি, আফগান নারীরা চিরদিনের জন্য বোরকা হতে মুক্ত হয়ে গেছে! আফগানিস্তানের মেয়েরা স্কুলে ফিরে এসেছে। তারা এই সবক পড়ছে যে, কিভাবে

আমাদেরকে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগত কামিয়াবী ও সফলতা দান করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন টেলিভিশন আফগান নাগরিকদের জীবনে আবার স্থান করে নিয়েছে। আফগানিস্তানের লোকেরা আজ বড্ড খুশি ও পুলকিত যে, তারা আজ নিজ দেশে স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করছে। আমেরিকা, বিশেষ করে মার্কিন শিশুরা আফগানিস্তানের জনগণকে পানাহার সামগ্রী ও সম্পদ উপকরণ প্রেরণ করে যোগ্য মহান কর্ম সম্পাদন করেছে তার ওপর যতই গর্ব করা হোক, কম হয়ে যাবে। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি আফগান শিশুদেরকে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্বারা স্বাদ অনুভব করতে প্রত্যক্ষ করছি। তারা আজ চিপ্‌স ও বিস্কুট খাচ্ছে। আফগানিস্তানে যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সামনে এখনো দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ রয়েছে। আমাদেরকে অনেক ইসলামী ও আরব রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তেজ হব না যতক্ষণ প্রত্যেক মুসলমান নিরস্ত্র, দাড়িবিহীন, ধর্মহীন, শান্তিপ্রিয় ও মার্কিন প্রেমিক না হবে এবং মুসলিম নারীরা তাদের শরীর কিংবা হিজাববৃত্তি করা ছেড়ে না দেবে। আমার দৃঢ় সংকল্প যে, আমরা দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই এ সংকল্প পূরণ করার জন্য সকল প্রকার উপায় উপকরণ ও মাধ্যম প্রয়োগ করব।

শাসন করার আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একথা বলে যে, সরকারকে সক্রিয় ও কর্মতৎপর হতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে সীমিতও হবে এবং সকল যিম্মাদারী ও দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আজ আমরা শক্তির ক্ষেত্রে বিরাট পেরেশানী ও অস্থিরতার শিকার, যার কারণে আমাদেরকে একটি জাতীয় মূলনীতি বানাতে হবে। আমাদের নিকট শান্তিকে ব্যাপক ও বিস্তার করার করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা শান্তির মার্কিন সীমাকে বিস্তার করে তা সংরক্ষণ করতে পারি। আমরা আমাদের মিত্র ও বন্ধুদের সাথে মিলে মিশে কাজ করব যাতে আমরা মুক্ত বাজার, মুক্ত বাণিজ্য এবং সে সকল জাতির জন্য মিলেমিশে কাজ করব, যারা আযাদীর পথে ধাবমান, তারা তাদের কাজে আমেরিকাকে স্বীয় বন্ধু হিসেবে পাশে পাবে।

আমরা আমাদের মূল্যবোধ ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমাদের শান্তি নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজন। কারণ বিন লাদেনের আগমন সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের কারোর শক্তির মধ্যে ছিল না। কেউ জানে না, সে আমাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কখন কি ধরনের ধ্বংস সাধন করবে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পলিসিকে কীভাবে টার্গেট বানাবে। অমানবিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আঞ্জামদাতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমি মার্কিন জনগণের সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। শুধু একটি ছাড়া। কারণ আমাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ

আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অনেকটা বাধা হয়েছে এবং এই যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগণের ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আমাদের এ সকল কর্মকাণ্ড ও নীতি আমাদের শান্তি ও গোপন তথ্যের ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আমাদের উচিত আমরা শান্তি ও গোপন তথ্যের ক্ষেত্রে স্বীয় কর্মতৎপরতা আরো বিস্তৃত করব। ফেডারেল ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন (এফ.বি.আই.) এবং সি.আই.এ আমেরিকান মুসলমানদের উপর কড়া নযর রাখছে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার গ্রেফতারও করা হয়েছে। আমরা নাগরিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাকে অনেক শর্তযুক্ত করে দিয়েছি। আমরা প্রচার মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরও কিছু কিছু অবরোধ আরোপ করেছি এবং বিমান বন্দরে যাত্রীদের আসবাবপত্র ইত্যাদি তল্লাশীর ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেছি। আমি খুশি যে, মার্কিন জনগণ সিকিউরিটির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সহায়তা করছে। সাদা চামড়ার ইহুদী-খ্রিস্টানরা ছাড়া অন্যান্য জাতির আমাদের দেশে অবস্থান (চাই. আইনীভাবে হোক বা বেআইনী হোক) আমাদের জাতির জন্য বিপদস্বরূপ। আপনাদের সকলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে আমাদের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী হলো আপনাদের শান্তি, নিরাপত্তা প্রদান করা। 'ইমিগ্রেশন' (দেশত্যাগ) সম্পর্কেও আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আসবে যাতে আমরা আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু এর জন্য যখন উপযোগী সময় আসবে তখনই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তখন ভবিষ্যতের নিউ ইয়র্ক শহর যার ওপর অনেক বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছে তা আবার সাদা চামড়ার লোকদের শহর হবে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ড. রাইস, পাল ভোলফিটাজ, রিচার্ড ব্যারেল, কংগ্রেসের ইহুদী প্রতিনিধি ও মার্কিন-ইসরাইল যোগাযোগ কমিটির সহায়তায় আমরা আমেরিকার আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির বিরাট উন্নতি সাধন করেছি। সুতরাং আজকের পর আগামীতে আমেরিকা আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে এমন কোনো পক্ষের ভূমিকা পালন করবে না যাতে মার্কিন অর্থনীতি ও সামরিক উদ্দেশ্য বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি এখানে বন্ধুবর এ্যারিয়েল শ্যারন (ইসরাইল প্রধানমন্ত্রী)-এর কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা সে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন, যারা মার্কিন ও ইসরাইলের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হবে তাদেরকে সম্পর্কহীন মনে করি। হোক তা জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব লীগ (যার সম্পর্কে আমার মতামত হলো তাকে এখনই ভেঙ্গে ফেলা হোক), রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি, ভেটিকেন কিংবা অন্যান্য সকল ইসলামী সংগঠন। এতদসত্ত্বেও অমানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিপুল বাজেটের প্রয়োজন। কিন্তু তবু আমি ১৫ কোটি ডলার যে পরিমাণ আমরা প্রতি বছর ইসরাইলকে সাহায্য ও অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকি) সিনিয়র সিটিজেনস (বয়স্ক লোকদের) ভাতা প্রদানের জন্য পাস করেছি যাতে তারা নিজেদের রোগ-শোকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। আমরা খুব শ্রীঘ্রই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খোদাইয়ের কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি যাতে সেখানে পেট্রোল অনুসন্ধান করা যায়। উপরন্তু ইরান, ইরাক, উপসাগর ও সৌদি আরব হয়ে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত সামুদ্রিক পথে পানির নিচ দিয়ে পাইপ লাইন বিছানো হবে যার খরচ তারাই বহন করবে। এর পরিবর্তে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সাহায্যের প্যাকেজ প্রদান করা হবে। আমি এর পূর্বে ২ সেপ্টেম্বর ২০০১–এ এ কথাই বলেছিলাম। আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করাব কিংবা তাদের ওপর ইনসাফ বাস্তবায়ন করব। মোটকথা তাদের বিচারের সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভাষায়, এখন সময় এসেছে এ কথা ঘোষণা করার যে, আমাদেরকে নতুনভাবে দুনিয়া পুনর্গঠন করতে দাও, যাতে গোটা বিশ্ব আমাদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যায়।

বিশ্ববিধাতার অনুগ্রহে আমরা সাদা চামড়ার সভ্য লোক এই বিশ্বের ওপর আমাদের স্বাধীন, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর আকীদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব। কারণ বিশ্ব আজ আমাদের ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিশ্বজনীন পয়গামের বুভুক্ষু। আজকের পর কারো দাড়ি রাখার ওপর আর কোনো ধরনের কড়াকড়ি থাকবে না। নারীদের আর বোরকায় আবৃত থাকতে হবে না। আজ থেকে সব সময়ের জন্য সকল স্থানের লোক মদ ও নেশা পান করতে পারবে। সমকামিতা করতে পারবে। হোটেলে হোক কিংবা নিজ বেডরুমে হোক যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবি দেখতে পারবে এবং তাতে অংশ পর্যন্ত নিতে পারবে। আমাদের যে সকল কোম্পানি এ ধরনের নগ্ন ও যৌন ছবি তৈরি করে, নিকট ভবিষ্যতে তা কোনো ধরনের অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যাবে। সন্ত্রাসী মুসলমানরা তাদেরই ধর্ম ও আকিদা বিশ্বাসের সাথে গাদ্দারী করছে। তারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামকেই অপহরণ করতে চায়। এজন্য আমরা ইহুদী-খ্রিস্ট ঐক্য পরিষদ রাজনীতিকে স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস হতে আলাদা ও স্বতন্ত্র রাখি। আমরা যুদ্ধ ও লড়াইকে ধর্ম হতে দূরে রাখি। এজন্য আপনারা কখনো মিডিয়ায় দেখবেন না, ইহুদী কিংবা ক্যাথলিকদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়া হচ্ছে। আমরা কাউকে হত্যা করলে ঈমানের নামে নয় বরং স্বীয় স্বাধীনতা ও তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষা করে হত্যা করি। তারা কেন আমাদেরকে অপছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা সেই জিনিসকে অপছন্দ করে যা আমি এই অধিবেশনে দেখছি। আর তা হলো পেট্রোল, মোবাইল

ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আর্থিক সহযোগিতায় নারী-পুরুষের নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে, এর চেয়েও বেশি যে জিনিসটি তাদের নিকট অপছন্দনীয় তা হলো আমাদের মার্কিন ইহুদী নাগরিকরা ইংল্যান্ড ছাড়া বিশ্বে আমাদের একক মিত্র ও বন্ধু ইসরাইলের স্থায়ী সমর্থন লাভ করার জন্য কোটি কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা দেয়। তারা চায়, কিছু কিছু মুসলিম দেশের সরকারকে খতম করে দেয়া হোক! কিন্তু আমরা এ রকম হতে দেব না। আমাদের শত্রুরা মধ্যপ্রাচ্য হতে ইসরাইলকে নির্মূল করে দিতে চায়। তারা চায়, ইহুদী জাতিকে আমাদের ইহুদী প্রদেশ নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিতে। উপরন্তু তারা চায়, এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বসতি স্থাপনে বাধ্য করা উচিত। কিন্তু এটা আমার লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেই সম্ভব। সন্ত্রাসবিরোধী এই অভিযানে শুধু আফগান নাগরিকরাই নিহত হয়নি, বরং গোটা বিশ্বে ইহুদীও অখ্রিস্ট ব্যাংক ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে আমরা সন্ত্রাসীদেরকে সম্পদ হতে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এখন ক্ষুধার্ত শিশুদের আহার দানের বাহানা গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে না।

পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তের অর্ধ অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে আমরা এ কথা ঘোষণা করে দিয়েছি, তারা ইহুদী-খ্রিস্ট বিরোধী কণ্ঠকে কঠোরভাবে নিস্তব্ধ করে দেবে। সকল দেশকে এখন এ রাস্তাই গ্রহণ করতে হবে, তারা হয়ত আমাদের সহায়তা ও সমর্থন করবে কিংবা সন্ত্রাসীদের পক্ষাবলম্বন করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি, সকল দেশ আমাদের এ কথা মেনে নিয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার সে সব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে যারা আমেরিকার জন্য হুমকি হতে পারে। আমার পিতা (সিনিয়র জর্জ বুশ)-এর নেতৃত্বে যদিও আমেরিকা স্নায়ু যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আজ আমাদের নিকট সুযোগ এসেছে আমরা আমাদের পুরাতন শত্রু রুশ, চীন ও ভারতের সাথে মিলে মজবুত ও শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলি। আমেরিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মৌলবাদীদের উৎখাত করতে এবং তাদের দেশে স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করতে অংশীদারিত্বের সাথেও মিলেমিশে কাজ করছে এবং করতে থাকবে। সে সকল দেশের (যার মধ্যে প্রায় দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ রয়েছে) ইসলামী মৌলবাদীদের উৎখাত করতে এবং তাদের চিরতরে নির্মূল করতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে।

কিন্তু আমি সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর সামনে এই ঘোষণা করছি, ইসরাইলের সাথে আমাদের ঐক্য লৌহ প্রাচীরের মতই অটুট। আমি পূর্ণাঙ্গভাবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের সমর্থন করছি যার

নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইসরাইলী প্রধান মন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন। আজ আমি ঘোষণা দিচ্ছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াসির আরাফাত ও তার অধীনে অন্যায় ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করবে যারা আমাদের ইহুদী ভাইবোনদের হত্যা করছে এবং বোমা বিস্ফোরণে তাদেরকে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা আজকের পর নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং প্রস্তাবের সমর্থন করব না, যার সমর্থনে আমেরিকা ১৯৬৭ সালে শান্তি-নিরাপত্তার খাতিরে ভোট দিয়েছিল। মি. শ্যারন একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা দুই নৌকায় এক সাথে সওয়ার হতে পারি না-একদিকে আমরা বিন লাদেনের নেতৃত্বে চলমান ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করব। ইসরাইল ৫৩ বছর ধরে আরব সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনী দখলদারিত্বের সম্মুখীন। আমি জানি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ইসরাইলের এফ-১৬ বিমানের মাধ্যমে বাইতুল লাহম-এর ওপর বোমাবর্ষণ করার নিন্দা করেছেন। কিন্তু আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে একথা বলতে পারি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও আমি একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এজন্য আমার বিশ্বাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে তার অবশিষ্ট সময়গুলো ইসরাইলের শান্তি-নিরাপত্তার খাতিরেই অতিবাহিত হবে। ১১ সেপ্টেম্বর হামলার কারণে ইসরাইলের সংঘটিত অর্থনৈতিক ক্ষতির বদলায় আমরা ইসরাইলকে দুই কোটি ডলারের সাহায্য প্রদান করেছি। আমরা ঐ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ছাড়ব না যারা ইসরাইল ও আমাদের অন্যান্য মিত্র দেশগুলোর বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে স্পষ্ট।

আমরা আজকের পর কোনো ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার পরওয়া করব না। আমেরিকা আর এমন দেশ নেই যার নিকট দুনিয়া শান্তি-নিরাপত্তার জন্য আসবে বরং আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি এখন বিশ্বাবাসীর সামনে সুস্পষ্ট। আমরাই সে সকল দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছুঁড়ে দেব, যাদেরকে আমরা টার্গেট বানাবো এবং আমরাই সে সকল দেশকে পুনঃনির্মাণ ও পুনর্গঠনের পূর্বে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেব। আজকের পর আমরা হাত গুটিয়ে রেখে বিশ্বকে রক্তে ডুবন্ত দেখব না। আমেরিকা বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করবে। কিন্তু যদি আমাদের রক্ত প্রবাহিত করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা রক্ত অবশ্যই দেব। আজ থেকে সব সময়ের জন্য আমেরিকাই এ ফয়সালা করবে কবে, কোথায়, কিভাবে ও কেন যুদ্ধ করা হবে এবং কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমার পিতা এই ইউনিয়নের অধিবেশনে যা ২৯ জানুয়ারি ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বলেছিলেন, আমি এই উচ্চ কক্ষে আপনাদেরকে ও সমগ্র আমেরিকানদের একথা বলতে এসেছি, আজ আমরা একটি সিদ্ধান্তকারী মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশ তথা মহাশূন্য, সমুদ্র ও মরুভূমি অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমরা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা জানি, আমরা সেখানে কেন আছি? কারণ আমরা আমেরিকান জাতি এবং আমাদের চেয়ে একটি বড় জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম ও অবিরাম সংগ্রাম করে আসছি। আমরা মূলনীতি ও মানবতার আসন্ন বিপদ-আপদ ও হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছি।

উপস্থিত সুধি!

আমরা আশা করছি, আমি বিগত ১০ বছরে আরব ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই করে এবং সে সকল দেশের মধ্যে অস্থিরতা-অনৈক্য বিস্তার করে বুশ বংশের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করেছি। এখন আমাদেরকে কোনো শাসক কিংবা কোনো আরব বাদশাহ স্বীয় গাড়িতে জ্বালানি ভরতে বাধা প্রদান করতে পারবে না। কমপক্ষে সে সময় পর্যন্ত তো হতে পারবে না যতক্ষণ আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকব। তারা পেট্রোলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার মুল্য হ্রাস করতে বাধ্য হবে। এমনিভাবে আমি মনে করি, বিন লাদেন ও অমানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে আমরা আমেরিকানরা সবাই সম্পদ অর্জনের সুযোগ পাক। ১১ সেপ্টেম্বর শহীদ হওয়া আমাদের হিরোদের সম্ভবত আমরা এভাবেই সম্মান করতে পারি। ধন্যবাদ। সৃষ্টিকর্তা আমেরিকাকে রক্ষা করুন!।[১৭৭]

৩. ৫. বুশের ভাষণের আলোকে বিশ্বায়ন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়রের উল্লিখিত ভাষণ দ্বারা মার্কিন সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলি বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে কোনো নতুন কথা বলেননি, বরং সে সমস্ত কথাই উল্লেখ করেছেন যা বিগত কয়েক বছর ধরে তারা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু এ সব সংকল্প এত স্পষ্ট ও আগ্রাসী ভাষায় প্রকাশ সম্ভবত এটাই প্রথম। এই ভাষণে যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বায়ন শব্দের নাম নেননি কিন্তু বাস্তবতা এই যে, গোটা ভাষণই বিশ্বায়নে আসল উদ্দেশ্যকেই

[১৭৭] ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৩ মে ২০০৩, পৃ.১০

পূরণ করার সংকল্প ও ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমেরিকাইজেশন ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্জ বুশ মার্কিন মূল্যবোধ, মার্কিন আধিপত্য ও মার্কিন মোড়লীপনাকে গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইস্পাত কঠিন শপথ ও সংকল্প করেছেন এবং অতীতে তার ইসলামবিদ্বেষী কৃতকর্মের ওপর গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করেছেন।[১৭৮]

৩. ৬. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

৩.৬.১. বস্তুবাদ ও বিশ্বায়ন

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, যে জাতি এমন কোনো নেতিবাচক আন্দোলন শুরু করছে যার প্রভাব–প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর পড়ে। তার মূল কারণ বস্তুপূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের প্রতিটি আন্দোলনের পেছেনে এক জাতি অন্য জাতির ওপর বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অর্জনের অনুপ্রেরণা কাজ করে যাতে সে জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও শান্তির ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধক না হয়। প্রাচীনকাল হতেই মানবেতিহাস এমন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত যে, প্রাচুর্যের মোহ, অতিশয় ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভিলাষের ফলশ্রুতিতে শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতির ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। বস্তুগতভাবে নিজেদেরকে মজবুত ও সুসংহত করার জন্য বিরোধী জাতির ওপর বিভিন্ন অস্ত্র ও হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে। তাদের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে। লোকদেরকে গোলাম ও দাস বানিয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়েছে। এই নগ্ন পাশবিকতা কেবল ধন-সম্পদ অর্জনের জন্যই করা হয়।

প্রকাশ থাকে, ব্যক্তিগত ও একক উদ্যোগে বিশ্ব বাণিজ্যে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানির অস্তিত্ব লাভ হলো, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সেক্টরে বিনিয়োগ করল এবং স্বীয় মালিকদের পকেট ও পেট ভরল। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বাহ্যিক স্লোগান ও দাবি এই যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। দরিদ্রতা নির্মূল হবে। প্রতিটি পণ্য উপযুক্ত মূল্যে ও বিপুল পরিমাণে হস্তগত হবে। প্রতিটি দেশের পণ্য সকল বাজারে বিক্রি হবে। ফলে সে যুগের অবসান হবে যে যুগে বিভিন্ন বস্তু, এমন কি পানাহারের বস্তু পর্যন্ত কেবল সে সব লোকের হস্তগত হতো, যাদের ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ।

৩.৬.২. অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কর্ম পদ্ধতি

---

১৭৮. ^'wbK ivóxq mvnviv (D'), নয়া দিল্লী, ৩ জুলাই, ২০০৩, পৃ. ১

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন মূলত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে ভিত্তি বানিয়ে তার নির্ধারিত মুলনীতির আলোকে স্বীয় বস্তুগত সফরের সুচনা করেছে। বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকদের সম্মুখে যে বিষয়টি ছিল তা হলো, যদি এ ব্যবস্থায় কোম্পানি ও তার মালিকদের সীমা ও হিসেব ছাড়া উপকার হয় তাহলে সে সকল দেশেরও ফায়দা অর্জন হবে যে সকল দেশের সাথে এই কোম্পানিগুলো সম্বন্ধযুক্ত। তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল বিশ্ব অর্থনীতি মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কিছু কোম্পানির কব্জায় থাকবে। আমদানি-রপ্তানি তাদের নিয়ন্ত্রণে হবে এবং জনগণের উপার্জনের বিরাট একটি অংশ কোম্পানির মালিকদের ব্যাংক একাউন্টে জমা হতে থাকবে। আর অপর দিকে এ সকল কোম্পানি যেসব দেশে বাণিজ্য করছে তাদেরকে সামান্য কিছু ট্যাক্স দিয়ে আঁচল ঝেড়ে নেবে এবং স্বীয় দেশকে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত ও সুসংহত করবে।

৩.৬.৩. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা, যা পশ্চিমা জগতের উদ্ভাবন। দুনিয়ার অন্যান্য অর্থব্যবস্থা যেমনভাবে মানুষের প্রয়োজন পূরণে অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও মানুষের প্রয়োজন পুরণ করার জন্য অস্তিত্বশীল হয়েছে। তবে পার্থক্য হলো, এ প্রয়োজন খুব অল্প মানুষেরই পূরণ হচ্ছে। কিন্তু মতবাদের প্রবক্তাদের এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজন পুরণ না করে বরং তাদের মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির মুখে তুলে দিচ্ছে।[১৭৯]

৩.৬.৪. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সমস্যা সমাধানের উপায়

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দাবি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার মানুষের সবচেয়ে মৌলিক অধিকার। এগুলোর অভাবই মৌলিক অভাব আর এই চারটি মৌলিক সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পথ, আর তা হলো প্রত্যেক মানুষকে বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একেবারে মুক্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। যথাসম্ভব বেশি লাভবান হওয়ার জন্য যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে। এর মাধ্যমে অর্থনেতিক চারটি সমস্যার সমাধান এমনি এমনিই হয়ে যাবে। কারণ যখন বেশি মুনাফা অর্জনই প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থনীতির ময়দানে এমন কাজ করবে সমাজে যার প্রয়োজন। ফলে প্রতিটি সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান হয়ে যাবে।

---

১৭৯. মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avi l-Rv'x'-gvqxkvZ lqv wZRviZ, (লাহোরঃ ২০০১,) পৃ. ২০-২১

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দর্শন বলে, যোগান চাহিদার প্রাকৃতিক নীতিই বাস্তবে কৃষকদের নির্ধারণ করে দেয় যে, সে কোন জিনিস কী পরিমাণে উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণে বাজারজাত করবে। এমনিভাবে অর্থনীতির উল্লিখিত চারটি সমস্যা অবলীলায় সমাধান হয়ে যাবে। কারণ যোগান ও চাহিদার নীতি হলো, বাজারে যে বস্তুর যোগান ও সরবরাহ চাহিদার তুলনায় বেশি হবে তার মূল্য হ্রাস পেয়ে যাবে। চাহিদা ও যোগান নীতি দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ এভাবে হবে যে, যখন আমরা প্রত্যেককে যথাসম্ভব বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য মুক্ত করে দেব তখন প্রত্যেকে প্রতিটি মুনাফার জন্য এমন পণ্যই বাজারজাত করার প্রচেষ্টা করবে, যার প্রয়োজন ও চাহিদা বেশি, যাতে সে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে। এমনিভাবে যোগান ও চাহিদার নীতি তাকে বাধ্য করবে যে, সে কোন জিনিসের উৎপাদন করবে আর কোন জিনিসের উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকবে। এই নীতিই দ্বিতীয় সমস্যা অর্থ্যাৎ উপকরণের বিভাজন সমস্যার সমাধান করবে। এ অবস্থায় উৎপাদনকারী চাহিদা ও প্রয়োজন পরিমাণ উপকরণ সরবরাহ করবে। চাহিদা ও প্রয়োজন পরিমাণ থেকে বেশি কিংবা কম উপকরণ সে সরবরাহ করবে না। কারণ এর ফলে তার লোকসান হতে পারে। তাই যোগান ও চাহিদার নীতি দ্বারা উপকরণের বিভাজন সমস্যা অবলীলায় সমাধান হয়ে যায়। তৃতীয় সমস্যা হলো আয়ের বণ্টন। কিছু উপকরণ কাজে লাগানোর মাধ্যমে যা উৎপাদন বা আয় হয়, সমাজে তা কিসের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে? পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কথা হলো, যা কিছু আয় হবে তা উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যেই বণ্টন করতে হবে। এর ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও যোগান যুগপৎভাবে বৃদ্ধি পাবে।[১৮০]

৩.৬.৫. পূঁজিবাদী দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদান

পূজিবাদী দর্শন অনুসারে উৎপাদনের উপাদান হলো ৪টি। যেমন, ১. ভূমি ২. শ্রম ৩. মূলধন বা পুঁজি ৪. সংগঠন।

সংগঠন দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যিনি কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্র করেন। তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ সত্যিকারভাবে উৎপাদন কার্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কথা হলো, উৎপাদনের ফলে যে আয় হবে তা এমনভাবে বণ্টন বা বিভাজন হতে হবে যাতে ভূমি সরবরাহকারীকে ভাড়া দেয়া যায়, শ্রম ব্যয়কারীকে পারিশ্রমিক দেয়া যায়, পুঁজি

---

[180] মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avli-Rv'x'-gvqxkvZ Iqv wZRviZ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

সরবরাহকারীকে সুদ দেয়া যায় এবং যে উদ্যোক্তা এই উৎপাদনের মূল অনুপ্রেরক ছিল তাকেও মুনাফা দেয়া যায়। অতঃপর কোন উদ্যোক্তা কতটুকু পাবে তা যোগান ও চাহিদানুসারে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। সুতরাং যে উদ্যোক্তার চাহিদা বেশি হবে, তার মজুরিও বেশি হবে। মনে করি, যায়েদ একটি কাপড়ের কারখানা স্থাপন করতে চাচ্ছে। তাই লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপাদানগুলো একত্র করার দায়িত্ব তারই। এজন্য অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়। কারখানার জন্য প্রথমে জমি দরকার। যদি তার জমি না থাকে তাহলে অন্যের কাছ থেকে ভাড়া নিতে হবে। এখন জমির ভাড়া যোগান ও চাহিদা অনুসারে হবে অর্থাৎ যদি জমি ভাড়া প্রদানকারীর সংখ্যা বেশি হয় এবং সে তুলনায় গ্রহীতা কম হয় তাহলে জমি ভাড়া অবশ্যই কম হবে। এর উল্টো হলে ভাড়া বেশি হবে। তাই যোগান ও চাহিদাই জমির ভাড়া নির্ধারণ করবে। এরপর তার কারখানা, মেশিনারিজ ও কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য পুঁজিরও প্রয়োজন। এই অর্থব্যবস্থায় পুঁজি সরবরাহকারীকে সুদ দিতে হবে। সুতরাং পুঁজি যোগানদাতাদের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সুদের হার কম হবে। আর যদি পুঁজি যোগানদাতাদের সংখ্যা কম হয় তাহলে সুদের হার বেশি হবে। এমনিভাবে কারখানায় কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন, যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলে। তাদের মজুরি দিতে হবে। এ মজুরি নির্ধারণ যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলে শ্রমের যোগন বেশি হবে। তাদের মজুরি কম হবে। কিন্তু যদি কারখানায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক পাওয়া না যায় তাহলে শ্রমের যোগান কম, তখন তাদের মজুরি বেশি হবে। তাই যোগান ও চাহিদানুসারে উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে মজুরি নির্ধারিত হবে। এভাবে যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই ভাড়া, মজুরি ও সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং কারখানায় উৎপাদনের ভিত্তিতে আয়ের অবশিষ্ট অংশ মুনাফা হিসেবে উদ্যোক্তা পায়। তাই আয় বণ্টনের সমস্যার সমাধানও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

চতুর্থ সমস্যা উন্নয়ন। প্রতিটি অর্থব্যবস্থাই নিজের উৎপাদনের উন্নয়ন, গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির প্রতি জোর দিয়ে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দর্শনেও সমস্যা, চাহিদা ও যোগানের প্রাকৃতিক নীতি এমনিতেই তাকে নতুন নতুন ও উন্নততর মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাত করতে বাধ্য করবে, যেন তার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বেশি হয় এবং মুনাফা বেশি অর্জন করা যায়।[১৮১]

৩.৬.৬.পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নীতিসমূহ

১৮১. মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avli-Rv'x'-gvqxkvZ lqv wZRviZ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতি ৩টি। যথা:

১. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা: এই অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মালিকানায় সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ নিজের অধিকারে রাখতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজস্ব ব্যবহারিক দ্রব্য ব্যক্তিমালিকানায় স্বীকৃত হলেও উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ ভূমি অথবা কারখানা স্বীকৃত নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সর্বপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্য ও উৎপাদনের উপকরণ সব কিছু ব্যক্তি মালিকানায় স্বীকৃত।

২. মুনাফা অর্জন: পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় মুলনীতি হলো, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে কাজ পরিচালিত হয় তা হলো প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন সম্পাদন অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।[১৮২] মুনাফা অর্জন ব্যতীত কোনো ধরনের ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাদের নিকট মুনাফাই মুখ্য।

৩. রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হলো রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। তারা যেভাবে কাজ চালিয়ে যায় তাতে বাধা দেয় না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হয় না। এ ভিত্তিতেই বলা হয় যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে উত্তম সরকার বা রাষ্ট্র হলো যে সরকার কম হস্তক্ষেপ করে অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না।[১৮৩]

৩.৬.৭. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যা

সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমা দেশসমূহে পুঁজিবাদ মহাধুমধামের সাথে উল্লাস ধ্বনি করতে লাগল এবং দাবি করে বসল যে, যখন সমাজতন্ত্র বাস্তব জীবনে বিফল হয়ে গিয়েছে তখন পুঁজিবাদের সভ্যতার আবশ্যকতা, অনিবার্যতা ও সত্যতা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মূলত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শনে এতটুকু কথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এবং বাজারী শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে কাজ সমাধা করা জরুরী। কারণ তা মানবিক স্বভাবের চাহিদা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভুল হয়েছে প্রত্যেককে লাগামহীনভাবে বেশির চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা দিয়ে। এতে হালাল–হারামের কোনো পার্থক্য নেই এবং জনকল্যাণের দিকেও মনোযোগ নেই।

---

১৮২. মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avli-Rv'x'-gvqxkvZ Iqv wZRviZ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬

১৮৩. মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avli-Rv'x'-gvqxkvZ Iqv wZRviZ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬

সুতরাং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাও বৈধ হয়ে গিয়েছে যার ফলে একজন ব্যক্তি বেশির চেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে বাজারে ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।[১৮৪]

দুঃখজনক ব্যাপার হরো, এর ওপর যে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, শেষে তা উৎপাদন মূল্যে সংযোজন হয়ে সাধারণ ক্রেতাদের পকেট থেকে যাচ্ছে। এভাবে সকল জাতিও দুশ্চরিত্রদের খরচ বহন করছে, বলা ভালো, বহন করতে বাধ্য হচ্ছে।[১৮৫]

উল্লিখিত মূল্যায়ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। অর্থনীতি-যা এই ব্যবস্থার মুখ্য আলোচ্য বিষয়-তাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শনের কারণে পতনের ও অবক্ষয়ের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি। সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মুষ্টিতে এসে গেছে। আর প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যও এই যে, গোটা দুনিয়ার পুঁজির ওপর হাতে গোণা কিছু লোকের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা হবে। খুব নগণ্য সংখ্যক লোক এমন আছে যাদের কোনো না কোনোভাবে রুজি-রুটি যোগাড় হয়ে যায়। আর বাকী সংখ্যক লোকদের এক বেলা খাবারের জন্যও চিন্তা-ফিকির করতে হয়।[১৮৬]

৩.৬.৮. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রাচীন পশ্চিমা দর্শন

পশ্চিমা জগত তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুসংহত করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন পেশ করেছে তা কোনো নতুন দর্শন নয়, বরং তার সম্পর্ক প্রাচীন গ্রিক দর্শনের সাথে, এমন কি এই ব্যবস্থায় গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও সফিসটিক গোত্রের মাঝে মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্বও প্রত্যক্ষ করা যায়। পশ্চিমা লেখক জন বোকার ও হিনারী ট্রোমেন লেখেন যে, সফিসটিক সম্প্রদায় গ্রিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পতাকাবাহক ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ বাণিজ্য স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্র কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বক্তব্য ছিল, অর্থনৈতিক ময়দানে এতটুকু ঢিল দেয়া উচিত নয় যে, সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। আর বাকি লোক তা হতে বঞ্চিত হবে। তাদের বক্তব্য ছিল, ভূ-পৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য বেশির থেকে বেশি ন্যায়-

---

১৮৪. সৈয়দ আহসান আলী, m', cীRev' I cীðgv ীek, (ঢাকা: টাউন লাইব্রেরি, জুন ১৯৯৬), পৃ.২৩

১৮৫. সৈয়দ আহসান আলী, m', cীRev' I cীðgv ীek, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

186. M. Walckot, *Globalization and Third World*, Oxford Press, May 2002, p.22

ইনসাফ ও সাম্য-মৈত্রী জরুরী, যাতে লোকদের মধ্যে শান্তি-নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এজন্য এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যা দেশে ইনসাফের আধিপত্য নিশ্চিত করবে।[১৮৭]

সামনে অগ্রসর হয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার এই দর্শন বিশ্বায়নের বুনিয়াদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কারণ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা যেমনিভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তবাদিতার প্রবক্তা তেমনিভাবে বিশ্বায়নও বাণিজ্য স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ময়দানকে প্রতিটি প্রকারের বিধি–নিষেধ থেকে মুক্ত রাখার পতাকাবাহক। এজন্য এই ফলাফলে উপনীত হওয়া কোনো কঠিন বিষয় নয় যে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে গোটা দুনিয়ার ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পকেটে গুটিয়ে আসে এবং তারাই প্রত্যেকে ব্যক্তির উপার্জনের প্রকৃত মালিক ও হকদার হয়ে বসে, অথচ গোটা বিশ্ব আজ বঞ্চিতের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যে সকল দেশে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে সেখানে সম্পদশালী লোক তারাই যাদের রয়েছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজ ও কল-কারখানা।[১৮৮]

৩.৬.৯. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিকাশের পদ্ধতি ও ক্রমবিকাশ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভেতর ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিকাশ দানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাই করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্নতি–অগ্রগতি দানের জন্য নিজ দেশের পণ্য ও শিল্পের চেয়ে বিদেশী পণ্য ও শিল্পকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে জনগণকে অভ্যস্ত করে তোলা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক শিল্প ও পণ্য নির্মূল হয়ে যায় কিংবা তাদের ক্রেতা অন্যান্য দেশে বিদ্যমান থাকলেও যাতে দেশীয় খরিদ্দারদের ব্যাপারে তারা ভয় ও শংকা বোধ করতে থাকে এমনকি এক দেশের পণ্য তার সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেন গোটা বিশ্বে তা ছড়িয়ে যায়![১৮৯]

প্রতিটি দেশের বাজারে কোম্পানিগুলোর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বিশ্বায়নবাদীরা দেখেছিল তা বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য তারা এ বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছে যে, ছোট ছোট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মূল করে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি তাদের শাখা-প্রশাখা ও ব্রাঞ্চ গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ছড়িয়ে

১৮৭. আমরিকা আল-মুস্তাবাদ্দাহ, Avjv weivqvZj gËwn‘vn Iqv wmqvmvZm-mvqZvivn Avjøn Avjg, (করাচীঃ দারুল কিতাব, তা.বি.), পৃ. ২০

১৮৮. আমরিকা আল-মুস্তাবাদ্দাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৮৯. আমরিকা আল-মুস্তাবাদ্দাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

দেবে, যাতে জনসাধারণের আবশ্যিক প্রয়োজন পুরণের সুলভ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কোম্পানির মালিকদের পেটও ভরে। কিন্তু তা তখনই সম্ভবপর ছিল যখন জনসাধারণের মগজ ধোলাই করা হবে এবং মস্তিষ্ক তৈরি করা হবে। এজন্য খুব জোরেশোরে একথা প্রচার করা হলো, ব্যক্তিগত দোকান বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কোম্পানির ব্রাঞ্চ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা উন্নত ও মানসম্মত জীবন যাপনের গ্যারান্টি। জনগণের মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দেয়া হলো যে, ছোট দোকান থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার পরিবর্তে কোম্পানির ব্রাঞ্চ থেকে পণ্য ক্রয়ের মধ্যেই বেশি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন জনগণ সর্বপ্রথম এই সুবিধা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। এর ফলে তারা সাধারণ ক্ষুদ্র দোকানের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্রাঞ্চ কিংবা সে সকল বাণিজ্য কেন্দ্র থেকেই পণ্য খরিদ করাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া শুরু করে যার ব্রাঞ্চ প্রায় প্রতিটি শহরেই পাওয়া যায়। ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় ও সাধারণ ব্যবহৃত আসবাবপত্র পর্যন্ত সে সকল কেন্দ্র হতেই ক্রয় করা হয়। এ ধরনের কেন্দ্রের মধ্যে ওয়াল মার্ট-এর নামও উল্লেখযোগ্য আমেরিকায় যার প্রায় এক হাজার ব্রাঞ্চ রয়েছে। ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের নিকট প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের ব্যাংক ব্যালেন্স সব সময় বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞাপন এখন অনুন্নত দেশগুলোতে হওয়া শুরু হয়েছে, এমন কি পশ্চিমা প্রভাবিত আরব দেশগুলোতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণার ব্যাপক রেওয়াজ শুরু হয়ে গেছে।[১৯০]

বিশ্বায়নের পতাকাবাহকরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাহ্যত এমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি, যার আলোকে প্রাচ্য ও এশিয়ান কোম্পানির পশ্চিমা ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এতটুকু তো তাদেরও জানা ছিল, চীন–জাপানকে বাদ দিয়ে কোনো প্রাচ্য কিংবা এশিয়ান কোম্পানি কখনো এই পজিশনে আসতে পারবে না যে, সে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কারবার করবে এবং পশ্চিমা কোম্পানির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আর বর্তমান পরিস্থিতিও ঠিক এমন যে, ময়দানে কেবল পশ্চিমা ও বেশির পক্ষে চীনা–জাপানি কোম্পানিই রয়েছে যারা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে মূল্য হ্রাস করে দেশীয়দের উপার্জন গ্রাস করে চলেছে। তারা প্রতিটি দেশের প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে টিভিতে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যাকডোনাল্ড খাওয়া, কোক, পেপসি, জুস ইত্যাদি পান করা এবং টি শার্ট পরিধান করাকেই উন্নত ও মানসম্পন্ন জীবন বানিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, মার্কিন ফাস্ট ফুড রেস্তোরা ম্যাকডোনাল্ড যখন প্রথমবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে

---

190. M. Walckot, *Globalization and Third World*, ibid, p.26

খোলা হলো তখন পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে উজ্জীবিত বিপুল সংখ্যক আরব নেতৃবর্গ গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছে গেলো। তাদের ভিড়ে আশপাশের সকল রাজপথ ট্রাফিক জানজটের সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট-এর গবেষণার দ্বারা জানা যায়, এ সকল লোক ম্যাকডোনাল্ড ফাস্ট ফুড খেতে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন বড় বড় কোম্পানির নতুন নতুন শাখা খোলার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য ছাড় দিয়ে দিয়েছে, যাতে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য বাজার দখল করে নেয় এবং তাদের আকর্ষণীয় শিল্পের মাধ্যমে সে সকল বাজারের ওপর নিজেদের ইজারাদারি ও ঠিকাদারির প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[১৯১]

এক রিপোর্ট দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার ৭৫% অর্থনীতির ওপর ৫০০ শত বড় বড় কোম্পানির কব্জা রয়েছে যার মধ্যে আমেরিকাতেই ১৫৩টি, ইউরোপের ১৫৫টি ও জাপানের ১৪১টি।[১৯২]

মোটকথা, জনমত গঠন ও জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারণে কোম্পানি কালচার বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে যার ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আজকে এই পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু শুধু কিছু নোট কামানোই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। কারণ কুটিল ও ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্ক যখন কোনো কাজ করে তখন তার বহুমুখী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এজন্য অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের পশ্চাতেও বহুমুখী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। নিম্নে আমরা সামান্য কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করছি:

৩.৬.১০. অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিস্তার ঘটিয়েই পূরণ করতে পারে। এজন্য এই ব্যবস্থার প্রচারণা ও বিস্তার ঘটানোর জন্য International Monitory Fund (IMF) বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং World Bank বা বিশ্ব ব্যাংক-এর মত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; যে প্রতিষ্ঠানগুলো গণবিরোধী অর্থনৈতিক পলিসির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অনেক উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) বিশ্বায়ন আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো আরবদের সম্পদগুলো হাতিয়ে নিয়ে স্বয়ং নিজেরা তার বিনিয়োগ করছে। আজ দিন দিন আরব বিশ্ব ঋণের অন্তহীন বোঝায় ডুবে যাচ্ছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী আরব বিশ্ব প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০ হাজার ডলার ঋণ নিচ্ছে আর এতটুকু পরিমাণই ইউরোপ প্রতি মিনিটে বিনিয়োগ করছে। সে মতে ১৯৯৫ সালে ইউরোপ ৪৬৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। আর

191. M. Walckot, *Globalization and Third World*, ibid, p.30

১৯২. মুহাম্মদ আহমদ আলী, gwmK A\j-A\jg, আল–ইসলামী সংখ্যা-৭৪১, সফর, ১৪২৩ হি. পৃ.৭৬

১৯৮৬ সালে ইউরোপীয়ান কান্ট্রি ৬৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল। ইউরোপ যত সম্পদ বিনিয়োগ করছে ঠিক এ পরিমাণই সম্পদ আরব বিশ্ব প্রতি বছর ঋণী হচ্ছে। আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবকাঠামো ও পশ্চিমাদের মানসিক গোলামীর ফলাফল এই যে, যখন এই সম্পদ ও অর্থ সুদসহ পশ্চিমা দেশে ফিরে যায় তখন এই মোটা অংকের মুনাফাকে তারা বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে।[১৯৩]

২) বিশ্বায়নের একটি উদ্দেশ্য হলো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের শক্তি ও কর্তৃত্ব খতম করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। তা এভাবে যে, অর্থনীতি চাই তা যে দেশেরই হোক, কিন্তু সে দেশের সরকারের স্বীয় অর্থনীতিকে বিকাশ ও অগ্রগতি দানের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা থাকবে না, বরং গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আমেরিকার রহম-করমের ওপর চলবে। স্থানীয় সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের অধীন হবে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল স্থানীয় সরকারকে যেদিকে চাইবে সেদিকেই ফেরাতে পারবে। এ প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ সরবরাহ করে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে আবার এমন শর্তাদিও আরোপ করে যা দ্বারা জনসাধারণের অধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং দেশ ও রাষ্ট্র সে সকল মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির দয়ার পাত্রে পরিণত হয়ে যায়।[১৯৪]

যেসব প্রতিষ্ঠান ঋণী দেশগুলোতে স্বাধীন বাণিজ্য করে জনসাধারণের অর্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা নিজেদের পকেট ভরে তুরস্ক, মেক্সিকো, মালেয়েশিয়া ইত্যাদি যেসব দেশের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে যাদেরকে বিশ্বায়ন মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থের খাতিরে বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।[১৯৫]

এ সকল দেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে বিশ্বায়নের পলিসি ও নীতি মানতে বাধ্য ছিল। এজন্যই মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বায়নের কট্টর বিরোধী ও ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক একতার প্রধান প্রবক্তা ড. মাহাথির মোহাম্মদের বক্তব্য হলো, “বিশ্বায়ন প্রভাবিত বিশ্বে কখনোই অর্থনৈতিক ন্যায়-ইনসাফ ও সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এতে বরং গোটা বিশ্ব কর্তৃত্ব ও

---

১৯৩. ড. খালেদ আবুল ফাতূহ, Avj-Avljvgvn nvjvKZb dx ZvZllqwi Av-wjqwZm mvqZvivn, gwmK Avj-evqvb, সংখ্যা ১৩৬, পৃ.১৫৪

১৯৪. মুহাম্মদ সাইদ -আবূ যারুর, Avj Avljvgvn্, Avj-Avljvgvn nvjvKZb dx ZvZllqwi Av-wjqwZm mvqZvivn, gwmK Avj-evqvb, সংখ্যা ১৩৬, পৃ. ৬২

১৯৫. মুহাম্মদ সাইদ -আবূ যারুর, Avj Avljvgvn্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্ধ নেশায় মত্ত দেশগুলোর গোলাম ও অধীন হয়ে যাবে। যেমনিভাবে স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর অনেক লোক ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। এমনিভাবে বিশ্বায়ন দ্বারাও বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যুর গ্রাসের শিকার হবে। বিশ্বায়ন প্রভাবিত এই যুগে সম্পদশালী দেশগুলোর জন্য অবশিষ্ট দেশগুলোর ওপর তার পলিসি চাপিয়ে দেয়া খুবই সহজ হবে। এজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর এ কথা ভাল করে জেনে রাখা উচিত, তাদের অবস্থা সে যুগ থেকে কখনই উন্নত হবে না যখন তারা উন্নত বিশ্বের কলোনি ছিল।[১৯৬]

১৯৯৫ সালে বিশ্বায়নের প্রধান টার্গেট আরব বিশ্বের বিদেশী ঋণ ২৫০ কোটি ডলারে এসে পৌঁছেছিল। বর্তমানে প্রতি মিনিটে আরব বিশ্ব ৫০ হাজার ডলার ঋণ করে চলেছে। আজ পর্যন্ত এ গতি সামান্যতমও হ্রাস পায়নি বরং প্রতিনিয়ত এ গতি বেড়েই চলেছে। এজন্য কোনো সন্দেহ-সংশয় ছাড়া নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, যত দ্রুত ঋণ বৃদ্ধি হবে তত দ্রুতই আরব বিশ্ব গোলামীর চোরাবালিতে ফেঁসে যাবে এবং পাশ্চাত্য, বিশেষ করে আমেরিকার বেশি বেশি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সমস্ত ঋণের কারণে ঋণী দেশগুলোকে ধ্বংস ও বরবাদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ক্রমাগত অন্যায় পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। এ ঋণের কারণে আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশ অর্থনৈতিক দুর্বলতার শিকার। এই দেশগুলো পর্যায়ক্রমে ঋণ ও সুদের বোঝার নিচে নিষ্পেষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অতীতের সেই অবস্থা আবার সামনে আসছে যখন পশ্চিমা বিশ্ব আরব দেশগুলোর ওপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্তৃত্ব চালাত।[১৯৭] এখন তারা নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করবে অর্থনৈতিকভাবে।

প্রমাণ হিসেবে আল–জাযায়েরকে পেশ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী আল–জাযায়ের স্বীয় ঋণের কারণে গ্যাট চুক্তি মানতে বাধ্য হয় যার ফলে বিদেশী কোম্পানি প্রকাশ্যে সেখানে বাণিজ্য করছে। সুতরাং "আল–জাযায়ের"কে তাঁর স্থানীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫ থেকে ১২ কোটি ডলার পর্যন্ত লোকসান দিতে হচ্ছে। কিন্তু ঋণে জর্জরিত হওয়ার কারণে সে বিদেশী কোম্পানিগুলোর জন্য নিজেদের দরোজা উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে।"[১৯৮]

---

১৯৬. gwmK Avj Bmjvg Avj-Bqvlg, সংখ্যা ১৬ বর্ষ, ১৭, ১৪২১ হি., পৃ. ৬৭

১৯৭. খালেদ আবুল ফাতুহ, আল-আওলামাহ হালকাতুন ফীতাত্বওয়ারি আ-লিয়াতিস রসায়তারাহ, gwmK Avj-eqvb, সংখ্যা -১৩৬, পৃ.৯৮

১৯৮. আল-আওলামাহ ওয়া রুমীযূস-সিয়াদাহ আল-ওয়াতানিয়াহ, gwmK Avj-gRZvgvn, ১৪১২ হি., পৃ.১২৩

(৩) বিশ্বায়ন এটাও চায়, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর গলায় ছুরি রেখে পশ্চিমাদের সম্পদশালী ও তাদের মিত্র দেশগুলোর স্বার্থ পূরণ করা হবে। চাই তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যতই নিচে যেতে হোক না কেন এবং যতই ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন হোক না কেন।[১৯৯]

পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পৃথিবীর ভূ-খণ্ডকে এমন এক বাজারে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে যেখানে পারস্পরিক রশি টানাটানি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যাবোধের পরোয়া ও ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। বরং সেই বাজারের গ্রাহকদেরকে বেশি বেশি ঋণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।[২০০]

ড. মাজদী খাদ্দুরী বলেন, "বহুজাতিক কোম্পানির সম্প্রসারণ ও উন্নতির কারণে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ভিত মজবুত করার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে। পুঁজি বিনিয়োগ, প্রোডাকশন, আমদানি-রপ্তানি, বণ্টন শেয়ার ইত্যাদির মত সকল ক্ষেত্রে এই কোম্পানিগুলো স্বীয় কর্মতৎপরতার কারণে দেশের রাজনীতি সংস্কৃতির ওপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আর এই রাস্তায় সে অন্যান্য দেশের ওপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে, যাতে পাশ্চাত্য দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। শুধু একটি পণ্য বাজারে আনা পর্যন্ত কাজে কয়েক দেশের শ্রমিক-মজদুর শরীক হয়ে কোথাও সেই পণ্য প্রস্তুত হয়, বিশেষ করে এমন স্থানে যেখানে শ্রমিক স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। আবার কোথাও সে পণ্যের প্যাকিং করা হয়। আবার কোথাও নিয়ে যেয়ে তা বিক্রি করা হয়। এক একটি পণ্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের অংশ গ্রহণ এবং সেখানে নিজের কারখানা খোলার কারণে এই সকল কোম্পানি সে সমস্ত দেশকে সহজেই ব্ল্যাকমেইল করতে পারে এবং স্বীয় মর্জি অনুযায়ী সেখানের রাজনীতির মোড় পাল্টে দেয়ার শক্তি রাখে।[২০১]

২০০০ সালের ১৯ জুন ১৫টি উন্নয়নশীল আফ্রিকান ও এশিয়ান দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সদস্যরা স্বীকার করেন, নতুন বিশ্ব অর্থনীতির ফায়দা বা লাভ ছোট্ট গোষ্ঠীরই হবে। এর ফলে তাদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি হবে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র নির্মূলের পরিবর্তে তা আরো বৃদ্ধি পাবে। আরব অর্থনীতিবিদরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের আলোচনা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পয়েন্টে উপস্থাপন করেছেন:

(ক) সরকারের নিজস্ব জাতীয় অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা খতম হয়ে যাবে।

---

১৯৯. Avj-Bmjvg Iqvj Avlj vgvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

২০০. তুফানল আওলামাহ ওয়া ইনতিসাদিয়াতুনাল মুসলিমাহ, gvmK Avj-eqvb, সংখ্যা ১৫১, পৃ.৭৭

২০১. Avj-Bmjvg Iqvj Avlj vgvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

(খ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বকরণ করা হবে এবং বিদেশ থেকে তার নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্য সেগুলোকে বিশ্ব বাজারে সংযুক্ত করা হবে।

(গ) বিদেশী বাজার কর্তৃক আরবদের বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্মূল করে দেয়া হবে।

(ঘ) স্থানীয় অর্থনীতিকে দেশীয় উন্নয়নের দাবি পূরণ করার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক ব্লক ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের অবকাঠামোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। 'মধ্যপ্রাচ্যের' পরিভাষা যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বলা হয় তা অর্থহীন সাব্যস্থ করা হবে।[২০২]

(চ) বিশ্বায়নের একটি উদ্দেশ্য হলো, উন্নয়নশীল দেশের ওপর এমনভাবে অর্থনৈতিক অধীনতা চাপিয়ে দেয়া হবে যে, বছরের পর বছরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেন সে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকে এবং সর্বদা অর্থনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির স্বীয় গলায় পরিয়ে রাখে। এ উদ্দেশ্যের জন্য পশ্চিমা কোম্পানির কর্মপদ্ধতি হলো, তারা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কাঁচামাল সস্তা দামে ক্রয় করে। সেগুলোকে প্রস্তুত করে সে সকল দেশেই আবার চড়া মূল্যে বিক্রি করে। এমনিভাবে আরব বিশ্বে পেট্রোলের ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকল কোম্পানিই পশ্চিমা, যারা পেট্রোল উত্তোলন থেকে শুরু করে তা পরিষ্কার করা, ব্যবহারযোগ্য বানানো এবং তা বিক্রি করা পর্যন্ত সকল স্তর অতিক্রম করে। এর জন্য তারা আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে বিরাট বিনিময় উসূল করে। এই সম্পদই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশে পৌঁছে যায়। এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে তেল উত্তোলনের এই কাজের ওপর ট্যাক্সও আরোপ করা হয়; আরব বিশ্বে এ কাজটি ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে।[২০৩]

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মাধ্যমে পশ্চিমা, বিশেষ করে আমেরিকা ও তার ওপর পরোক্ষ শাসনকারী ইহুদীগোষ্ঠী চায়, গোটা দুনিয়া অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে তাদের অধীন, বরং তাদের গোলামে পরিণত হয়ে যাক! লোকসানের কেবল সে গ্রাসই গ্রহণ করার অনুমতি থাকবে যা তাদের সামনে নিক্ষিপ্ত হবে। গোটা জীবন সে যা কিছু উপার্জন করবে তা থেকে সে স্বয়ং কিছুটা উপকৃত হোক বা না হোক, কিন্তু তার বিরাট একটি অংশ পূর্ব হতেই বদহজমের শিকার পশ্চিমা শিল্পপতিদের পেটে পৌঁছুক!

---

২০২. আল-ইকতিসাদিল আরাবী ফী মুওয়াজাহাতি তাহাদ্দিয়াতিন নিসফিছছানী মিন আকদিত-তিসনিয়াত, gwmK Avie w'MšÍ, সংখ্যা-১১, পৃ.৭৭

২০৩. আল-ইকতিসাদিল আরাবী ফী মুওয়াজাহাতি তাহাদ্দিয়াতিন নিসফিছছানী মিন আকদিত-তিসনিয়াত, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬

মোট কথা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার খাতিরেই বিশ্বায়নবাদীরা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও তার বুনিয়াদ 'পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা'কে গোটা বিশ্বে বিকাশ ও বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন রকমের পলিসি তৈরি করছে। চুক্তি হয়েছে, সংগঠনও তৈরি হয়েছে। সম্মেলন হয়েছে। সব কিছু এজন্যই হয়েছে যে, বিশ্বের সম্পদের প্রবাহ যেন পশ্চিমের দিকে হয়! কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই উপায়-উপকরণ কি যা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বাস্তব রূপ দানের ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রমানিত হয়েছে? কোন রাস্তায় চলে তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে এবং কীভাবে বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কাঠামোয় চলার জন্য বাধ্য করা হয়েছে? নিম্নে সে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টার করা হয়েছে।

৩.৬.১১. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন: ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলি

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন স্বাধীন অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্যের বিস্তার ও বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে অনেক ক্ষতিকর ও ভয়াবহ বিষয়াবলিও সাথে করে নিয়ে এসেছে। যদিও বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা অবিরামভাবে এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে, বিশ্বায়ন বাস্তবায়ন হলে গোটা পৃথিবীতে একতা ও সমতার জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং প্রাচ্যেও সে সমস্ত পণ্য হস্তগত হবে যা পশ্চিমা দেশে হস্তগত হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দূরত্বের অবসান ঘটবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দ্বারা যে সমস্ত ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা পশ্চিমা জগতের সে সমস্ত দাবির ওপর শুধু প্রশ্নই উত্থাপন করেনি, বরং তা প্রমাণিত করেও দিয়েছে। বিশ্বায়ন নিয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণকারীরা ভালভাবেই বুঝে গেছে, পশ্চিমা জগতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উপকারিতার প্রচার-প্রসার প্রোপাগান্ডার থেকে বেশি মর্যাদা রাখে না। নিম্নে তারই কিছু ভয়াবহতা চিহ্নিত করা হচ্ছে:

(১) অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বিষয় এই যে, গোটা বিশ্বের সম্পদ গুটিয়ে সামান্য কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। গোটা পৃথিবীতে ৩৫৮ জন্য ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাদের সম্পদ বিশ্বের অর্ধেক জনগণের সম্পদের সম পরিমাণ ও বিশ্বের ২০ শতাংশ রাষ্ট্রের পুরো দুনিয়ার ৮৫ শতাংশ উৎপাদন এবং ৮৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর দখলদারিত্ব রয়েছে, অথচ সে সমস্ত দেশের নাগরিক ৮৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক খাদ্যভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয় আর অন্যান্য দেশের জনগণ এক মুঠো খাবার হতে বঞ্চিত থাকে কিংবা তাদের পর্যন্ত খুব কমই খাবার দ্রব্য পৌঁছায়, বরং শুধু ১৯.৫ শতাংশ বিনিয়োগের

মুনাফা ও এক শতাংশ থেকেও কম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে হওয়া আমদানি সে সকল দেশের অংশে আসে যেখানে বিশ্বের ৮২ শতাংশ লোক বসবাস করে।[২০৪]

(২) উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট বিপদ হলো বহুজাতিক কোম্পানির ইজারাদারি, যার মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব দরিদ্র বিশ্বকে অধীন বানিয়ে নেবে এবং তাদের ওপর স্বীয় আধিপত্য কায়েম করবে। নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান দ্বারা এই দাবি বাস্তব বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেনের ৩৫০ টি বড় বড় কোম্পানি এমন রয়েছে যারা ৪০ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করে আছে। সে সব দেশের ১০টি বড় কোম্পানির যোগাযোগ ক্ষেত্রে (সাধারণ ফোন ও মোবাইল ফোন)-এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ৮৬ শতাংশ, কম্পিউটারের ৭০ শতাংশ, পশু ঔষধের ৬০ শতাংশ, সাধারণ ঔষধের ৩৫ শতাংশ ও কৃষি উপকরণের ৩৭ শতাংশের মালিক! এই বিস্ময়কর রিপোর্ট দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামান্য কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উন্নয়নশীল বিশ্বের ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যে দিন উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিষয়ও সরাসরি উন্নত বিশ্বের শাসকবর্গের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।[২০৫]

(৩) অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে সম্পদ ও আয় বণ্টনের মাঝে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এমন কি একই দেশের নাগরিকদের মাঝে আয়ের ব্যাপারে পার্থক্য সীমা পাওয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সকল লোক, যাদের জীবন মেশিনের মত, যে মেশিনের কাজ পুঁজিবাদী পশ্চিমা শক্তির খেদমত করা। বিশ্বায়নের রক্ষাকারীরা খুব জোরেশোরে এই কথা প্রচার করছে যে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমদানির মান বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও ক্ষুধা হ্রাস পাচ্ছে।[২০৬]

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এবং জাতীয়, বংশীয় ও দেশীয় পার্থক্য দেখা গেছে, ঠিক সে ধরনেরই পার্থক্য দেশের আঞ্চলিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, একই দেশের একটি বিশেষ শ্রেণি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কারণে দেশের সম্পদের বিরাট অংশ দখল করে আছে। তার উল্টো

---

২০৪. Av‡j-Av‡l jvgn̦, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২০৫. Av‡j-Av‡l jvgn̦, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২০৬. নিহায়াতুল জুগরাফিয়া, gwmK Av‡j eqvb Av‡j-Av‡l jvgvn, পৃ. ১৯; আল-আওলামাহ লি-মাসলাহাতিল আগনিয়া সালাহুল ফাযলী, ‰`wbK Av‡i-ivqj Avg, কুয়েত, পৃ. ২৪

একটি বড় শ্রেণি এমনও আছে, যারা একেবারে বঞ্চিত। আশ্চর্যজনক কথা হলো, উল্লিখিত অবস্থা এমন দেশেও আছে যাকে উন্নত দেশের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ দ্বারা উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিস্থিতির অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং ফ্রান্সের শুধু ২০ শতাংশ জনগণ প্রায় ৮০ শতাংশ আমদানি দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, আর ২০ শতাংশ সে সমস্ত লোকদেরও আছে যাদের অংশে আসে দেশীয় সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশই।[২০৭]

(৫) ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং বেতন হ্রাসও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধর্ম। পরিসংখ্যান দ্বারা ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল করেই আঁচ করা যায়। ৮০০ মিলিয়ন ব্যক্তি বর্তমান বিশ্বে বেকার রয়েছে এবং এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ১০ বছরে ৫৮০ টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রতি বছর গড়পড়তা ৪ লাখ কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে, অথচ তাদের মুনাফায় কোনোই হ্রাস পায়নি, বরং তাদের সম্পদ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্চে, এমন কি একটি কোম্পানির বার্ষিক আমদানি বণ্টনের সময় প্রতিটি দেশের অংশে ৫ মিলিয়ন ডলার আসে।[২০৮]

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ইউরোপীয় দেশের বাইরে শুধু অষ্ট্রেলিয়াতেই মাফিয়া গ্রুপের সম্পদ ১৯ হাজার কোটি ডলারের উর্ধ্বে, অথচ সরকারকে ট্যাক্স না দেয়া এবং ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা বৃদ্ধির কারণে সে দেশ কঠিন পরিস্থিতির শিকার! এগুলো তো এমন অপরাধ যা শিক্ষিত শ্রেণি তাদের শিক্ষার ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে করছে। এছাড়াও সমাজে এমন কিছু ভয়াবহ অন্যায়-অপরাধ রয়েছে যার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।[২০৯]

(৬) উন্নত বিশ্ব অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের রাস্তায় উন্নয়নশীল বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও কৃষি নীতি বাস্তবায়ন করছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন না হয় এবং এই সমস্ত দেশ পশ্চিমা শিল্পের ক্রেতা হয়ে থাকে! উন্নত বিশ্বের পক্ষ হতে আরোপিত নেতিবাচক পলিসির কারণে কিছু দেশে উন্নয়নের গতি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, এমন কি ১৯৯৮ সালে তো সে সকল দেশে এক

---

২০৭. Avj-Avie lqvj Avl jvgvn্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

২০৮. ড. সালেহ আল-রাকাব, Avj-Avl jvgvn্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

২০৯. Avj-Avl jvgvn্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

শতাংশও উন্নতি–অগ্রগতি হয়নি। বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে।[২১০]

(৭) বিশ্বায়নের ছায়াতলে আরবদের আয়–উপকরণকেও দুর্বল করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আরবদের আসল আমদানির মাধ্যম তেল, যা বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বরং যদি এ কথা বলা হয়, পশ্চিমা বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতি আরবদের তেলের ওপরই নির্ভরশীল, তাহলে ভুল হবে না। কিন্তু উন্নত বিশ্ব প্রথমত তেলকে একটি পণ্য আখ্যা দিয়ে তার গুরুত্ব হ্রাস করার প্রচেষ্টা করেছে। দ্বিতীয়ত, তাকে শিল্পের সেই তালিকা হতে বাদ দিয়েছে যার মুক্ত বাণিজ্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হয়ে থাকে এবং তা ট্যাক্স ও অন্যান্য কাস্টম ডিউটি হতে মুক্ত থাকে। কিন্তু উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা তেলের মুক্ত বাণিজ্যকে বরদাশত করে না, বরং তার ওপর চড়া ট্যাক্স আরোপ করা যা আদায় করতে আরব বিশ্ব বাধ্য, যার কারণে উন্নত বিশ্ব তেলের ওপর শুধু ট্যাক্স আরোপের বদৌলতে গোটা বিশ্বে তেল সরবরাহকারী আরব দেশগুলোর চেয়ে তিন গুণ বেশি মুনাফা অর্জন করেছে। উপরন্তু মার্কিন কংগ্রেস একটি আইনও সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছে, যার আলোকে তেল সরবরাহকারী দেশসমুহের সংগঠন ওপেক-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দেশ তেলের মূল্য বৃদ্ধি করলে তার ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়।[২১১]

এসব কিছু এমন বিপজ্জনক, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্তঃসারশুন্য করে ফেলেছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দি পূর্বে গোটা বিশ্বের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব যে সমস্ত ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল এবং পরিকল্পনা তৈরি করেছিল আজ বিশ্বায়নের মাধ্যমে তা বাস্তবতার রূপ দিচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারী জায়নিস্ট মস্তিষ্ক ৫০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়–উপকরণ প্রয়োগ করে স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য রাস্তা সুগম করেছে। চুক্তি ও সংগঠন-সংস্থার সহায়তায় উন্নয়নশীল বিশ্বকে তাদের রচিত পলিসি গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এ কথা বলা যায়, জায়নবাদী ও জায়নিস্টপূজারী পশ্চিমা বিশ্ব উভয়ই স্বীয় যৌথ প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছে এবং ইসলামী বিশ্বসহ গোটা বিশ্বকে নিজেদের অর্থনৈতিক কলোনিতে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য কথা মুখ থেকে বের হয়েই যায়, যদিও তা বর্ণনার জন্য যত সতর্কতা অবলম্বনই করা হোক না কেন। পশ্চিমা চিন্তাবিদ Phillip F Kally এবং Krisolds যারা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের পলিসিকে

---

২১০. Avi-wimvjv, সংখ্যা ১৪১, ২৮ শে শাওয়াল, ১৪২০ হি. পৃ. ২১

২১১. Avi-wimvjv, সংখ্যা ১৪১, ২৮ শে শাওয়াল, ১৪২০ হি. পৃ. ২১

সমর্থন করে, তারা এ কথার স্বীকৃতি দেয়, "বিশ্বায়ন সীমাতিরিক্ত করে ফেলেছে। বিশ্বায়ন যদি অর্থনৈতিক কল্যাণের রাস্তা হয়ে থাকে তাহলে অর্থনৈতিক কল্যাণেরও রাস্তা হতে বাধ্য। এর হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন।"[২১২]

৩.৬.১২. বিশ্বায়ন ও বাজার বৃদ্ধির অর্থনীতি

পণ্য উৎপাদনের আধুনিকীকিকরণ এবং রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের ভেতর গণতান্ত্রিক অবকাঠামো তৈরি ও পরিবর্ধনের জন্যে বিশ্বায়নের মতো কিছু বিকল্প ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বুর্জোয়া ও প্রশাসনিক পরিকল্পামুখী অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে বলে মনে করা হয়। তবে প্রবাদ আছে যে, নেকড়ে বাঘ তাড়া করলে ভালুকের খপ্পরে পড়তে হয়। বিশ্বায়নের ফল দাঁড়াচ্ছে এরকমই।

কার্ল মার্কস উৎপাদন শক্তি বলতে মানুষের নির্ধারিত পরিকল্পিত ব্যবস্থা ও যোগ্যতার সমন্বয়কে বুঝিয়েছেন, যা সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনীতিই এই উৎপাদন শক্তি তৈরি করে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে নতুন জন্ম দান নয়। আজকে বিশ্বায়ন বা নব্যচিন্তাধারা মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কোনো ভূমিকা রাখছে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, যেমনটি মার্কস বলেছিলেন। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরিকল্পনা, অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক উন্নয়ন উৎপাদনশক্তির নিজস্ব ধারাকে ব্যাহত করে। সাম্প্রতিক চিন্তাধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রযুক্তি-প্রকৌশলের উন্নয়নের ধারা যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এটি একটি রূপান্তরিত ধারা। এই রূপান্তর ব্যক্তি-মানুষের আপন নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভর করে না, সমষ্টির ইচ্ছাতেই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটছে। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে মানুষ এমন কোনো পারমাণবিক প্রযুক্তিশালা তৈরি করছে না যা সমালোচিত হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রগতিশীল মানুষ কখনও চায় না জার্মান-সোভিয়েত সহযোগিতায় যে প্রযুক্তি মানুষের জন্ম দেয় অনিশ্চয়তা, মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। উৎপাদন শক্তিকে অর্থনীতির মূল হাতিয়ার মনে করলে সভ্যতার ক্ষতি হয়, একথা দার্শনিক নর্বার্ট ইলিয়াস তাঁর বিখ্যাত 'সভ্যতা ও প্রক্রিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা মার্কসের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করে।[২১৩]

---

২১২. Atef Suhain Siddiqi, *Questions in Crisis*, (Lahore: Al-Kitab, 1999), p.2

২১৩. Philip G. Cerny, "*Globalization and the changing Logic of Collective Action*", International Organization, Vol. 49, No. 5, 1995, p.67

সমাজতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার ভেতর পণ্যসম্পর্কের উৎস তৈরি হওয়া উচিত, বিশেষভাবে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবিনিয়োগের ব্যবস্থা আছে। উৎপাদনের জন্যে বিভিন্ন ঋণদাতা অর্থ যোগান দেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন সুযোগও নেই।

বিশ্বায়ন হচ্ছে ভোগ্যজাতীয়, তবে তা পাশ্চাত্যে কখনই লোকসানের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্যে এই নীতি উন্নয়নের সহযোগী ছিল। এক সময় বিশ্বায়ন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে উন্নয়নের জোয়ার নিয়ে এসেছিল, এখনো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। বুর্জোয়া সমাজে নতুন তৈরি জিনিস কী রকম, তা মানুষ নিজের সমাজের উপর চোখ ফেললেই বুঝতে পারে।[২১৪]

আসলে বিশ্বায়ন বলতে কোনো নৈতিক ও ধারণাজাত উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝায় না। এটি বৈদেশিক উন্নয়নের চাপে পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি ভিন্ন অন্যকিছু নয়। এতে নৈতিকতা ও মতাদর্শিক বিষয়গুলো অবহেলিত হচ্ছে। এককথায়, সাবেকি উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রশাসনিক ও বুর্জোয়ানির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দলনেতাদের জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক হওয়া সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এমনকি পেরেস্ত্রোয়িকা যেমন কিছুটা প্রশাসনিক–বুর্জোয়া অর্থনীতিকে সমর্থন করে, অন্যদিকে বিশ্বায়নও তেমনি মুক্তবাজার অর্থনীতির সাহায্যে সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩.৭. নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে মিত্র শক্তি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বিশ্বসংস্থা গঠনের পাশাপাশি একটি নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিশ্বব্যাংক ও একটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলা হবে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ওই সম্মেলন ÔteUb DWmÕ সম্মেলন নামেই পরিচিতি পেয়েছে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ডুম্বারটন ওকস শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর অতিদ্রুত কার্যকরী হলেও অন্যান্য সিদ্ধান্ত পুরোপুটি কার্যকরী হয়নি। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পঞ্চাশ বছর পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে, যদিও বিশ্বব্যাংক আগেই গঠিত

---

২১৪. R. Milner, *Globalization and Territorial Identities,* ed Avebury: Aldershot, 1992, p.98

হয়েছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও গঠিত হতে সময় নিয়েছে অনেক। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পঞ্চাশ বছর পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনে কতটুকু সুবিধা পাবে, বাণিজ্য উদারিকিরণের লক্ষ্যে কতভাগ পণ্যের শুল্ক হ্রাস করবে ইত্যাদি নিয়ে সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই আলোচনা চালিয়ে আসছিল। ১৯৯৪ সালে মারাকাশ শীর্ষ সম্মেলনে এসে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও ডব্লিউটিও নিয়ে নানা বির্তক আছে। এই বিতর্কের কথা আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে যতটা না শুনেছি, একুশ শতকে এসে বেশি শুনছি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না -এই অভিযোগটি এখন আগের চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করলে প্রথমেই আমাদের গ্যাট নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

৩.৭.১. গ্যাট (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade)

১৯৯৫ সাল থেকে গ্যাট বিশ্ব বণিজ্য সংস্থারূপে (ডব্লিউটিও) আত্মপ্রকাশ করে। গ্যাট বলতে আমরা বুঝি শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল ১২৪টি দেশ বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে উরুগুয়ে রাউন্ড গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। ঐ চুক্তি একই বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় এবং ঐ চুক্তির মাধ্যমেই গ্যাট ১৯৯৫ সাল থেকে বিলুপ্ত হয়, আর তার স্থলাভিষিক্ত হয় 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' নামের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা। এটি মূলত বিশ্বব্যাংক বা আই.এম.এফ'র মত আরেকটি প্রতিষ্ঠান। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে সংশয় ছিল।[২১৫]

দশটি অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের স্তরায়ন	সমন্বিত মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন
১. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২. জাপান
৩. ব্রাজিল	৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন

২১৫. Jhaon E. Spero and Jeffrey A. Hart, *The Politics of International Economic Relation*, New York. 1997, P. 25

৪. পশ্চিম জার্মানি	৪. পশ্চিম জার্মানি
৫. জাপান	৫. ইতালি
৬. অস্ট্রেলিয়া	৬. ফ্রান্স
৭. চীন	৭. যুক্তরাজ্য
৮. ফ্রান্স	৮. কানাডা
৯. যুক্তরাজ্য	৯. চীন
১০. কানাডা	১০. স্পেন

রাষ্ট্রের স্তরায়নের ধারণা নেয়া হয়েছে রে ক্লিন-এর ধারণা অনুযায়ী। এই ধারণায় কোনো দেশের আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।[২১৬]

নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা[২১৭]

রাষ্ট্রের ধরন ও নাম	মোট মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন	আয়তন (প্রতি হাজার	মানব উন্নয়ন সূচক	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	সামরিক ব্যয় (বিলিয়ন)

২১৬. Ray Cline, *World Power Assessment*, Boulder, Westview Press, 1980; *The World Fact Book*, 1988, (Washington D.C, Central Intelligence Agency, 1988), p.12

২১৭ . *World Development Report*, 1995, World Bank, Washington D.C. 1995, *Der Fishcher Weltalmanch*, 1999, (Frankfurt am Main, 1998), p.67

	(ডলার)	ব.কি.মি)	(HDI)		
গণতান্ত্রিক					
অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৭,৭১৩	১১	১৯.২	৪,৩৩৫
কানাডা	১৯,৯৭০	৯,৯৭৬	১	৩১.০	৭,৭৯০
জার্মানি	২৩,৫৬০	৩৭৬	১৫	৮১.৮	১৯,২৫২
যুক্তরাষ্ট্র	২৪,৭৪০	৯,৮০৯	২	২৭৫.১	২৪২,৭১৭
সমাজতান্ত্রিক					
চীন	৪৮০	৯,৫৬১	১১১	১২৮৪.৬	২২,৩৬৪
কিউবা	৩১১৫	১১৫	৭২	১১.৪	১,২৭২
উত্তর কোরিয়া	৩১১৫	১২১	৮৩	২৬.০	৫,০৮৭
ভিয়েতনাম	২৯০	৩৩২	১২০	৮২.৬	১,৭৫০
সাবেক সমাজতান্ত্রিক					
চেক রিপাঃ	২,৭১০	১২,০৭৫	৩৮	১০.৩	–
হাঙ্গেরি	৩,৩৫০				১,১৮০
পোল্যান্ড	২,২৬০				২,২৭৯
রাশিয়া	২,৩৪০	৯৩	৫২	১৪৫.৬	–
তৃতীয় বিশ্ব					
মিসর	৬৬০	৩,২৮৮	১০৭	৬৯.১	৩,৪২৭
ভারত	৩০০	১,৯৫৮	১৩৪	১০২২.০	৭,৫৫০
মেক্সিকো	৩৬১	২৬	৫৩	১০২.৮	৯৫১
রুয়ান্ডা	২১০	১,০০১	১৫৬	৬৭২	১০১
ছোট রাষ্ট্র					
কমোরোস	৫৩০	১.২	১৩৯	০.৮	–

মালদ্বীপ	৭০০	০.৩	১১৮	০.৩	–
কাতার	১৫,৭৬০	১.০	৫৬	০.৬	–

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চালু হবার সাথে সাথে এই সংস্থাটি এখন বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। সদস্যভুক্ত যে কোনো দেশ তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি অন্য কোনো দেশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই দেশের বিরুদ্ধে এই সংস্থার কাছে নালিশ করতে পারবে। এই সংস্থা অভিযুক্ত দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে তত্ত্বগতভাবে বলা হয়েছে কোনো একটি বৃহৎ দেশ আর এককভাবে বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমনটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।[২১৮]

আইটিও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যখন প্রথমদিকে গঠিত হতে পারল না, তখন দেখা গেল ১৯৪৭ সালে দি জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস এন্ড ট্রেড বা গ্যাট আলোচনা শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রথম জেনেভায় গ্যাট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৩টি দেশ মিলে গ্যাট গঠন করে। ওই সময় গ্যাট বিশ্বব্যাপী ৪৫ হাজার পণ্যের উপর থেকে বাণিজ্য কর হ্রাসের প্রস্তাব নেয়। ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সের এনিসিতে গ্যাটের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে ১৩টি দেশ অংশ নেয়। এতে ৫ হাজার পণ্যের উপর থেকে অতিরিক্ত কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে গ্যাটের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের টরকুইয়ে। এতে ৩৮টি দেশ ৮৭০০ পণ্যের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্যাটের চতুর্থ বৈঠক ১৯৫৫-৫৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৬টি দেশ অংশ নেয় এবং অতিরিক্ত ২৫০ আইটেমের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে ওই বৈঠকে প্রধানত ১০৭টি দেশকে নিয়ে শুরু হয়। ব্যাংকিং, বীমা, টেলিযোগাযোগ, শিল্প এবং বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ায় বৈঠকটি সবচেয়ে জটিল হয়ে ওঠে। উরুগুয়ে বৈঠকের চূড়ান্ত আলোচনায় পৌঁছার জন্য ১৯৯০ সালে ব্রাসেলসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ভর্তুকি নিয়ে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় তা ভেঙ্গে যায়। পরে গ্যাট-এর প্রাক্তন মহাসচিব আর্থার ডাংকেল ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বরে সভা ডেকে ৪৩৬ পৃষ্ঠার এক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

---
218 *World Development Report,* 1995, World Bank, ibid, p.343

গ্যাট থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা[২১৯]

১৯৪৭	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে ২৩টি দেশ জেনেভায় এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং কাস্টমস ট্যারিফ হ্রাস করার ব্যাপারে আলাপ–আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ অক্টোবর তারা শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তিতে (গ্যাট) স্বাক্ষর করে। প্রথম বৈঠকের ফল হচ্ছে ৪৫ হাজার পণ্যের ওপর থেকে ট্যারিফ হ্রাস, যা সমগ্র বিশ্ব বাণিজ্যের এক পঞ্চমাংশ। নভেম্বর মাসে ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিরা কিউবার রাজধানী হাভানায় মিলিত হন। লক্ষ্য: প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থায় স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারসমূহ চুক্তিটি অনুমোদনের কোন অঙ্গীকার না করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার একটি হাতিয়ার হিসেবেই থেকে যায় গ্যাট।
১৯৪৮	১ জানুয়ারি গ্যাট কাজ শুরু করে।
১৯৪৯	ফ্রান্সের এনেসি নগরীতে গ্যাট-এর তৃতীয় দফা বৈঠক এবং ২৫ শতাংশ ট্যারিফ হ্রাসে মতৈক্য হয়।
১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬ সালের মে মাসে আলোচনা অনুষ্ঠিত এবং ২৫০ কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসের একমত্য।
১৯৬০-৬২	যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি, গ্যাট-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ডগলাস ডিলান–এর সম্মানে তার নামে ৫ম গ্যাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যে-ট্যারিফ হ্রাসের পরিমাণ ৪৯০ কোটি ডলারে উন্নীত।
১৯৬৪–৬৭	পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির সম্মানে তার নামে অনুষ্ঠিত হল ‘কেনেডি রাউন্ড’। বিশ্ব বাণিজ্যে ৪ হাজার কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসে ঐকমত্য।
১৯৭৩–৭৯	জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৭ম রাউন্ড শুরু। এতে এ মর্মে ঐক্যমত্য হয় যে, শুধু শুল্ক হ্রাসই নয়, ভর্তুকি ও আমদানি লাইসেন্সের মত বাণিজ্য-প্রতিবন্ধকতাগুলোও অপসারণ করতে হবে। এবারের বৈঠকে শুল্ক হ্রাস ৩০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত।

[২১৯] আমীর খসরু, ‘বিশ্বায়ন ও উদার গণতন্ত্র’ রতনধনু ঘোষ সম্পাদিত eûgwÎK wekvqb, (ঢাকা: গ্রন্থ কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯,) পৃ.১৫৪

১৯৮৬-৯৩	গ্যাট বাণিজ্য মন্ত্রীরা উরুগুয়ের পুন্টা ডেল এস্টে-তে শুরু করেন তথাকথিত উরুগুয়ে রাউন্ড। এটাই এ যাবৎকালের সবচাইতে উচ্চাভিলাষী ও সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য আলোচনা।
১৯৯৪	গ্যাট বাণিজ্য মন্ত্রীরা মরক্কোর মারাকেশ-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে মিলিত হন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তারা অন্যান্য চুক্তিতেও সই করেন।
১৯৯৫	জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি। গ্যাট ও ডব্লিউটিও'র মধ্যে মূল তফাৎটা হল এই যে, গ্যাট ছিল একটা সাময়িক আইনী চুক্তিমাত্র। পক্ষান্তরে ডব্লিউটিও হচ্ছে স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত একটি সংস্থা। এর আছে নিজস্ব সদস্য। কিন্তু গ্যাট-এর ছিল কেবল চুক্তির পক্ষসমূহ। গ্যাট কেবলমাত্র পণ্য বাণিজ্য নিয়েই কারবার করত, কিন্তু 'ডব্লিউটিও'র আওতায় সেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

সারণি: নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অসমতা[২২০]

দেশের নাম ও ধরন	মোট জাতীয় উৎপাদন (ডলার, বিলিয়ন)	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (ডলার)	পিপিপি (PPP, ডলার)	জাতীয় আয়ের শতকরা ভাগ	PQLI বা জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত মান
উচ্চ আয়ের দেশ					

220 আমীর খসরু, 'বিশ্বায়ন ও উদার গণতন্ত্র' পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৭

যুক্তরাষ্ট্র	৬,০৮১ (ট্রিলিয়ন)	২৪৭৪০	২৩,৭৬০	৪১.৯	৯৮
জাপান	৩,৫৬৫	২৮,৬৯০	২০,৫২০	৩৭.৫	১০১
জার্মানী	১,৮৭৭	২৩,৫৬০	২১,১২০	৪০.৩	৯৮
ব্রিটেন	১,০৪৬	১৮,১১০	১৭,১৬০	৪৪.৩	৯৮
ফ্রান্স	১,২৯৬	২২,৩৬০	১৯,৫১০	৪১.৯	৯৯
ইতালী	১,১৮৭	১৮,০৯০	১৮,০৯০	৪১.০	৯৮
কানাডা	৬০০	২১,০৭০	২০,৫২০	৪১.২	৯৯
মধ্যমাত্রার আয়ের দেশ					
ব্রাজিল	৪৩২.২	২,৮১০	৫,২৪০	৬৭.৫	৭৯
ভেনিজুয়েলা	৫৯.৭	২,৯২০	৮,৫২০	৪৯.৫	৮৭
ফিলিপাইন	৫০.১	৭৯০	২,৮৫০	৪৭.৮	৮৩
কলম্বিয়া	৪৫.১	১৩.৫০	৫,৪৮০	৫৫.৮	৮৬
পেরু	৩০.৩	১৩৫০	৩,৩০০	৫১.৪	৭৮
আইভরি কোস্ট	৮.৭	৬৮০	১,৭১০	৪৪.১	৫৬
জ্যামাইকা	৩.৩	১,৩৯০	৩,২০০	৪৮.৪	৯৬
নিম্নমাত্রার আয়ের দেশ					
ভারত	৩৭৪.১	৩০০	১,২৩০	৪১.৩	৬০
ইন্দোনেশিয়া	১২৮.৩	৬৮০	২,৯৫০	৪২.৩	৭৪
পাকিস্তান	৫৪.৩	৪২০	২,৮৯০	৩৯.৭	৫৪
বাংলাদেশ	২৪.৮	২২০	১,৮৫০	৩৮.৬	৪৭
শ্রীলংকা	৯.৯	৫৬০	২,৮৫০	৩৯.৩	৯০
ঘানা	৭.৩	৪৬০	২,১১০	৪৪.১	৬১

৩.৭.২. গ্যাট চুক্তিতে কি আছে

বাইশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ডাংকেল প্রস্তাবের বহু আলোচিত চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথমটি GATS, দ্বিতীয়টি TRIM, তৃতীয়টি TRIP এবং চতুর্থটি MFA। GATS হচ্ছে General Agreement on Trade in Services, TRIM হচ্ছে Trade Related Investment Measures, TRIP হচ্ছে Trade Related Intellectual Property Rights, আর MFA হচ্ছে Multi-Fibre Agreement।[২২১] GATS-এর আওতায় ব্যাংক, বীমা, পর্যটন, দোকানপাট, পরিবহন, বিমান, হোটেল, সিনেমা, টেলিভিশন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সার্ভিস বা সেবামূলক বাণিজ্যিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আনা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেবা খাত পরিচালনা করবে বেসরকারি লোক বা সংগঠন এবং এ খাতে অবাধ বাণিজ্যের পাশাপাশি বিদেশীদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।[২২২] TRIM-এর আওতায় যে শর্তারোপ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে দেশীয় কোম্পানির মত দেখতে হবে। কোনো আলাদা নিয়ম-কানুন এদের ওপর আরোপ করা যাবে না। TRIP-র অর্থ হল বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব।

বাংলাদেশ গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষ ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ অভিমত পোষণ করেছেন যে, এই চুক্তির ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়া হলঃ

ক) গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো পোশাক শিল্পের রপ্তানি কোটা তুলে নেয়ায় বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। গ্যাট চুক্তির ফলে আগামীতে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। বেকার সমস্যা বাড়বে যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

খ) গ্যাট চুক্তিতে শিল্পপণ্যের ৪০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে সংশ্লিষ্ট দেশ আগের মত আর ভর্তুকি পাবে না। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশ ৮ বছর এবং উন্নত দেশ ২০ বছর সময় পাবে। এর ফলে আমদানি নির্ভর দেশে পণ্য মূল্য বেড়ে যাবে। বাড়তি চাপ পড়বে ক্রেতাদের উপর। আবার

---

[২২১] অমীয়কুমার বাগচী, 'ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন, বিপন্ন গনতন্ত্র', সম্পাদনা গ্রন্থ wekvqb fvebv-' fvebv, wØZxq LÐ, (কলিকাতাঃ ন্যাশনাল বুক কোম্পানী এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর, ২০০৮,) পৃ. ৪০৮

[222] আমীর খসরু, 'বিশ্বায়ন ও উদার গণতন্ত্র' পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৭

রপ্তানিতে ভর্তুকি দেয়ার ফলে যাদের রপ্তানি বেড়েছিল, তারা এখন আর সেই সুযোগ পাবে না। এর ফলে এদের রপ্তানি কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কেননা বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ।[২২৩]

গ) 'ট্রিপ'-এর ফলে 'বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মেধা এখন বাণিজ্যকরণ হবে। গরিব দেশগুলো এতদিন নিজস্ব 'প্যাটেন্ট' আইনের আওতায় উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছিল। বাংলাদেশ এ থেকে বাইরে ছিল না। এখন আর বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি আগের মত সহজে ব্যবহার করতে পারবে না। এই সুযোগ গ্যাটের চুক্তি বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেয়া হয়েছে। এভাবে মেধা সম্পদ অধিকার সংরক্ষিত হলে বাংলাদেশের মত গরিব দেশগুলোকে মোটা অংকের বিনিময়ে উন্নত প্রযুক্তি খরিদ করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে। এ অবস্থায় আমাদের ঔষধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এ আইনে আক্রান্ত হবে। ইতোপূর্বে ব্যবহৃত ঔষধ, রসায়ন শিল্প, জৈব প্রযুক্তি, কীটনাশক, নানা গাছপালা ও প্রাণী, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি গবেষণা আগের মত আর স্থানীয়ভাবে করা যাবে না।

ঘ) প্যাটেন্ট আইন আর্ন্তজাতিকীকরণের ফলে আগামীদিনে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম বীজ, গরু–ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি এককভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। তারা চুঁটিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশের মত দেশগুলোর কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। উৎপাদন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা এখানে বেশি। এর সুযোগ নিয়ে উন্নত বিশ্ব আগামীতে বাংলাদেশে তাদের কৃষি বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটা সুযোগ পাবে। কৃষি খাতের মত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঙ) গ্যাট চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের পরিসেবা খাত। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিসেবার অনেক খাত এখন মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যে পরিণত হবে। গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ব্যাংক, বীমা, টেলিকমিউনিকেশন, যোগাযোগ, হোটেল ইত্যাদি পরিসেবা এখন বিদেশী পুঁজির কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে বিদেশী কোম্পানিগুলো পুঁজি বিনিয়োগ করবে এবং পরিসেবায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো খাত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।[২২৪]

---

[223] অমীয়কুমার বাগচী, 'ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন, বিপন্ন গনতন্ত্র', পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৯
[224] অমীয়কুমার বাগচী, 'ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন, বিপন্ন গনতন্ত্র', পূর্বোক্ত, পৃ.৪১০

বাংলাদেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই প্রতিবাদ উঠেছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান এক সেমিনারে মন্তব্য করেছেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সার্ভিস সেক্টর বিদেশী পুঁজির জন্য খুলে দিতে হবে। এর ফলে বিদেশী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি এসে জেঁকে বসতে পারে। অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেছেন, গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আরো খর্ব হবে।

৩.৭.৩. ডব্লিউটিও: গ্যাটের উত্তরসূরি

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য পদ্ধতির আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। বিভিন্ন সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে ডব্লিউটিও তার মুখ্য চুক্তিবিষয়ক বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্ধারণ করে। এই সংস্থাই হচ্ছে সেই মঞ্চ, যার ওপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত বিতর্ক, আলোচনা এবং মীমাংসার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডব্লিউটিও হচ্ছে উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনার প্রতিফলন এবং গ্যাটের উত্তরসূরি সংস্থা।

সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির প্রস্তাবনার একটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য দেশগুলোর অন্য কোনো দেশের পণ্যসামগ্রীকে অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অনুরূপ সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এর জাতীয় আচরণ শীর্ষক শর্তে বলা হয়েছে যে, একবার কোনো বাজারে পণ্যসামগ্রী প্রবেশ করলে সেই বাজারের অভ্যন্তরীণ পণ্যের তুলনায় বাইরের পণ্যসামগ্রীকে কোনোভাবেই কম সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

কোটা পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করা হলেও ডব্লিউটিওর আওতায় শুল্ক এবং কাস্টম শুল্ক বৈধ। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মাধ্যমে এক শ বিশটি দেশ যে শুল্ক হ্রাস করেছে, সেটা প্রায় ২২,৫০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত জাতীয় শুল্ক তফসিলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো এখন ডব্লিউটিওর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিচিত। শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে পাঁচ বছরে সম্পন্ন হবে। এর ফলে শিল্পায়িত দেশগুলো কর্তৃক উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীর ওপর আরোপিত শুল্ক চল্লিশ শতাংশ কর্তন করা হবে। গড়পড়তা ছয় দশমিক তিন শতাংশ থেকে তিন দশমিক আট শতাংশ শুল্ক হ্রাস পাবে। এই শুল্ক হ্রাসের আওতায় উরুগুয়ে রাউন্ড সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের পরিমাণ উন্নত দেশ এবং উত্তরণ প্রক্রিয়াধীন দেশগুলোর জন্য প্রায় এক শ শতাংশ শুল্ক হ্রাস পাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। সদস্য দেশসমূহ বিভিন্ন সেবা খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিধিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক কিছু

অঙ্গীকার করেছে। এসব অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে শুল্ক হ্রাসের মত কিছু বিষয়, যেগুলো বাধ্যতামূলক জাতীয় তফসিলে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।[২২৫]

এগুলো ইচ্ছে, কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন গুডস, ট্রেড ইন সার্ভিসেস এবং ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন আরো তিনটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলো হচ্ছে, কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কমিটি অন ব্যালেন্স অব পেমেন্টস এবং কমিটি অন বাজেট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ডব্লিউটিওর আওতাভুক্ত প্রতিটি বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ রয়েছে, যেগুলো জেনারেল কাউন্সিলের কাছে দায়ি থাকে। এ সবের মধ্যে রয়েছে বেসামরিক বিমান, সরকারি ক্রয়, দুগ্ধজাত পণ্য এবং গবাদি পশুর গোশত বিষয়ক চুক্তি।

ডব্লিউটিওর কাঠামো

ডব্লিউটিওর সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখা হচ্ছে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন, যা প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সংস্থার দৈনন্দিন কাজ অবশ্য কিছু সাবসিডিয়ারি শাখার উপর ন্যাস্ত, যেমন সাধারণ পরিষদ (জেনারেল কাউন্সিল) যা বিরোধ নিষ্পত্তি শাখা (ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি) এবং বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা শাখা (ট্রেড পলিসি রিভিউ বডি) হিসাবেও কাজ করে থাকে। সাধারণ পরিষদ তিনটি প্রধান বিভাগের ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে থাকে।[২২৬]

সচিবালয় এবং বাজেট

ডব্লিউটিও-র সচিবালয় জেনেভায় অবস্থিত। এই সচিবালয়ে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০ জন। মহাপরিচালক এর প্রধান। এছাড়াও রয়েছে আরও চারজন উপ–মহাপরিচালক। গ্যাট উদ্যোক্তাদের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে বছরে বিশ্বে ২ হাজার কোটি ডলারের নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে। বাণিজ্য বাড়বে ৭০ হাজার কোটি ডলারের।

এর ফলে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হবে, তা সত্যি সত্যিই একটা চিন্তার ব্যাপার। কৃষি, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে যে সব কথা উঠেছে, তা ফেলে দেবার নয়। বস্ত্রখাতে কোটা সিস্টেম বিলোপ হয়েছে ইতোমধ্যে। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউটের বিশেষজ্ঞ বিল ফ্রেনজেল বিশ্বাস করেন, কৃষি সম্পর্কিত চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দু’ভাবে সহায়তা করবে; উৎপাদন ভর্তুকি হ্রাসের ফলে

---

225 অমীয়কুমার বাগচী, ‘ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন, বিপন্ন গনতন্ত্র’, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৭

226 আবুল কাশেম ফজলুল হক, RvZxqZvev‘ AvšÍRvwZKZvev‘ wekvqb I fwel¨r, (ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশন, ২০১৪,) পৃ.৭১

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানিকারকদের পক্ষে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করা সহজ হবে। শুধুমাত্র শিল্পায়িত দেশে নয়; বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত পণ্য বাজারে প্রবেশের বর্ধিত সুবিধার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

বলা হচ্ছে, জাপান ও কোরিয়ার চাপে বাজার উন্মুক্ত হবার ফলে থাইল্যান্ড লাভবান হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ভুট্টার জন্য হ্রাসকৃত ভর্তুকির ফলে আর্জেন্টিনাসহ অন্যান্য দেশ অধিক পরিমাণ দানাদার শস্য রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এগার বছর সময় দেয়া হয়েছে।

গ্যাট চুক্তির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এটা সত্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। ভারতে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এছাড়া চুক্তিভুক্ত দেশ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের অনেক দেশ আগে থেকেই গ্যাট চুক্তির কৃষি নীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ করে আসছে। এসব দেশের মতে, কৃষিক্ষেত্রে মুক্তবাজার কোটি কোটি ছোট কৃষি ফার্মকে ধ্বংস করে দেবে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বেকারত্ব বাড়াবে। তবে এটা সত্য, উন্নত বিশ্ব এই গ্যাট চুক্তি নিয়ে যতটা না চিন্তিত, তার চাইতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক বেশি। জানুয়ারি (৯৫) মাসে দিল্লীতে সমাপ্ত ৮২টি উন্নয়নশীল দেশের শ্রমমন্ত্রীদের ৫দিন ব্যাপী সম্মেলনে এই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল। সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ধনী দেশগুলোর সংরক্ষণবাদী নীতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে।[227]

প্রস্তাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সসহ শিল্পোন্নত দেশগুলো শ্রমের মান বজায় রাখতে আগ্রহী দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। এর ফলে শিশুশ্রম এবং অন্যান্য সামাজিক মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশু শ্রমের ব্যবহার রোধকল্পে ধনী দেশগুলো এসব দেশের পণ্য আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ঘোষণায় গরিব দেশগুলোর রপ্তানির ওপর থেকে কোটা পদ্ধতি এবং শুল্ক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারে ধনী দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান হয়। ধনী দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

[227] আবুল কাশেম ফজলুল হক, RvZxqZvev' AvšÍRwZKZvev' wekvqb I fwel¨r, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০

বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলো তাদের ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।[২২৮]

সুতরাং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তথাকথিত বাণিজ্য উদারিকরণের নামে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে কতটুকু সাহায্য করছে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। ইতোমধ্যে সেটা আরো প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে, সেখানে বিক্ষোভ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একজন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। সব মিলিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এই ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে তেমন একটা বড় বিতর্কের সৃষ্টি করেনি, কিন্তু একুশ শতকে এই সংস্থার সেই উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে কেবল বিতর্কই নয়, বরং সংস্থাটি আদৌ টিকে থাকতে পারবে কি না অথবা টিকে থাকা উচিত কিনা, সেই প্রশ্নটিও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা যেমন বিতর্কিত হয়েছে, ঠিক তেমনি প্রশ্ন উঠেছে গরিব দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে। গরিব দেশগুলো বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কীভাবে টিকে থাকবে, সেই প্রশ্নটি আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে নতুন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে করে গরিব দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর এক ধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে।[২২৯]

এক্ষেত্রে এমএনসি বা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো পালন করছে একটি বড় ভূমিকা। এমএনসি উন্নয়নশীল বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে তাদের এক ধরনের আধিপত্য কায়েম করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, কপার ইত্যাদি) রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ওই প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের নামে আইওসি বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানিজ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করছে ওইসব সরকারকে। কোথাও কোথাও তারা সরকারও পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

৩.৭.৪. উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ

---

228 আবুল কাশেম ফজলুল হক, RvZxqZvev' AvšÍRwZKZvev' wekvqb I fwel¨r, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭

229 মোহাম্মদ আবদুল হাই, 'বিশ্বায়ন যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন সম্পাদিত গ্রন্থ wekvqb : msKU I m¤¢vebv, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ২০১২,) পৃ ১০২-১০৩

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেল, ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়ছেই। এ কারণে উত্তর–দক্ষিণ সংলাপের ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব রাজনীতিতে আলোচিত হয়ে আসছে। উত্তর–দক্ষিণ সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে উত্তরের ধনী দেশগুলো থেকে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দক্ষিণের দেশগুলোকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্যই নয়, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সেখানে জীবনধারার মানের উন্নতির ব্যাপারটিও এর সাথে জড়িত। সাধারণ অর্থে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে, অন্যদিকে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোকে বলা হয় উত্তরের দেশ হিসেবে। তবে ঢালাওভাবে তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের সব দেশগুলোকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে কিনা, এ নিয়ে সামজবিজ্ঞানীদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।[২৩০]

যেমন বাংলাদেশ আর কুয়েতকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। এমনকি কম্পুচিয়া কিংবা আলজেরিয়াকেও এই পর্যায়ে ধরা যায় না-যদিও এই চারটি দেশ তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত। ১৯৭৪ সালে সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানী ক্লার স্টারলিং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে চতুর্থ বিশ্বের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, কিছু গরিব দেশ আছে, যারা পরিপূর্ণভাবে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং বিদেশী সাহায্যের সঞ্চালনের মাধ্যমেই এ দেশগুলো টিকে আছে। মূলত, তৃতীয় বিশ্বের মাঝে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকেই দক্ষিণের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোট ৪৪ থেকে ৫০টি দেশ এলডিসি'র প্রতিনিধিত্ব করে।

দক্ষিণের দেশগুলোর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই দেশগুলোতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকায় দেশগুলো গরিব। এই দেশগুলো দীর্ঘদিন পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর, বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের কলোনী ছিল। দীর্ঘদিন এদেরকে কলোনিয়াল প্রভুরা শাসন করেছে। দীর্ঘদিন এদের শাসনে থাকার ফলে এদের সম্পদের একটা বড় অংশ বিদেশে, বিশেষ করে ইউরোপে পাচার হয়ে গেছে। ফলে নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি।

---

[230] মোহাম্মদ আবদুল হাই, 'বিশ্বায়ন যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', পূর্বোক্ত, পৃ.১১০

অর্থনৈতিক অবকাঠামো এখানে গড়ে তোলা হয়নি। উপরন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে এসব দেশগুলোকে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়েছিল।[২৩১] শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বলি কেন, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ ও মূল্য নির্ধারণের উপর তাদের নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিমা বিশ্ব তথা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, উত্তরের ধনী দেশগুলোর কিছু সম্পদ দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে ট্রান্সফার করার। উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের ধারণা, এতে করে গরিব দেশগুলোর অর্থনৈতিক চেহারার কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। পশ্চিম জার্মানির প্রয়াত চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট গরিব ও ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের জন্য নর্থ-সাউথ কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশন দীর্ঘদিন এ লক্ষ্যে কাজ করে গেছে এবং তারা কিছু কিছু প্রস্তাবও রেখেছে। কিন্তু সে ব্যাপারে অতীতে ধনী দেশগুলোর কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি।

দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে একটা প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর সেটি হচ্ছে সেখানে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি। দেখা গেছে, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার সেখানে মানুষের মৃত্যুর কারণ ডেকে আনলেও ওইসব দেশ সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক খাতে ঋণ দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন সারণি থেকে এ ব্যাপারে একটা চিত্র পাওয়া যাবে। তাতে দেখা যাবে উন্নয়নশীল বিশ্বে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাত কিভাবে অবহেলিত। মানুষের জীবনধারণ, উন্নয়ন ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য এই খাত দুটো সরাসরি জড়িত। অথচ দেখা গেছে, এ দুটো খাতের চাইতে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর সাহায্যদাতা ধনী দেশগুলো এখন সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমানোর কথা বলছে। জাপান এটাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচনা করছে।

৩.৭.৫. অর্থনৈতিক জোট

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে, তা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি দিক। এপেক এই অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় এপেকের গুরুত্ব

---

২৩১. Mahbub ul Haq, *The Poverty Curtain: Choices for the Third World*,(NewYork, 1976,) P. 124

দিনে দিনে বাড়ছে। যে ২১টি দেশ নিয়ে এপেক গঠিত সেগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তাইওয়ান, হংকং, মেক্সিকো, পাপুয়া নিউগিনি, চিলি, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু। ১৯৮৯ সালে মাত্র ১২টি দেশ নিয়ে এপেক যাত্রা শুরু করেছিল।[২৩২]

এপেক পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। এই ফোরামে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর জি-৭এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো যেমন রয়েছে (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা), ঠিক তেমনি রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোও (মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন)। একই সাথে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উঠতি অর্থনৈতিক শক্তির দেশও রয়েছে। পৃথিবীর তিনটি বড় অর্থনৈতিক শক্তির একটি হচ্ছে এপেক। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সাথে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর একটা সম্মিলন ঘটেছে এই ফোরামে। এপেক মূলত একটি বাণিজ্য জোট। জোটভুক্ত এই অঞ্চলগুলোর লোকসংখ্যা ২শ কোটিরও বেশি। সারা বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৫৫ ভাগ জোটভুক্ত দেশে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের জিডিপি'র পরিমাণ ১৬ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। আর এদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশ এই জোটের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কর্মকর্তাদের মতে প্যাসিফিক রিম হচ্ছে এখন এক ট্রিলিয়ন (১ হাজার মিলিয়ন) ডলার মূল্যের বাণিজ্য বাজার। এ এলাকায় দ্রুত ব্যবসার প্রসার ঘটছে।[২৩৩]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানি ও মাইক্রোসফট কর্পোরেশন দুটোর ধারণা তাদের ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এ অঞ্চল, বিশেষ করে এশিয়ায় প্রসার লাভ করবে। বোয়িং প্রজেক্টগুলোর মধ্যে ২০১০ সালের মধ্যে শুধু চীনেরই প্রয়োজন হবে ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৮শ'টি নতুন বিমান। আর মাইক্রোসফট জানিয়েছে যে, এপেকের এশীয় সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া তার রাজস্বের পরিমাণ প্রতিবছর শতকরা ৬০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। চীন দ্রুত অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে।

সারণি: এপেকভুক্ত দেশগুলোর সামাজিক চিত্র[২৩৪]

232 আবদুল মোবারক শিকদার, A_%bwZK wekvqb I evsjv‡`k, (ঢাকাঃ সুবচন, ২০০৯), পৃ.৩৭

233 মোহাম্মদ আবদুল হাই, 'বিশ্বায়ন যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

২৩৪. *Human Development Report* 1995, The World Almanac, 1994, p.67

দেশ	মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	জনসংখ্যা মিলিয়ন (২০০০)	PQLI বা জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত মান
যুক্তরাষ্ট্র	৬,০৮১ (ট্রিলিয়ন)	২৩,৮৩০	২৭৫.১	৯৮
জাপান	৩,৫৬৫	০২৮,৬৯০	১২৬.০	১০১
কানাডা	৬০০(বিলিয়ন)	২১,০৭০	৩১.০	৯৯
চীন	৫৬৮	৪৮০	১,২৮৪.৬	৮৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩১৫	৭,২২০	৪৭.১	৯২
মেক্সিকো	৩০৮	১৭,৭৩০	১৯.২	৯৯
অস্ট্রেলিয়া	৩০৮	১০,০০০	২১.৩	৯৫
তাইওয়ান	২০৯	১০,০০০	২১.৩	৯৫
হংকং	৯১	১৫,৭১০	৬.০	৯২
নিউজিল্যান্ড	৪৪	১২,৬৬০	৩.৮	৯৪
চিলি	৩৮	২,৭৮০	১৫.৩	৯২
পাপুয়া নিউগিনি	৪	৯৯০	৪.০	৬১
আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো				
ইন্দোনেশিয়া	১২৮	৬৮০	২১২.৭	৭৪
থাইল্যান্ড	১০৫	২,৮৩০	২২.৩	৮৬
মালয়েশিয়া	৫৩	২,৮৩০	২২.৩	৮৬
ফিলিপাইন	৫০	৭৯০	৭৪.৬	৮৩
সিঙ্গাপুর	৪৭	১৬,৯৭০	৩.০	৯৩
ব্রুনাই	৩.৫	৮,৮০০	০.৩	৭৯

ইতোমধ্যে এপেক সম্মেলনে এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যা বিশ্ববাণিজ্য তথা শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে ফিলিপাইনের সুবিক বে-তে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে ম্যানিলা অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হয়। এতে ২০২০ সালের মধ্যে এশিয়া প্রশান্ত

মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। তবে জোটভুক্ত উন্নত দেশগুলোর জন্য এই সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০১০, আর অনুন্নত দেশগুলোর জন্য ধরা হয়েছে ২০২০।[২৩৫]

যদিও ওই সময়সীমার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহম্মদ আপত্তি তুলেছিলেন। ম্যানিলা অ্যাকশন প্ল্যানে ২০০০ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ওপর ট্যারিফবিলুপ্ত করার মার্কিন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই ব্যাপারেও আপত্তি ছিল অনেক রাষ্ট্রের। বিশেষ করে কম্পিউটার, সেমিকন্ডাক্টর, সফটওয়ার ও টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এখন ট্যারিফ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে বৃহৎ উৎপাদক যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পণ্যে এই অঞ্চলের বাজার ভরে যাবে। ফলে এই অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যাবে। এপেক ফোরামে অংশ নিয়ে চীন একুশ শতক শুরু হবার আগেই বেশকিছু আইটেমের উপর ১৫ থেকে ২৩ ভাগ হারে ট্যারিফ বা শুল্ক হ্রাস করেছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বার বার বলে আসছিল, চীন যদি শুল্ক হ্রাস না করে, তা হলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে না।[২৩৬]

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এশিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা এপেক রাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলে ছিল। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এপেক নেতৃবৃন্দ যখন ভ্যাংকুভারে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন এশিয়াতে অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়। কিন্তু এপেক নেতৃবৃন্দ ওই সম্মেলনে কোনো কর্মসূচি নেননি। এমনকি কিভাবে এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটানো যায়, সে ব্যাপারেও কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। শীর্ষ সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে তখন বলা হয়েছিল, এপেক এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেবে না। বরং তারা আই.এম.এফ-এর প্রচেষ্টা জোরদার করার সুপারিশ করেছিলেন। অন্য বিষয়গুলো এবার কম আলোচিত হয়েছে। তবে এপেকভুক্ত দেশগুলো যাতে মুক্তবাজার তথা মুক্ত বাণিজ্যের পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, তেমন আহ্বানও জানানো হয়েছিল। সম্মেলনে জাপান এশিয়ার

---

২৩৫. Vinod K. Aggarwal, *Debt Games: Strategic Interaction in International Debt Rescheduling*, New Your, 1996, P. 21

[236] ২০০২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) এর সম্মেলনে ড. মাহাথির মোহাম্মদ প্রদত্ত ভাষণ, দৈনিক ইনকিলাব. ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪

অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে ৩ হাজার কোটি ডলারের একটি প্যাকেজ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল। এপেকের বয়স মাত্র আঠারো বছর।[২৩৭]

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফ্রেড বার্গস্টেইন-এর নেতৃত্বাধীন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের একটি কমিটি একটি উন্মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করার পরামর্শ দিয়েছিলো। সেই লক্ষ্যে এপেক ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত এগুতে চাইছে। শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের যে কথা বলা হয়েছে, তাতে সদস্যভুক্ত অনুন্নত দেশগুলোর স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে, তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে এপেক দেশগুলো থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। এপেকভুক্ত এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনেতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে সত্য কিন্তু সেখানকার বেকারত্বের অবসান ঘটেনি। প্রকৃত আয় আর আগের জায়গায় ফিরে আসেনি।[২৩৮]

এমনকি দারিদ্র্য দুরীকরণ ও শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল তাও থেমে গেছে। ফলশ্রুতিতে অস্থিরতা এখনও রয়ে গেছে। সুতরাং বড় অর্থনৈতিক জোট হিসেবে এপেকের আজ বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এটা না করে এপেক যদি প্রতিবছর শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানটি একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য। নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাণিজ্যিক জোট। পৃথিবরি বিভিন্ন অঞ্চলে এখন আঞ্চলিকভাবে জোট গঠিত হচ্ছে। একদিকে বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা অন্যদিকে একাধিক আঞ্চলিক জোট এখন নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যেই গড়ে তোলা হচ্ছে এইসব অর্থনৈতিক জোট। ইউরোপে ইউরোপীয়ান কমিউনিটি, যা কিনা ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। ঠিক তেমনি এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ফোরাম বা এপেক পৃথিবীর তিনটি বড় অর্থনৈতিক জোটের একটি।

নতুন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উচ্চারিত হলেও, এ ব্যাপারে তেমন একটা অগ্রগতি হয়নি। বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ নিয়ে বিতর্ক এখন আগের চাইতে অনেক বেশি। এমনকি একুশ শতকের প্রথম দিকে এসে বাংলাদেশেও এ দাবি জোরালো হচ্ছে। বলা

---

২৩৭. The Challenge to the South, *The Report of the South Commission*, New Jersey, 1987, P. 64

238 আবদুল মোবারক শিকদার, A_©bwZK wekvqb I evsjv‡`k, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯

হচ্ছে, বাংলাদেশে এই সংস্থা দুটোর আদৌ প্রয়োজন নেই। একই কথা উঠেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়েও। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা ধনী দেশ তথা এম.এন.সির পক্ষে কাজ করছে। বিশ্ব এখন বিশ্বায়নের যুগে প্রবেশ করেছে। বাণিজ্য এখন উন্মুক্ত। কিন্তু তথাকথিত উদারনীতি কিংবা বাজার উন্মুক্ত করার মধ্যে দিয়ে যদি উন্নয়নশীল বিশ্ব উন্নত বিশ্বের বাজারে পরিণত হয়, তাহলে তা আগামিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো অর্ন্তভুক্ত থাকলেও সেখানে ধনী দেশগুলোর কর্তৃত্ব বেশি। সুতরাং নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আসা বাঞ্চনীয়।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন

৪.১. সংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। সংস্করণ অর্থ বিশোধন, সংশোধন এবং সংস্কার অর্থ শুদ্ধিকরণ। শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলঙ্করণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ ইত্যাদি।[২৩৯]

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা, রুচি, তামাদ্দুন, মার্জনা, শিষ্টতা, সংস্কার, বিশোধন, সংশোধন এবং শুদ্ধিকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতি-নীতি ও মার্জিত আচার-আচারণ ইত্যাদির উৎকর্ষতাই হচ্ছে সংস্কৃতি (Culture)। এ জন্য কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের অবস্থা, কোনো জাতির মানসিক ঔদার্যের মাপকাঠি, কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য সূচক শিক্ষা-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদির নাম সংস্কৃতি।

ইংরেজিতে Culture (কালচার) অর্থ হচ্ছে কর্ষণ করা। অমসৃণ জমিকে যেমন কর্ষণ করে মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়; তেমনি সদাচরণের কর্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা একজন ব্যক্তি বা জাতি পরিশীলিত ও সংস্কৃতিবান হয়। এজন্য চাষকৃত জমিকে Cultured Land বলা হয়। তেমনি পরিশীলত ব্যক্তি বা জাতিকে বলা হয় Cultured man or Cultured nation।[২৪০]

আরবিতে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হচ্ছে সাকাফাহ (الثقافة)। এর অর্থ সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া। মার্জিত, আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মানুষকে মুসাক্কাফ (المثقف) বা সংস্কৃতিবান বলে। আরবি তাহযীব (تهزيب) এবং উর্দূ তামাদ্দুন (تمدن) শব্দ দুটোও একত্রে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সভ্য-ভদ্র, সজ্জিত ও নন্দিত জীবনকে তাহযীব-তামাদ্দুন বা সংস্কৃতি বলা হয়।[২৪১]

---

২৩৯. নাজির আহমদ ও রুহুল আমিন, gmwjg ms¯‹wZi BwZnvm, ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯, পৃ.৯

২৪০. আবদুর রহীম, wk¶v-mwnZ¨ I ms¯‹wZ, (খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০), পৃ-২৫০-২৫১

২৪১. Dr. A. Zaki Badawi, *A Dictionary of the Social Sciences, English-Franch-Arabic*, (Bairut: Librairie Du Liban, 1978), P-92

পরশীলিত, মার্জিত, সজ্জিত, উন্নত, রুচিসমৃদ্ধ জীবনবোধ ও জীবনাচারণকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বলা হয়। মোট কথা, কোনো জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়।[২৪২]

বিশিষ্ট আরবি পণ্ডিত রাগীব আলী বলেন: الثقافة في اصلاح النفس الصحيح الكامل بحيث يكون صاحبها مرأة الكمال والفضائل لاصلاح الفاسد وتقويم العواج.

অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিকগুণ বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে। খারাপ এর সংশোধন ও বক্রতাকে সোজা করাই হল সংস্কৃতি।[২৪৩]

নৃ-বিজ্ঞানী Taylor বলেনঃ Culture is the complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, Law, Custom and any other Capabilities and habits acquired by men as a member of society. [২৪৪]

অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বিশ্বাস, কলা, নীতি-নিয়ম, আইন, প্রথা, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

আবুল হাশিম বলেনঃ Culture is the development of the faculties of man both external and internal and is it's manifestation in his behaviour and in his immediate material environment.[২৪৫]

অর্থাৎ মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তার প্রতিফলিত রূপকেই সংস্কৃতি বলে।

ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়ঃ ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং

---

২৪২ . Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid*, A Modern Arabic English Dictionary, (Dar-El-Ilm-Lil-Malayen, Bairut, 1985), P-238

২৪৩. রাগিব আলী, Avm-mvKvdvn, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী,১৯৯৬,২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭-৬০

২৪৪. নাজির আহমদ ও রুহুল আমিন, gmwjg ms¯wZi BwZnvm, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২

২৪৫. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, Bmjvg wk¶v I ms¯wZ, (ঢাকাঃ সোনালী সোপান, ঢাকা, ১৯৯৫), পৃ. ২৫

আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়।[২৪৬]

মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতি সংক্রান্ত গৃহীত নীতিমালা এখানে উল্লেখযোগ্য। মেক্সিকো সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বা আইডেনটিটি সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:

১। প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২। সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৩। সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন ও সত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

৪। পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানবজাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোনো সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫। কোনো একটি একক সংস্কৃতি তার সার্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

৬। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান-প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি Pluralism বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেই তৈরি হয়ে থাকে।

৭। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান করা ও সংরক্ষণ করা।

---

২৪৬. নাজির আহমদ ও রুহুল আমীন, gm¨jg ms¯‹…wZi BwZnvm, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৮। একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক ও পার্থিব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে, সকল উন্নয়নের এটিই একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং কোনো দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯। সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ, সুবিধা, অধিকার সকল শ্রেণির মানুষই পাবে, কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ–সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকে সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।[২৪৭]

১০। একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থপতিদের নির্মাণ কর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানকর্ম মানুষের জীবনকে যে অর্থ দান করে, অধিগম্য এবং অনুধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃ-তত্ত্ব, গ্রন্থাকার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১। পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ণ ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।[২৪৮]

ইউনেস্কোর যে বিবেচনাগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে সেই বিবেচনাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি এবং মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। অল্প-বিস্তর কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত বাংলাদেশ একটি সাংস্কৃতিক বৃত্তে আবদ্ধ। তবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বেশির ভাগই ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[247] আবদুল মোবারক শিকদার, A_‰bwZK wekvqb I evsjv‡`k, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫

২৪৮ মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, Avgv‡`i ms¯‹wZ: wePvh welq I P¨v‡jÄmgn, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০১,) পৃ. ১৫-১৭

৪. ২. ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতির সর্বাত্মক সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। যাকে দ্বীনও বলা হয়। আর এ জন্যই আল্লাহ বলেন:

[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ للَّهِ الإِسْلَامُ...]

"ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।"[২৪৯]

ইসলামী জীবন চেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো সংস্কৃতিই মুসলিম জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। তাই ইসলামী জীবন বিশ্বাসের বিপরীত ভাবাদর্শের কোনো আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি কোনো মুসলিম সমাজে দেখা গেলে সাথে সাথে ইসলামী মনীষীগণ সেটাকে অন্য নাম দিয়ে প্রত্যাখান করেছেন। সেগুলোকে বিদআত, কুসংস্কার বা বিজাতীয় সংস্কৃতি تشبه بالقوم الآخر বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তা প্রত্যাখান করেছেন। আর তাই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হতে হবে। নচেৎ তা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হবে না। ইসলামী সংস্কৃতি বেমানান ও অশালীন বিষয়াদি পরিহার করতে বলে। আর ঈমান ভিত্তিক মার্জিত পরিশীলিত উন্নত পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা সম্বলিত সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে।

ইসলামী সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শ ভিত্তিক ও সার্বজনীন। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ তথা মানব জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন নীতির প্রবর্তন। বিশ্বাস, চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, প্রথা, আচার-আচরণ যেগুলো তাওহীদবাদ ও সর্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলা যায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। তাই স্বভাবতই ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে ইসলামে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীআত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

---

২৪৯ . আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯

ইসলামী মূল্যবোধ বা ঈমান তথা বিশ্বাসই হচ্ছে এ সংস্কৃতির প্রাণ। এ বিষয়ে কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.

"পবিত্র কালিমা একটি বৃক্ষের মত যার শেকড় থাকে সুগভীরে প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা থাকে দিগন্ত বিস্তৃত।"[২৫০]

ইসলামী সংস্কৃতির বিশালায়তন প্রাসাদকে অক্ষুণ্ন রাখা মুসলিমজাতির জন্য অপরিহার্য। ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, আচার-আচরণ, উৎসব–অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা মুসলমানের জন্য জরুরি। প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। সে সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান সংস্কৃতি এবং ইয়াহুদীদের জন্য রয়েছে ইয়াহুদী সংস্কৃতি। আবার যেমন আরবদের দেশীয় সংস্কৃতি রয়েছে তেমনি রয়েছে পারসিকদের দেশজ সংস্কৃতি। তেমনিভাবে গোটা মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি। যা অপরাপর সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠসংস্কৃতি। কেননা, মুসলিমজাতি হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠজাতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ .... كنتم خير أمة "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি..."[২৫১]

সর্বশ্রেষ্ঠজাতির সংস্কৃতিও সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই মহাবনী (সা.) অপরাপর জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুণাবলি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মত প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। কাজেই অন্য কোনো জাতির সংস্কৃতি হতে ধার নেয়ার মত অভাব এখানে নেই। একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি। আর ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাশ্বত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। তাই এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। আর এ সংস্কৃতি শাশ্বত সার্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

২৫০. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীমঃ আয়াত ২৪

২৫১. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১১০

জাতীয় অস্তিত্ব ও পরিচিতিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সংস্কৃতির গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিশ্বের সকল জাতি আপন সংস্কৃতি রক্ষায় সদা সচেষ্ট। একই কারণে আমাদের দেশেও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা এবং অপসংস্কৃতি রোধের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। এদেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিদেশী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ বিদেশী হস্তক্ষেপের পথ সুগম করে এ স্বীকৃত সত্য উচ্চারিত হতেও শোনা যায়। এ ব্যাপারে ঐতিহ্য নির্ভর হবার কথাও বলা হয়। তবে সংস্কৃতির আলোচনায় 'শিল্প, সংস্কৃতি ও নিজস্ব' এই শব্দ কয়টির ব্যাপারে অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায়। সেই অস্পষ্টতার কারণে হয়তো একজনের দৃষ্টিতে যা নিজস্ব সংস্কৃতি অপর জনের দৃষ্টিতে সেটা অপসংস্কৃতি কিংবা আপন ঐতিহ্য নির্ভর সংস্কৃতির পরিপন্থী সংস্কৃতিরূপে প্রতিভাত। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাইরের হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করে দেয়। অনেকের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুসারে কার্যত সেটাকেই নিজস্ব সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে হয়। বলাবাহুল্য, দেশের বৃহত্তম জনগণের প্রকৃত সংস্কৃতি কী? তাদের শিল্প সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও রূপরেখা কেমন? ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা বজায় রাখার দরুনই এহেন পরস্পর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। জাতীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত সে অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করা এবং এদেশের গণ মানুষের সংস্কৃতি কোনটি আর বাইর থেকে অনুপ্রবেশ ঘটছে কোন কোনটির, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়া, অন্যথায় এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কারুর দৃষ্টিতে যে সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলা হচ্ছে, কার্যত সেটিই বিদেশী হস্তক্ষেপের পথ সুগমকারী কিংবা, সেটিই জাতির জন্যে ক্ষতিকর অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াবে।[২৫২]

অপসংস্কৃতির পরিচয়

অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। সকলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন অথচ অপসংস্কৃতি বন্ধ হচ্ছে না। বরং আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ একপক্ষ যাকে অপসংস্কৃতি বলছে, অপরপক্ষ তাকে বলছে সংস্কৃতি। আবার একপক্ষের সংস্কৃতি অপরপক্ষের কাছে অপসংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ জাতীয় বিভ্রান্তি থাকার কারণে প্রকৃত অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ার অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে। এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে অপসংস্কৃতির রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। আর সেটা করতে হলে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের প্রশ্ন আসে যা এক হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে, শুধু অনুসরণই বাকী। আমরা কোন জাতি সে জাতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ কী? আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, সভ্যতা, ঈমান,

[252] ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন', (‰'wbK mgKvj, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫,) পৃ.৮

আকীদা সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সরকারিভাবে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হলেই আশা করা যায় অপসংস্কৃতি দূর হবে।[২৫৩]
সংক্ষেপে সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো-সংস্কৃতি এমন কিছু আকাঈদ ও বিশ্বাসবোধ, চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণা ও প্রথা-প্রচলনের সমষ্টির নাম যা এক জাতিকে অন্য জাতি হতে পৃথক করে দেয়।

এই সংস্কৃতির কারণেই একটি মানব জামাত কিংবা সমাজ অন্যান্য জামাত ও সমাজ হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়। আর এ দ্বারা সমাজের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব নিরূপিত হয়। মারিক বিন নবী সংস্কৃতির সংজ্ঞায় লেখেন, সংস্কৃতি কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের নাম। বাহ্যিক বিষয়, যেমন নড়া-চড়া, স্থির, ধরন ও কথাবার্তা, আর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যেমন স্বাদ, আস্বাদন, অনুভুতি, রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদি অর্থাৎ কালচার এমন এক পরিবেশের নাম, যা একটি সমাজের ওপর বিশেষ জীবনের এমন এক ছাপ ফেলে যায় যা আমরা অন্য কোনো জাতি ও সমাজে দেখতে পাই না।[২৫৪]

জাতির ভাষা, ইতিহাস, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রগত প্রতিভা, রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন, মূল্যবোধ ইত্যাদি। যেমনিভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলো সংস্কৃতির একটি অংশ তেমনিভাবে জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার সামগ্রী, কর্মপদ্ধতি, খেলাধুলার তরীকা, মুহাব্বত ভালবাসা, আনন্দ-খুশী, দুঃখ-বেদনার ধরন তার অনুভূতি ও চেতনাও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। যদি কোনো জাতির কাছে আমরা এই আবেদন করি, সে তার উল্লিখিত গুণাবলি ও বিষয়াবলি পরিত্যাগ করবে, স্বীয় চিন্তা-ফিকির, ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতির ধরন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বীয় ভাষা-সাহিত্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ফেলবে। তাহলে তার উদ্দেশ্য এই হবে যে, আমরা সে জাতির সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব করছি এবং তার সংস্কৃতি ও কালচার ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সভ্যতা তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি।"[২৫৫]

এখন যদি সে জাতি এই সমস্ত পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নেয় এবং স্বীয় সংস্কৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে মূলত তার স্বাতন্ত্র্যকে নির্মূল করে দিল এবং স্বীয় অস্তিত্বে প্রশ্নবোধক চিহ্ন লাগিয়ে দিল।

৪.৩. ধর্ম ও সংস্কৃতি

২৫৩ নাজির আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪

254 ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন',পূর্বোক্ত, পৃ.৮

২৫৫. আমিরিকা, Avj g¯Íwev Ïvn Avj wejvqvZj gËwn'vn, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

প্রাচীন কাল হতেই বিভিন্ন সংস্কৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে।[২৫৬] তাদের মাঝে অনৈক্য ও মতবিরোধের এক গভীর দূরত্ব বিরাজমান, যা দূর করা খুবই কঠিন। প্রতিটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি হতে পৃথক ও ভিন্ন। প্রতিটি কৃষ্টির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এজন্য স্বাভাবিকভাবে সে সমস্ত সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুসারীরাও বিভিন্ন পথের পথিক, এমন কি রাস্তার ভিন্নতার সাথে সাথে তাদের গন্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই মতানৈক্যের বুনিয়াদ সে সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা নয় বরং এর বুনিয়াদ তাদের ধর্ম ও দ্বীনের ভিন্নতা, যে ধর্ম ও দ্বীন হতে এই সমস্ত তাহযীব ও কৃষ্টি বের হয়েছে এবং পৃথক পৃথক সৃষ্টি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। একটি জাতি যদি দ্বীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক হয় তাহলে তার সভ্যতা-সংস্কৃতিও সাধারণত একই হয়। কিন্তু যদি একই অঞ্চলের বাসিন্দা আলাদা আলাদা ধর্মের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের মাঝে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিন্নতা হওয়াও অনিবার্য। ইতিহাস যখন থেকে বিভিন্ন ধর্মকে স্বীয় পাতায় সংরক্ষণ করেছে তখন থেকেই বিভিন্ন সভ্যতাও ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতাও এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং যেমনিভাবে অতীতেও ধর্মের বিভিন্নতার অস্তিত্বও সভ্যতার বিভিন্নতার বুনিয়াদ ছিল, তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও এই বুনিয়াদ থাকবে।[২৫৭]

এই সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসল উপাদান দ্বীন বা ধর্ম। ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নকারীরা এই মূলনীতির ওপর একমত। সুতরাং এই ধর্মই জাতির মেযাজ, রুচিবোধ সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর প্রভাবিত হয়। দ্বীন দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়।[২৫৮] আবার এটাই চারিত্রিক অধঃপতনের কারণ হয়। কিন্তু এটা তখন, যখন তার অনুসারীরা সেটাকে মানুষের মনগড়া বিষয় সাব্যস্ত করেছে। এই ভিত্তিতে এটা অসম্বব যে, একজন মানুষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে আর সেই দ্বীন ও ধর্মের পেশকৃত সভ্যতা গ্রহণ করার পরিবর্তে অন্য জাতির সভ্যতা গ্রহণ করে তার ওপর আমল করাকে বৈধ সাব্যস্ত করবে। কারণ তার এই আমল সকল ধর্মের শিক্ষার বিপরীত। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে কিংবা অন্ধ অনুকরণের দুলদুলে আবদ্ধ হয়ে এই অন্যায় কর্মকান্ড করে বসে এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছেড়ে অন্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে নেয়

---

[256] ড. আহমাদ আইয়ূব সোলায়মান, ms¯‹…Zi weKvqb I evsjv‡`k, (ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশন, ২০০৯,) পৃ.৭০

[257] ড. আহমাদ আইয়ূব সোলায়মান, ms¯‹…Zi weKvqb I evsjv‡`k, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

[258] ইমাম গাযযালী (র), এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ মওলানা মহিউদ্দীন খান, (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০২,) পৃ.৬৭

তখন তার ফলাফল এই হবে যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সাথে তার ধর্মও তার থেকে বিদায় হতে থাকবে এবং সফরের পোটলা বেঁধে নেবে। এজন্য প্রয়োজন, এক ধর্মের অনুসারীরা সে ধর্মেরই আনীত সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে সে কোনো উদারতা দেখাবে না।

সভ্যতা-সংস্কৃতি শুধু কিছু রসম-রেওয়াজ, চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণার সমষ্টি নয়, বরং সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উপাদানটা প্রবল থাকে। যে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও প্রথা-প্রচলনের ধারাবাহিকতা কোনো না কোনোভাবে ধর্মের সাথে গিয়ে মেলে। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই প্রথা-প্রচলন ও ধ্যান-ধারণা ধর্মের দৃষ্টিতে সঠিক না ভুল। আমাদের আশপাশে প্রচলিত প্রথা-প্রচলন ও বংশ পরম্পরায় চলে আসা রসম-রেওয়াজকে সর্বদা ধর্মীয় রং দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এজন্য কোনো ধর্মের সঠিক অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন সে ধর্মের সংস্কৃতি ও কালচার পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং স্বীয় জীবনে অন্য কোনো জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচার প্রবেশ করার সুযোগ না দেয়া।[২৫৯]

৪. ৪.সভ্যতার মূল্যায়ন ও মূল্যমান

বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বায়নের পরিভাষার সাথে সাথে অপর দু'টি পরিভাষাও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আর তা হলো: সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও সভ্যতার আন্তঃসংলাপ।

বিশ্বায়নের কিছু সমর্থকের ধারণা, গোটা বিশ্বে প্রচলিত সকল সভ্যতা একে অপরের নিকটবর্তী করে দেয়া হোক। প্রতিটি সভ্যতার অনুসারীরা অন্যান্য সভ্যতা হতেও রীতি–নীতি গ্রহণ করে তা স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করুক। এর জন্য বিভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধিদের পরস্পর আলোচনা করা এবং প্রতিটি সভ্যতার মৌলিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোর ওপর একমত হওয়া দরকার, যাতে এভাবে একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও একক সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভ করে।

কিন্তু যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে দেখা হয় তাহলে বিষয়টি অসম্ভব মনে হয়। কারণ প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি দ্বীন কোনো না কোনো সভ্যতার ধারক। এজন্য নিজ নিজ ধর্মের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিত্যাগ করা বলতে প্রকৃতপক্ষে সে ধর্মকেই পরিত্যাগ করার নামান্তর। উপরন্তু বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন সভ্যতাকে একে অপরের নিকটে আনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে ইসলামী

---

[259] ড. আহমাদ আইয়ূব সোলায়মান, ms¯‹…Zi wekvqb I evsjv‡`k, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩

সভ্যতাকেই বেশি টার্গেট বানানো হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার বিরাট অংশকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সাথে সাথে তার স্থানে পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহণ করার প্রতি জোর দেয়া আছে।[২৬০]

এজন্য ‘বিভিন্ন সভ্যতাকে পরস্পর নিকটে আনা’ এই স্লোগানের সাথে বাস্তবতার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই, বরং এটি শুধু ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান যুগে যাকে বাস্তবতা বলা যেতে পারে তা হলো বিশ্বায়নের ঠিকাদারদের সর্বদা এই প্রচেষ্টা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যে, প্রতিটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার নির্মূল করে মার্কিন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গোটা বিশ্বে একক সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে হবে, যাতে বিশ্ব এই সভ্যতা গ্রহণ করে এবং এমনভাবে জীবন যাপন করে যা দ্বারা মার্কিন স্বার্থে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না হয় এবং বিশ্বায়ন তার সকল উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়। কারণ যখন ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠী মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির শৃঙ্খল স্বীয় গলায় পরে নেবে তখন তাদের মার্কিন রাজনেতিক ও অর্থনৈতিক রীতি–নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না। আমাদের দেখতে হবে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন গোটা বিশ্বে কীভাবে বিস্তারিত ও বিকশিত হচ্ছে। এর কারণ ও উপকরণ কী? এর অন্তরালে কি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিহিত? এর ইতিহাস-ঐতিহ্য কি? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আসুন, আমরা সভ্যতা সংস্কৃতির অর্থ ও এর বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করি।

৪. ৫. সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও তার উদ্দেশ্য

বিশ্বায়ন যেমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে বাস্তবায়ন করতে চায় তেমনিভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও স্বীয় রঙ্গে রঙিন করতে চায়। রাজনীতি ও অর্থনীতির পরে এখন তার উদ্দেশ্য সংস্কৃতিকেও বিশ্বকরণ করা এবং গোটা বিশ্বে একই ধরনের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া।[২৬১]

এর লক্ষ্য হলো, প্রকৃতিভাবেই বর্ণ ও বংশে মানুষের মধ্যে সুনিশ্চিত প্রবল বৈপরীত্য পাওয়া গেলেও ভাষা, মেজাজ ও রুচিবোধ, চাল-চলন, আচার-আচারণ ও জীবনের মান, এমন কি চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং তাদেরকে অভিন্ন মূল্যবোধে একীভূত করা হবে। সকল মানুষের ভাষা এক হবে। আর অবশিষ্ট ভাষাগুলো ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে দেয়া হবে। তাদের অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা এক ধরনের হবে যাতে ধ্যান-ধারণার বৈপরীত্যের কারণে কোনো স্বার্থ অর্জনের

---

[260] Dr Khurshid Ahmed, ‘Why Global Capitalism Why not pluralist economy’ *Impact International*, Jan-February, 2004, p.33

[261] Dr Khurshid Ahmed, ‘Why Global Capitalism Why not pluralist economy’ ibid, p.34

রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। তাদের জীবনের চাল-চলনও এক হবে, যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি ও বিক্রয়কারী কোম্পানির কখনো মন্দা বাজারের অভিযোগ না হয়। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বায়নের অন্যান্য বিভাগে পশ্চিমা ও মার্কিন মূল্যবোধের প্রাধান্য প্রবল ছিল বরং অন্যান্য ধ্যান-ধারণার প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপও করা হয়নি। রাজনীতিকে মার্কিন স্বার্থ অনুযায়ী পুনর্গঠন করা হয়েছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক পালার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকই পশ্চিমা ও মার্কিন সংস্কৃতিকেই বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য নির্বাচন করা হবে। মার্কিন সংস্কৃতিরই এই অধিকার হবে, সে-ই "গোটা বিশ্বের যৌথ সংস্কৃতি" হবে। তাকেই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও কালচারের যোগ্য মনে করা হবে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে যদিও এক শ্রেণি বিশেষ একটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের সবচে' ভয়াবহ ও বিপজ্জনক বিভাগই হলো সংস্কৃতি। কারণ রাজনীতি ও অর্থনীতির বিশ্বকরণ তো বস্তুবাদের আলোকে করা হচ্ছে। আর সংস্কৃতির সম্পর্ক (যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি) সরাসরি ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জন্য ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ গোটা বিশ্বের সকল সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই নির্মূল করে শুধু মার্কিন ও পশ্চিমা সংস্কৃতি বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ সরাসরি ধর্মের ওপর আঘাত হানা। বিশেষভাবে বললে, ইসলামের উপর আঘাত হানা। কারণ অন্য কোনো ধর্মের এমন বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, যেমন আছে ইসলামের। কাজেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে মোটেই সহজ ভাবা উচিত নয়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চেয়েও ভয়ানক এবং সুদূর প্রসারী।[২৬২]

বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারক সংস্থাগুলো সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এজন্য বিশ্বকরণ করতে চায়, যাতে রসম-রেওয়াজ, আচার-আচারণ, প্রথা-অভ্যাস, চাল-চলন ও জীবনের মানের সামঞ্জস্যের কারণে মানবতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ যার সংখ্যা বেশি, তার মর্যাদা হলো আন্তর্জাতিক বাজারের একজন ট্যাক্স আদায়কারীর মত। তার কাজ ট্যাক্স আদায় করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পদের হকদার ও অধিকার শ্রেণির সেবা করা, আর দ্বিতীয় শ্রেণি যার সংখ্যা কম, তারা একচেটিয়া সবাই ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতি, তাদের কাজ স্বীয় বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করা ও অধিকতর সম্পদ কামাই করা।

মূলত সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এটাই যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়ও যেন কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং ভূপৃষ্ঠে

---

[262] Dr Khurshid Ahmed, 'Why Global Capitalism Why not pluralist economy' ibid, p.40

এমন কোনো লোক অবশিষ্ট না থাকে যার মস্তিষ্কে পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন ও অভিযোগ খাড়া হবে, তার মুখ দিয়ে জায়নবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ বের হবে, ফলে তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অন্য লোকও পথ খুঁজে পাবে এবং সে বিশ্বায়নের রাস্তায় অন্তরায় হবে! সংস্কৃতির বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানসিক দাসত্বে অভ্যস্থ একদল অনুগত বিশ্বমানব তৈরি করাই এর প্রবক্তাদের মূল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এ লক্ষ্য অর্জনের পথে তারা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, যাতে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো জাতি তেমন কোনো বাধাও প্রদান করেননি।

৪. ৬. বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতা

বিশ্বায়ন (Globalization) নিয়ে মার্কিন জোটের যে রাজনীতি সে সেক্টরে জোটগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে ইঙ্গ–মার্কিন জোটের নিকট নতজানু আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। বিশ্বঅর্থনীতি গ্রাস ও এক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনা করছে World Trade Organization এবং সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘের অধীনস্থ অনেকগুলো সাব-কমিটি, যেগুলোর কাজ হলো বিশ্বের সকল ভাষা ও চিন্তার জগৎকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে তাদের নিজস্ব গতিতে পরিচালনা করা।[২৬৩] Globalization For Political System হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করা যার মাধ্যমে যে কোনো দেশের Internal-External Affairs নিয়ে যখন তখন Interfere করা। এভাবে সমগ্র বিশ্বে International Police-এর ভূমিকা পালন করে তাদের রচিত তথাকথিত আইন অমান্যকারীদেরকে ইচ্ছা মত শাস্তি দেয়া। সকল ইচ্ছা এখনও সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও তবে সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজ তাদের পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি Globalization বা বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব আজ ছোট বড় সবার হাতের মুঠোয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকি, সিনেমা হলে এখন আর ভাল মানুষ যায় না। ভাল মানুষ বলতে চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে সিনেমা আজ কাল আর তৈরি হচ্ছে না। তাই সিনেমা হলে গিয়ে কেউ এখন আর সিনেমা দেখে না। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের হাটবাজার হতে শুরু করে রাজধানীর ভিআইপি এলাকা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে কথা বলে, তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যে চিত্র পাওয়া গেছে এবং পত্র–পত্রিকায়ও তাদের যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বুঝা

[263] John Ravenhill, *Global Political Economy,* Oxford University Press, 2007, p.27

যায়, ভালো সিনেমা বলতে তারা এমন সিনেমাই বুঝেন, যা পরিবারের সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে দেখা যায় এবং যার কাহিনী, চিত্রায়ন, চিত্রনাট্য ও গান আকর্ষণীয়। এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, আমরা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখি না। কিন্তু সিনেমার পোস্টার অবশ্যই আমাদের বাসা-বাড়ীর দেয়াল স্কুল-কলেজের সামনে লাগানো হচ্ছে। যে সিনেমা যতো বেশি উলঙ্গপনা ও যৌন সুড়সুড়ি নিয়ে তৈরী তার সিডি ততো তাড়াতাড়ি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এমন সব সিনেমা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ কক্ষে একবার নয়, দশবার দেখতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। গানও আমরা শুনি না। শোনার আগ্রহও নেই। তারপরও আমাদের কানে অহরহ গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। দুপুরে একটু বিশ্রাম, রাতে একটু ঘুম বা নিরিবিলি একটু পড়াশোনা ও গবেষণাও অনেক সময় গানের অসহ্য আওয়াজের কারণে হয়ে ওঠে না। আপনি বিশ্বের যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। সব পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চালানো হলেও বিবেকবান লোকেরা কিন্তু সব পরিবর্তনকে উন্নয়ন খাতে স্থান দিতে পারেন না।[২৬৪] বিবেকবানরা গ্রহণ না করেও কিন্তু সমাজের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এই সব উন্নয়নকেই কিন্তু জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করে কোনো প্রকারের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে নিচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জেরও একই পরিবেশ। সব কিছুতে যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন-নিবেদন। কেউ কোনো বাধা মানছে না। এসব উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আজ সমাজের ছোট-বড় সবার মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকারের বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদকরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া ছাড়াও তাদের পোস্টারে ছেয়ে গেছে দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জের হাট-বাজার। চমৎকার বক্তব্য, আকর্ষণীয় নারীর অঙ্গভঙ্গি ও বিরাট মূল্যহ্রাস। এসবের কারণে আপনি এসব পোস্টার পড়তে বাধ্য হবেন। শুধু তাই নয়, আপনি এসব পণ্য নিয়ে এসে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবেন। রেডিও-টিভিতে জন্ম নিয়ন্ত্রনের আধুনিক পদ্ধতির নামে বেহায়াপনা ও নারীর বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত একটি পণ্যের সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচার করে পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোনের মাঝের লজ্জা-শরমও তুলে দিয়েছে। বিশেষত সঙ্গমের সময় কনডম ব্যবহার করা না গেলে পরে কীভাবে গর্ভধারণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, বাংলাদেশের সকল টিভি চ্যানেলে এই বিজ্ঞাপন যেভাবে

[২৬৪] আব্দুল লতিফ মাসুম, 'সুনাগরিক ও আগামী প্রজন্মের দুর্ত্তায়ন' (‰'wbK bqv w'MšÍ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ.৭

আকর্ষণীয়ভাবে অসংখ্যবার প্রচারিত হচ্ছে, তাতে পারস্পরিক লজ্জাবোধতো পরের কথা, ব্যভিচারিতাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।[২৬৫]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বন্যায় শুধু দেশ ডুবে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের মগজ ও অনুভূতিকেও ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে এসব নতুনত্ব ও উন্মুক্ততার কারণে ঘর হতে বের হলেই এসব পোস্টার ও গান শুনতে আমরা আজ বাধ্য। তাছাড়া পোস্টারে এখন শুধু নারীর ছবি ও গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইশারা-ইঙ্গিতের কোনো আবেদন-নিবেদন এখন পুরাতন ও সেকেলের মনে হচ্ছে। এগুলো প্রাচীন যুগের বলে প্রত্যাখান করে আধুনিক যুগের নামে আরো অন্য কিছু প্রতিনিয়ত চাওয়া হচ্ছে। নারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া এবং প্যান্টি ও ব্রা পরা, তার নগ্ন বুকের ওপরে পুরুষের শুয়ে থাকার প্রকাশ্য পোস্টার লাগানোকে এখন আর অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বরং একে অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্মারক বিবেচনা করা হচ্ছে।

তাই এখন পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের আগে নারীর রূপ ও চুলের বাহার, শারীরিক গঠনসহ নগ্ন ও অর্ধনগ্ন আকর্ষণীয় অঙ্গের মান বিবেচনা করার পরে পণ্য নিয়ে ভাবা হচ্ছে। নারীর শরীরের কোমলতা প্রকাশ করে যুব সমাজকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে "তোম কাঁহা হো, দুনিয়া বহুত আগে হ্যায়"। এসব চাকিচিক্যের কারণে যুব সমাজের দৃষ্টি আজ নারী ও তার অঙ্গভঙ্গির ওপর স্থির হয়ে আছে। অন্যদিকে এই মাঠে টিকে থাকার জন্য নারীর দৃষ্টি শুধু ফ্যাশান ও কসমেটিকসের ওপর পড়ে আছে। কারণ এখানেও প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কে কার চেয়ে বেশি নগ্ন হতে পারে? কে কার চেয়ে বেশি যুব সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে? কার চাহিদা যুব সমাজের কাছে কতো বেশি? এটা প্রমাণ করার জন্য নারীও পরষ্পরের প্রতিযোগিতায় আজ লিপ্ত।[২৬৬]

পশ্চিমা জগতের রুচিও খুব চমৎকার! নারীদের ব্যস্ততাও খুব চিত্তাকর্ষক। তাদের পছন্দ-অপছন্দের সীমানাও অনেক প্রশস্ত। নারীদের শরীরে রয়েছে কোমলতা এবং পোশাক-আশাকে রয়েছে আকর্ষণ শক্তি। তাই তাদের সকল ব্যবহারকারীর জিনিসের প্রতি পুরুষের জন্মলগ্ন হতে রয়েছে আগ্রহ ও দুর্বলতা। নারী সেলোয়ার-কামিজ, শাড়ী-ব্লাউজ, ব্রা-প্যান্টি, ওড়না-স্কাটসহ জুতা-সেন্ডেলের প্রতিও পুরুষদের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এজন্যই শরীআতে ইসলামিয়াতে নারীর পোশাককেও পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে বলা হয়েছে। যেহেতু নারীর পোশাকের রং ও প্রিন্ট হয় সুন্দর, সেলাই করা হয় মনোযোগ সহকারে, তাই

---

265 আব্দুল লতিফ মাসুম, 'সুনাগরিক ও আগামী প্রজন্মের দুর্বৃত্তায়ন' পূর্বোক্ত, পৃ.৭

266 আব্দুল লতিফ মাসুম, 'সুনাগরিক ও আগামী প্রজন্মের দুর্বৃত্তায়ন' পূর্বোক্ত, পৃ.৭

বর্তমান শতাব্দীর পুরুষদের দৃষ্টি শুধু নারী ও নারীর পোশাকের ওপর। এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে প্রচুর সময় ও অজস্র ডলার অত্যন্ত উদারতার সাথে ব্যয় করা হচ্ছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, জার্মান একটি কোম্পানির জাপানী পার্টনার একটি ব্রা স্বর্ণের সূতা দিয়ে তৈরি করেছে। যার মধ্যে ১৫ কেরেট হিরা লাগানো হয়েছে এবং উক্ত ব্রার নাম দেয়া হয়েছে Millennium Bra। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে টোকিওতে এর প্রদর্শনী হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীতে জাপানের একটি তরুণী শুধুমাত্র একটি প্যান্টি পরে এবং ব্রাটি তার স্তনে লাগিয়ে উক্ত প্রদর্শনীতে দাঁড়িয়েছিল। প্রস্তুতকারকদের দেয়া তথ্য মতে, এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ১৮ মাস। খরচ হয়েছে এতে ১৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় ১৩ কোটি টাকা। এমন একটি কাপড় যা নারীর কাপরের ভেতরে লুকায়িত থাকে এবং নারী-পুরুষ সবার দৃষ্টির আড়ালে থাকবে সর্বদা, এমন কি তার স্বামীর পর্যন্ত যখন-তখন তা দেখতে পারার কথা নয়। অথচ তার জন্য তাদের আজ এতো আয়োজন? আমাদের দেশের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের স্বামীরা ছাড়া তাদের মায়েরাও মেয়েদের ব্রা দেখে না। পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এটিকে গোসলের পর অন্য কাপড়ের ভেতরে শুকাতে দেয়। তবে এখন আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরাও বাবার বয়সের বৃদ্ধ, বড় ভাইয়ের বয়সের যুবক ও ছোট ভাইয়ের বয়সের তরুণের কাছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্তনের সাইজ বলে তাদের হাতে হাতে রেখে ব্রা প্যান্টি কিনে আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। আফসোস! শত আফসোস!! এখানেই পশ্চিমাদের দেখানো বিশ্বায়নের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত এবং নারী জীবনে বাস্তবায়িত। সম্প্রতি এ জাতীয় একটি বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের একটি সেনেটারি নেপকিন তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকল টিভি চ্যানেলে ব্যাপকভাবে দেখানো হয়েছে, যাতে বাবা মেয়ের জন্য প্রকাশ্যে সেনেটারি নেপকিন কিনছেন। বিজ্ঞাপনেই দেখানো হয়েছে, বিক্রেতা মেয়েটি এতে বিব্রত হচ্ছে কিন্তু বাবা ও মেয়ে এতে স্বাভাবিক ও নির্বিকার।[২৬৭]

মূলত পশ্চিমাদের পচা মগজে আজ শুধু নারী আর নারীর শরীর ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই তাদের রুচিও আজ নারী ও নারীর শরীর এবং তাদের পোশাক-আশাক পর্যন্ত সীমাব্দ্ধ রয়েছে। পশ্চিমাদের এই পচা রুচির দুর্গন্ধে আমাদের সমাজ আজ আক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত। উক্ত প্রদর্শনীর মত প্যারিসেও International Exhibition for Woman Brassiers নামে একটি প্রদর্শনী হয়েছে যেখানে হাজার প্রকারের ব্রা রাখা

[267] এ.কে এম সালাহউদ্দিন, 'বিশ্বায়ন আতঙ্ক; বিশ্ব সমস্যার সমাধান ও জটিলতা', মাসুদুজ্জামান ও ফেরদাউস হোসেন সম্পাদিত wekvqb msKU I m¤¢ebv, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, নভেম্বর,২০১২,) পৃ.১৩

হয়েছিল। বৃদ্ধদের মধ্যেও কৌতুহল ও আকাঙক্ষা ছিল প্রচুর। এখানেই শেষ নয়। মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরেও সম্প্রতি মেয়েদের জুতার একটি প্রদর্শনী হয়েছে। সেখানে নারীর একটি জুতার মধ্যে ১৮ কেরেট স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে যার ওজন ২.২৫ কিলোগ্রাম। উক্ত জুতার মূল্য ২৬,৩০০ ডলার অর্থ বাংলাদেশী ১১ লাখ ৫ হাজার টাকা, অথচ জুতা না স্বাস্থ্য ভাল রাখার কোনো ওষুধ, আর না মোটা তাজা করার কোনো টনিক। এতে নারীর সৌন্দর্য বাড়ানোর অথবা চামড়া সুন্দর করে যৌবনের আকর্ষণ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার না আছে এর মধ্যে কোনো যাদু বা ঔষধ। এটি দৈনিক ও সব জায়গায় ব্যবহার করারও জিনিস নয়, বরং কাদা আবর্জনা হতে নিজের পা রক্ষা করার এবং সব সময় পায়ের নীচে থাকার একটি অপমানিত জিনিস। তার যত মূল্যই হোক না কেন, এটি মাথায় রাখার জিনিস নয়। কিন্তু কি করা যাবে? পশ্চিমা জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটিই নমুনা। তাদের কাঁধে নারী সওয়ার হওয়ার পর তারা নারী ছাড়া এখন আর কিছুই ভাবতে পারে না। তাই তারা মানুষের সীমা ছাড়িয়ে পশুত্বের সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছে আজ। হয়ত কোনো একদিন নারীর জুতায় কে কত বেশি চুমু খেতে পারে তার প্রতিযোগিতাও হবে!

এসব কারণে বর্তমানে ইউরোপে পারিবারিক জীবন বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানকার ৮০% সন্তান জানে না তার আসল পিতা কে? যুবকেরা ভোমরার মত এক রমণী হতে আরেক রমনীর মধু আহরণে ব্যস্ত। নারী ভোগ ছাড়া তাদের কল্পনায় অন্য কিছুর স্থান নেই। সকালে একজন Girl Friend থাকলে বিকালে অন্য জন। Boy Friend-এর সংখ্যাকে ইউরোপ আজ সৌভাগ্যবান মাপার thermometer বলা হচ্ছে। যার যত বেশি Boy Friend রয়েছে সে তত বেশি সৌভাগ্যবান তরুনী। Beauty Contest Modern Culture-এর নামে নিত্য নতুন উলঙ্গপনার বাজার আজ সেখানে সরগরম। এটি তাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য। আমেরিকার ৫৩% ছেলেমেয়ের বেড রুমে প্রাইভেট টিভি, ৬৫% রেডিও ও ৬৪% টেপ রেকর্ড রাখে।[২৬৮] যেখানে তারা মাতাপিতার সকল প্রকারের আদেশ-নিষেধ হতে মুক্ত এবং সামাজিক ভয়ভীতি হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যৌন উত্তেজক চ্যানেলসহ যাবতীয় অ্যাডাল্ট মুভি দেখছে। এভাবে তারা যৌবনে পা রেখেই নিজ ঘরে উন্মুক্ত পরিবেশে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং নারী ভোগের সকল পন্থা জেনে নিয়ে যৌন স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যার কারণে যৌবনের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। হাজারো বাধা-বিপত্তির পরও

---

[268] SS Report 2013, New York: John Hopkins Ltd, 2014, p.23

অবৈধ গর্ভধারণ করে সন্তানদের জন্ম দিয়ে সমাজে পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এসব কারণে তাদের পারিবারিক জীবনে আজ এক মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের ১১ লাখ ৪৭ হাজার দম্পত্তি তালাক নিয়েছে। সেখানে এখন প্রতি মাসে ১২ হাজার তালাক হচ্ছে। এই দিক দিয়ে ইংল্যান্ড এখন ইউরোপের তালাকের রাজধানী।[২৬৯]

বিশ্বায়ন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এখন আমাদের বাংলাদেশসহ উপমহাদেশেও পড়তে শুরু করেছে যা সিনেমার পোস্টার, পণ্যের বিজ্ঞাপন ও গানের কলিতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। পুরুষদের রুচি নারীর সৌন্দর্য যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন নিবেদনে সীমাবদ্ধ যার উদাহরণ আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য মেলা যেখানে অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্টল দিয়ে থাকে। কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রির জন্য মডেল কন্যাদের নগ্ন-অর্ধ নগ্ন করে তাদের পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কোম্পানিগুলো কলেজ-ভার্সিটির মেয়েদের ছাড়াও পেশাদার মডেল কন্যাদেরকে Modern Girl অথবা Girl Guide বানিয়ে পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখে। এসব মডেল কন্যারা তাদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে এবং মিষ্টি ভাষা ও আবেদনমূলক চাহনির মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই সম্পর্কে The Times of India 23 Nov. 99 একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে। উক্ত সংবাদে লিখেছে, নগ্ন, অর্ধ নগ্ন মডেল কন্যাদের ব্যবহারকারী কোম্পানীগুলোর বিক্রি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি হয়। বিজ্ঞাপন এজেন্সীদের ধারণা নতুন দিল্লীর বিভিন্ন প্রকারের মেলা ও সম্মেলনের চাহিদা পূরণের জন্য ৫০ হাজার মডেল কন্যার প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের স্টলে যে সব মডেল কন্যারা শাড়ী ও ব্লাউজ পরে মডেল হবে। তাদের ফি দৈনিক ৪০০ রুপি। হাঁটু পর্যন্ত যারা শরীর নগ্ন রাখবে তাদের ফী ২ হাজার ৫০০ রূপি। আর যারা শুধু মিনি স্কার্ট পরে পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ৪ হাজার ৫০০ রূপি ফি দিতে হবে। আর যারা শুধু প্যান্টি ও ব্রা লাগিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ২০ হাজার রুপি পর্যন্ত দেয়া হয়। যে সব সংস্থা বাণিজ্য মেলাসহ সকল মেলায় মডেল কন্যা সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে।[২৭০]

---

[269] SS Report 2013, New York: John Hopkins Ltd, 2014, p.24

[270] Sirajus Salekin, 'Globalization : Perspective Aisa', *The Times of India*, 23 Nov. 99, p.12

এটি একটি বাস্তব সত্য যে, সামাজিক নিয়মনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির প্রচলন ও আদান-প্রদানে তরুণ-তরুণীদের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। কারণ নারী তার প্রকৃতিগত দুর্বলতা, শারীরিক গঠন ও মানসিক অনুরাগ ও ঝোঁকের কারণে খুব সহজে পুরুষদেরকে প্রতারণার জালে আটকে ফেলতে পারে। মানবতার দুশমন, চারিত্রিক মূল্যবোধের বিশ্ব শত্রু আজ সমাজ ও পরিবেশকে দূষিত করার জন্য নারীকে Front Line-এ দাঁড় করিয়েছে। নারী মুক্তির কথা বলে তাদেরকে নিজেদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করেছে। যার কারণে যুব মানস তরুণ সমাজ খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে সোসাইটিতে এসব অপসংস্কৃতি ও চরিত্রবিধ্বংসী অপতৎপরতাকে উন্নতি ও অগ্রগতির নামে চালু করার চেষ্টা করছে। আর অন্যদিকে Sex Education-এর মাধ্যমে কোমলমতি শিশু, Beauty Contest-এর মাধ্যমে তরুণী ও Fashion Show এর নামে নারীদেরকে আজ অবাধে মেলামেশার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এত সব বেহায়াপনা শিক্ষা দেয়ার পরে আবার নারী ধর্ষণ নিয়ে মাতামাতি ও মাতম করার তাদের কোনো অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না। এরপরও বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতাকে কোনো প্রকারের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ করার কোনো যুক্তি আছে কি?[২৭১]

৪. ৭. সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হলো তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ, যার মধ্যে মিডিয়া, প্রচার মাধ্যম ও চলচ্চিত্র ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত। অপরটি হচ্ছে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান ও অভিন্নতার ক্রমবর্ধমান হার।[২৭২]

এর তাৎপর্য হলো, গোটা বিশ্বে একই ধরনের তাহযীব ও একই প্রকারের কৃষ্টি চাপিয়ে দেয়া হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী লোকদেরকে স্যাটেলাইট, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে জুড়ে দেয়া হবে যাতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী যখনই ইচ্ছা তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে এ সমস্ত যন্ত্রের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি জাতির ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ পৃথক পৃথক না হয়ে এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। পুরো বিশ্বের চিন্তা করার পদ্ধতি এক হবে। লোকদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার ধরন একক হবে। তাদের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, চাহিদা আচার-আচরণ, কথাবার্তার আদব ও ওঠা-বসা মোট কথা প্রতিটি বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

---

২৭১. AwgwiKv, Avj-g¯ÍvevÏvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

২৭২. ড. আব্দুল ফাত্তাহ আমহদ আলফাবী, Avm-mvKvdvZj Aviwehvwd AvQwij AvIjvgvn, পৃ. ২৬

বর্তমান যুগের একটি পরীক্ষিত ও ধ্রুব সত্য এই যে, মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম-চাই তা যে কোনোরূপে হোক সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য ও ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই শ্রেণিটি টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদির সহায়তায় একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত। গোটা বিশ্ব বিশেষ করে সে সকল জাতি যারা স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে তারা আজ পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ করছে। প্যারিস ও বার্লিনের গলি দিয়ে বের হওয়া ফ্যাশন পরদিন প্রভাতের পূর্বেই প্রাচ্যের সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে চলে আসে। আর প্রাচ্যের জনগণ তা চোখ বুজে অভিনন্দন জানায়। ইউরোপ-আমেরিকার শিশুরা চৌরাস্তা ও সড়কের পাশে অবস্থিত যে সমস্ত রেষ্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য জিদ ধরে আজ সে সমস্ত খাবারের জন্যই প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোর অলি-গলির শিশুরা জিদ ধরতে দেখা যাচ্চে। যেই ‘বারবী ডল’ (এক প্রকার পুতুল)-এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে নগ্নতা ও উলঙ্গপনার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে সেই বারবী ডলই প্রাচ্যের তরুণীদের মাঝে নগ্নতা ও উলঙ্গপণা মনোভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এমন কি এই নিষ্প্রাণ ও নড়াচড়ার শক্তিবিহীন ছোট ছোট খেলনা মুসলমানদের মত অতীতের চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন এবং বর্তমানের চেতনাবিহীন জাতির এক শ্রেণিকে ভাবতে বাধ্য করছে, এমনকি ইরানের মত দেশেও এ সকল পুতুল মার্কেটে চলে এসেছে অথচ ইরান যথাসম্ভব ইসলামী লেবাসেরই প্রদর্শনী করে চলেছে! তথ্য ও প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মুসলিম শিশুদের মাঝে বারবী ডল-এর জনপ্রিয়তা একই রকম আকাশচুম্বি। কোনো নৈতিক শিক্ষা বা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অথবা মা–বাবার উপদেশ প্রায় নগ্ন এই ডলটির জনপ্রিয়তা তৈরিতে কোনো বাধা হয়নি বা কোনো কারণই মুসলিম শিশুদের মাঝে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। এই বিশ্বায়নেরই ফলাফল যে, আজ আরবরা তাদের জাতীয়, দ্বীনী ও ধর্মীয় পোশাক ভুলে গেছে, অথচ তাদের লেবাস আজও তাদের প্রতীক মনে করা হয়। এমন কি মার্কিন চলচ্চিত্র কেন্দ্র হলিউড ও তার পদাঙ্ক অনুসারী ভারতে ফিল্ম স্টুডিও বলিউড এ ধরনের পোশাককে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের নিদর্শন হিসেবে পেশ করছে। কিন্তু আরবরা তাদের এই প্রভাব সৃষ্টিকারী লেবাস ছেড়ে পশ্চিমাদের লেবাস-পোশাক গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে। এমন কি জর্ডান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, লিবিয়া ইত্যাদি আরব কান্ট্রি তো পশ্চিমা তথা মার্কিন পোশাককেই জাতীয় পোশাক বলে ঘোষণা দিয়েছে। অবশ্য অতীতের ঐতিহ্যকে ঠিক রাখার জন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু বৃদ্ধকে আরবি পোশাক পরিধান করতে পরিলক্ষিত হয়। মোটকথা, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আজ মুসলিম জাতি পাশ্চাত্য পূজার শিকার। যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোকে সভ্যতা-সংস্কৃতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এ কথায় কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব

Dhaka University Institutional Repository

নেই যে, মুসলিম জাতি, বিশেষ করে আরব জাতি হতে তাদের বুদ্ধি বৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা বিদায় হতে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছে। সামান্য গভীরে যেয়ে যদি সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই বুঝা যাবে যে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের করালগ্রাসে মুসলিম জাতি এতটাই পতিত যে, তারা চিন্তায়, শিক্ষায়, পোশাকে, জীবনাচারে, মূল্যবোধে, উৎপাদনে, উন্নয়নে, খাদ্য গ্রহণ এমনকি পারিবারিক জীবনযাপনেও একান্তভাবে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা, অনুকরণ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুশীলন করাকে উন্নয়ন ও আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে যা ইসলামী সংস্কৃতিকে বর্জন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণের এক ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয় যা অদূর ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বকে বিলীন করে দেবে।[২৭৩]

৪. ৮. ভাষাগত বিশ্বায়নের দিকে অগ্রসরমান পদক্ষেপ

যদি এক শব্দে বিশ্বায়নের সারকথা ও তাৎপর্য আদায় করতে হয় তাহলে তার জন্য 'মার্কিনাইজেশন' শব্দটি বেশি উপোযোগী।[২৭৪] মার্কিনাইজেশন-এর উদ্দেশ্য মার্কিনীকরণ অর্থাৎ বিশ্বের সকল বস্তুকে মার্কিনী রঙ্গে রঙ্গীন করে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারণী সংস্থা, বিশ্বায়নের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তার উদ্দেশ্য মার্কিন দ্বীন, মার্কিন ধর্ম, মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি, মার্কিন অর্থব্যবস্থা, মার্কিন সমাজ ব্যবস্থা ও মার্কিন ভাষা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া, ইঙ্গ-মার্কিন ছাড়াও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ যদিও পরিপূর্ণভাবে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মার্কিন সমাজ ব্যবস্থার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে গেছে কিন্তু তারা তাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র বাকী রাখার খাতিরে অনুকরণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অনেকটা তারা এই ভাষাগত আগ্রাসন থেকে মুক্ত। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রকৃত টার্গেট এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ব। এমনিই তো বিস্তৃত দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি মুসলমান অসংখ্য ভাষায় কথা বলে এবং লিখে, বরং উর্দু, ফার্সী ও তুর্কী ভাষা তো, বিশেষ করে মুসলমানদেরই ভাষা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলোকে ইসলামী ভাষা আখ্যা দেয়া হয় না। তবে মুসলমানদের ভাষা অবশ্যই বলা যেতে পারে। আরবি ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী ভাষা হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আর তা হবেই না বা কেন, কারণ এ ভাষাতেই আল্লাহ পাক স্বীয় মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এ ভাষাতেই হাদীস শরীফের বিশাল ভান্ডার মজুদ রয়েছে। এই ভাষার সংরক্ষণের দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়েছেন যার জ্বলন্ত প্রমাণ

---

273 Sirajus Salekin, 'Globalization : Perspective Aisa', ibid, p.13

২৭৪ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বিশ্বায়ন নাকি আন্তর্জাতিকতা' ‰'wbK bqv w'MšÍ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ.৭

আল-কুরআন, যা অপরিবর্তিত অবস্থায় এখনো বিশ্ববাসীর নিকট বিদ্যমান আছে। সুতরাং আরবি ভাষাকে ইসলামী ভাষা বলা হবে না তো কি বলা হবে? একমাত্র আরবি ভাষারই বৈশিষ্ট্য যে, চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তার একটি হরফেরও পরিবর্তন হয়নি, অথচ তার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও আন্দোলনের একটি দীর্ঘ দাস্তান রয়েছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের মিলনকেন্দ্র মিসরে যখন ফ্রান্স ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় পাঞ্জা গেড়ে বসেছিল, তখন সুপরিকল্পিতভাবে এমন একদল ব্যক্তি তৈরি করা হয়েছিল, যারা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম তো ছিল, কিন্তু তারা আরবি ভাষার দ্বীনী বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় রঙের বিরোধী ছিল। তা-হা হুসাইনসহ আরো অনেক লেখক সাহিত্যিক রয়েছে যারা এমন আন্দোলন পরিচালনা করেছিল এবং এমন ধ্যান-ধারণা পেশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল আরবি ভাষার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করা, যাতে এই ভাষা তার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলার পর একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়। স্বার্থান্ধ এ সকল ভাষাবিদ–সাহিত্যিকরা জৈবিক স্বার্থ ও অঢেল অর্থের বিনিময়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের সামনে মাথা নত করে দেয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অবশিষ্ট দিকপাল, যারা ভাষাকে তাদের জীবনের মতোই প্রিয় এবং ঐতিহ্য ও গৌরবের অংশ মনে করতো তাদের প্রবল প্রতিরোধ পশ্চিমা প্রভুদের স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়ন হতে পারেনি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের উপচে পড়া সয়লাব থামার নাম নিচ্ছিল না। কাল ও আজ-এর মধ্যে যদি পার্থক্য এসে থাকে তাহলে শুধু এতটুকু যে, কাল সে সমস্ত ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার ছিল প্রচলিত ও প্রাচীন, আর আজকের উন্নত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত। অবশ্য আরবি,ভাষা ও সাহিত্যকে তার আসল রূপ ও আকৃতিতে বাকী রাখা এবং আধুনিক যুগের উন্নতি-অগ্রগতির সাথে সুসমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কিছু আরব সংগঠন-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য।[২৭৫]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় ভাষার সংরক্ষণের কাজ যাদেরকে দিয়েছেন তারা এর সংরক্ষণে কোনো অবহেলা বা অবজ্ঞা কখনোই প্রদর্শন করেনি। বরং একে সৌভাগ্য ও সওয়াবের প্রতীক মনে করেছে। কিন্তু যদি জনসাধারণের পর্যায়ে এই ভাষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিই সামনে আসে। আশার কিশতি নড়বড় করতে শুরু করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের হাতে তার ব্যর্থতা দৃষ্টিগোচর হয়। ভাষা মানুষের মাঝে সম্পর্ক ও যোগাযোগের একটি মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে ভাষা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পোশাক, বরং এর রক্ষক এবং সংস্কৃতি ও তাহযীবের

[275] ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বিশ্বায়ন নাকি আন্তর্জাতিকতা' পূর্বোক্ত, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

বুনিয়াদ। আর তাহযীবই জাতির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠতম স্মারক। এজন্য কোনো জাতির স্বাতন্ত্র্য ও নৈতিকতা গঠনে ভাষার কত যে বেশি গুরুত্ব তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়! যে কোনো জাতি তার ভাষাকে যত বেশি ব্যবহার করে ততই সে ভাষা তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে স্থায়ীত্ব দান করে। ভাষার এত বেশি গুরুত্বের কারণে ইসলামী শরীআত বিনা প্রয়োজনে অন্যের ভাষা ব্যবহার করা হতে বিরত থাকার উৎসাহ ও নির্দেশ দিয়েছে।[২৭৬] বরং অনেক ফকীহ তো আরবি ভাষা শিক্ষা ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন।[২৭৭] ভাষার সাথে সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে আরো নির্দিষ্ট করে বললে আক্বাইদের সাথে এত গভীর সম্পর্ক দেখে কিছু কিছু ভাষাবিদ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষার আগ্রাসন কোনো সামরিক আগ্রাসন থেকে কম নয়। যেমনিভাবে কোনো জাতি রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ফায়দা ওঠানোর জন্য অন্য জাতির ওপর আগ্রাসন চালায়, তেমনিভাবে ইংরেজি ভাষাও যদি অন্য ভাষার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায় তাতে কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ প্রতিটি জাতি তার ভাষা নিয়ে গর্ব করে। তার ভাষার সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগতি প্রচার-প্রসারকে সে নিজের জন্য সৌভাগ্য ও সম্মান থেকে কম মনে করে না। এ কারণেই তো কোনো কোনো অঞ্চলে ভাষার কারণেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। মেসিডোনিয়া বছরের পর বছর ধরে শান্তির পথ পানে চেয়ে আছে কিন্তু আলবানী ভাষাকে যে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি শান্তির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে।

৪. ৯. ভাষাগত বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

ভাষাগত বিশ্বায়নের কথা শুনে মানব মস্তিষ্কে এ প্রশ্ন অবশ্যই উঁকি মারে যে, তার মর্মার্থ কী? বাস্তবিকই কি কোনো বিশেষ ভাষার বিশ্বায়ন করা হচ্ছে? যদি আমরা বিশ্বায়নের বাহ্যিক অর্থ (স্থানীয়কে আন্তর্জাতিক বানানোর)-এর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে কি বাস্তবিকই এমন কোনো ভাষা আছে যা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গণ্ডি হতে বের হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসে গেছে, না কি বাস্তবেই এমন কোনো ভাষা আছে, যা ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রান্ত করেছে? কি এমন কোনো ভাষাও আছে যাকে গোটা বিশ্বের জনগণ স্বীয় মাতৃভাষার পরিবর্তে যোগাযোগের মাধ্যম বানাচ্ছে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক। কারণ ইংরেজি একমাত্র ভাষা যার বিশ্বায়ন ঘটেছে। এই ভাষাকে সামান্য কিছু দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা হতে বের করে অসীম ও সীমাহীন বানানো হচ্ছে। এখন এই

---

২৭৬. ইবন তাইমিয়া, BKwZhvDm-wmiwZj g¯ÍvKxg, (বৈরূতঃ দারু আলিমুল কুতুব, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ খণ্ড, পৃ. ২০৩

২৭৭. ইমাম শাফেয়ী, Avi-wimvjv, (বৈরূতঃ দারুর ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৪৯

ভাষাতে শুধু কয়েকটি দেশের বাসিন্দারাই কথা বলে না, বরং প্রতিটি দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকও এই ভাষাকে নিজ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এটাই ভাষাগত বিশ্বায়নের রাস্তায় একটি অগ্রসরমান পদক্ষেপ। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সেদিন পূর্ণ হবে যেদিন প্রতিটি দেশের জাতীয় ভাষা ইংরেজি হয়ে যাবে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে মার্কিন অর্থনীতি ও মিডিয়ার আধিপত্যের ফলশ্রুতিতে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। অতঃপর ইন্টারনেটের ব্যবহার তো আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এর বিকাশের সকল রাস্তা উন্মুক্ত ও সহজ করে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন সংস্কৃতির মুখপাত্র ইংরেজি ভাষার শব্দ ও বাক্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মুখে ব্যাপক হয়ে গেছে, এমন কি জার্মানি ও চীনা ভাষাবিদগণ ইংরেজি ভাষার এই ব্যাপকতাকে নিজেদের ভাষার জন্য বিপদ মনে করেছেন। কিন্তু আরবরা এই ভাষাগত আগ্রাসনকে সহাস্য বদনে মেনে নিয়েছে এবং তার জন্য আরবি ভাষার সকল দরজা পরিপূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে যাতে আরবের লোকেরা ইংরেজি ভাষাকে আরবি ভাষার চেয়ে বেশি অভিজাত মনে করে শেখে এবং প্রচলন করে। তারা ইংরেজি জানাকে আভিজাত্য ও উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে আরবদের অভিজাত পরিবারে বিশেষত রাজ পরিবারে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে যার প্রভাব তাদের জীবনেও পড়েছে। আজকাল অধিকাংশ আরবীয় প্রিন্স ও প্রিন্সেসগণ পাশ্চাত্যে লেখাপড়া করছেন এবং পোশাকে, আচরণে, চিন্তায়, দর্শনে ও ভাষায় একেবারে খাঁটি পশ্চিমা হয়ে দেশে ফিরছেন। তাদের মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোতে ইংরেজি ভাষার প্রচলন দুর্দমনীয় গতি লাভ করেছে।[২৭৮]

আমরা ওপরে যেমন আলোচনা করেছি, বিশ্বায়নের আড়ালে কর্মতৎপর মস্তিস্ক যদিও ইহুদী কিন্তু তারা এই আন্দোলনের কেন্দ্র ইসরাঈলকে নির্বাচন করেনি। কারণ তাতে পৃথিবীর সকল মানুষ তাদের আন্দোলনকে সন্দেহ করবে এবং এতে তারা ব্যর্থই হবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে তারা প্রবল পরাক্রমশালী আমেরিকাকে নির্বাচন করেছে। সুতরাং এই দেশের প্রতিটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয়কে আন্তর্জাতিক বানানোই এখন বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বায়ন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এমনিভাবে ইংরেজি ভাষার বিশ্বকরণের প্রচেষ্টাও খুব দ্রুত গতিতে চলছে, বরং একথা বললেই বেশি ভাল হবে যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে খুব দ্রুত গতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলাফল হলো ইংরেজি আজ আন্তর্জাতিক ভাষার স্থান দখল করেছে। এই ভাষাকে আন্তর্জাতিকতার মর্যাদা দান

[278] ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, ‘সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন’, ‰‘wbK hMvšÍi, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ.৫

করা বিশ্বায়নবাদীদের প্রথম টার্গেট ছিল। এখন তাদের টার্গেট হলো অন্যান্য সকল ভাষাকে নির্মূল করে শুধু এ ভাষাকেই ব্যাপক করা। এ রাস্তায় যদি তাদের কোনো প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো আরবি ভাষা। এজন্য পশ্চিমা ফেরাউনদের মস্তিষ্ক এখন এই আরবি ভাষাকে নির্মূল করার পরিকল্পনা তৈরি এবং এই তৈরিকৃত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লেগে আছে।[২৭৯]

৪. ১০. ভাষাগত বিশ্বায়ন প্রতিরোধের উপায়

মুসলিম উম্মাহকে তার দ্বীনী ভাষা (আরবি)-কে রক্ষার জন্য যে রকম সম্ভ্রমবোধ, মর্যাদাবোধ ও দৃঢ়তার আশ্রয় নিতে হবে, যা বিগত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্স ও জার্মানির জনগণ নিয়ে আসছে। এই মূলনীতি শুধু আরবি ভাষাকেই রক্ষার জন্য নয়, বরং প্রতিটি সে ভাষার জন্যই এক মহৌষধতুল্য, যে ভাষা আজ ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনের শিকার হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। উর্দু ভাষাকে যদিও ইসলামী ভাষা বলা হয় না, কিন্তু মুসলমানদের ভাষা অবশ্যই বলা হয়। এ দিক দিয়ে উর্দুভাষীদের ওপরও এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তারা উর্দু ভাষাকে বিদেশী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে। উর্দুর ব্যাপারেও সীমাহনি অলসতা প্রদর্শিত হয়েছে। বরং হুবহু ইংরেজি শব্দকেই উর্দুতে অনুপ্রবেশ করানোকে সঠিক ও ভাল মনে করা হচ্ছে। আরবিদের সাথে সাথে উর্দুকে রক্ষার জন্যও এই সম্ভ্রমবোধ, মর্যাদাবোধ ও গোঁড়ামির আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য। আমাদের স্বীকৃত মর্যাদাবোধকে আমরা তথাকথিত উদারতা দ্বারা শেষ করে দিয়েছি। প্রয়োজনে এই গোঁড়ামি আমাদেরকে ফরাসী ও জার্মানদের থেকে ধার নিতে হবে নতুবা এছাড়া যে কোনো ভাষার সংরক্ষণ সম্ভব নয়।

আমাদের নিকট উর্দু কিংবা ফার্সীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরবির। কারণ আরবি সংস্কৃতির উর্ধ্বে একটি দ্বীনি ও ধর্মীয় সম্পদ, যাকে পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে আসা তুফান ও প্লাবন আজ গ্রাস করে ফেলেছে। এই ডুবন্ত কিশতীর সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন মানুষের দ্বীনী কর্তব্য। আরবি ভাষাকে রক্ষায় আরবদের সাথে সাথে অনারবদেরও একই সাথে এগিয়ে আসতে হবে। ড. হুসাইন বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ তার এক প্রবন্ধে এমন কিছু সমাধান পেশ করেছেন যার ওপর আমল করলে সম্ভবত আরবিকে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। নিম্নে আমরা তাঁর প্রবন্ধে পেশকৃত কিছু প্রস্তাবের উল্লেখ করছি।[২৮০]

---

279 ড. আব্দুল ফাত্তাহ আমহদ আলফাবী, Avm-mvKvdvZj Avievehv wd AvQwi j Avl jvgvn, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

280 ড. হুসাইন বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ, উদ্বৃতিঃ ড. হাসান জামান, mvs¯wZK wekvqb, (ঢাকাঃ নোভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭,) পৃ.১২-১৮

১. বিশ্বের সে সমস্ত অঞ্চলে যেখানে আরবি ভাষার প্রচলন নেই, সেখানে আরবি ভাষার প্রচার-প্রসার করা হবে। এ জন্য আরব দেশে যে সমস্ত অমুসলিম ও অনারব সংখ্যালঘু রয়েছে তাদের মাঝে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মরক্কোর কথা বলা যায়। মরক্কো এমন একটি আরব দেশ যেখানে বিপুল সংখ্যক জনগণ আরবি ভাষা জানে না। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও সেখানে আরবি ভাষার বিকাশ ও প্রচার-প্রসারের প্রয়োজন রয়েছে। যে সমস্ত মুসলিম দেশে আরবি ভাষা বলার প্রচলন নেই যেমন ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি। এসব দেশেও আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে। তাহলে এসব দেশে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওঠানো প্রতিটি পদক্ষেপ সফলকাম হবে। কারণ এসব দেশের জনগণের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড জযবা ও চেতনা রয়েছে। পশ্চিমা দেশসমূহে আরবি ভাষার বিস্তার ও প্রচার-প্রসারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কমপক্ষে পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটিগুলোর মাঝে আরবি ভাষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

২. আরব দেশে গ্রাম্য ভাষায় কথোপকথনকারীদের মাঝে বিশুদ্ধ আরবির বিকাশ ও প্রচলন ঘটাতে হবে; কারণ যখন উপসাগর থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গোটা আরব বিশ্ব বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলবে তখন ইসলামী ঐক্যের পথে অন্তরায় উপজাতীয়, বংশীয় ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কি বিদূরিত হবে না? এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আমাদের আশপাশের পরিবেশে গ্রাম্য ও আঞ্চলিক ভাষা বলা কম করে দিতে হবে। মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম গ্রাম্য ও অশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করবে না, বরং বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

৩. লোকদের হৃদয়ে একথা বসিয়ে দিতে হবে, গ্রাম্য ভাষা ইসলামী ঐক্যের ক্ষেত্রে কোনো বিপদ থেকে কম নয়। তার প্রমাণ প্রতিটি আরব দেশের গ্রাম্য ভাষা অন্য দেশ হতে এত ভিন্ন যে, মনে হয় প্রতিটি ভাষা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আলাদা ভাষা। এ কারণেই যদি ঘটনাক্রমে কোনো স্থানে হিজাযী, লেবাননী ও জাযায়েরী তিন দেশের লোক একত্র হয় এবং তিনজনই গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, তাহলে একে অপরের কথা বুঝার জন্য তিনজনেরই দোভাষীর প্রয়োজন হবে। এ বাস্তবতা দ্বারা একথা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়, বর্তমানে প্রতিটি গ্রাম্য ভাষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে।

মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহ-এর প্রেসিডেন্ট ড. শউক্বী যাইফ তাঁর সংস্থার ৬৭তম বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনকালে এ কারণেই আহ্বান জানিয়েছেন, যদি আরব নেতারা গ্রাম্য ও আঞ্চলিক

ভাষার প্রসারের ওপরই জিদ ধরে থাকেন তাহলে আরব জাতির মাঝে যোগাযোগ ও সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, অথচ ইউরোপ, যেখানে বহু ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে, তারা আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

৪. লোকদের মস্তিষ্কে একথা ঢুকিয়ে দিতে হবে, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার জনগণের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করবে সে বিশুদ্ধ আভিধানিক বিন্যাস ও শব্দ হতে দূরে সরে যাবে, তখন কুরআন-সুন্নাহ বোঝা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলামের দুই ঝর্ণধারা কুরআন-সুন্নাহ বোঝার রাস্তায় অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা হয়ে যাবে।

৫. ইংরেজি ভাষার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ ও বিস্তারের ওপর লাগাম কষতে হবে। কমপক্ষে সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে ইংরেজি ছাড়াও কাজ চলতে পারে, সেখানে ইংরেজিতে কথা বলা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব দেশগুলো তার প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস থেকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির সিলেবাস পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা আবশ্যকীয় ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বে এমনও দেশ রয়েছে, যারা স্বয়ং নিজেদের ইজ্জত করে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্যতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে। সাথে সাথে টেকনোলজি ও সাইন্সের ক্ষেত্রেও কারো থেকে পিছিয়ে নেই। কিন্তু সে সকল দেশ ইউনির্ভাসিটির শিক্ষা স্তরেই কেবল ইংরেজি ঢুকিয়েছে। তারা জাতির নতুন প্রজন্মকে কোনো বিদেশি ভাষা শিখতে বাধ্য করেনি।

কিন্তু মুসলিম দেশের প্রতিটি স্কুলে যাওয়া শিশু প্রথম দিন হতেই বিদেশী ভাষা শিক্ষা শুরু করে এবং ইউনির্ভাসিটি পর্যন্ত স্বীয় পুরো শিক্ষা সফরের মাঝে সে বিদেশী ভাষাই শিখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ফল এই দাঁড়ায়, এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে থেকে তার হৃদয়ে এই ভাষার প্রতি সুউচ্চ ধারণা ও শ্রদ্ধা তৈরি হয়। সে ভাষার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে একদিন সে নিজ দেশকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কোনো পশ্চিমা ইউনির্ভাসিটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, এমনিতেই সে নিজ দেশে থাকা অবস্থায় ইসলামী ও দ্বীনী তরবিয়াত থেকে বহু দূরে অবস্থান করত এবং পশ্চিমা সভ্যতাকে গলায় জড়িয়ে থাকত, যেমনটি সাধারণত দেখা যায়। আর পশ্চিমা ইউনির্ভসিটিতে গেলে তো সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ করা কোনো দূরের বিষয়

নয়। এবং এভাবে জাতির মেধাবী ও সম্ভাবনাময় অংশগুলো ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখপাত্রে পরিণত হয়ে গোটা জাতিকে প্রভাবিত ও আলোড়িত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে।

মানুষের ধারণা, বর্তমানে সাধারণ লোকদের ইংলিশ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব, অথচ তাদের সামনে জাপান, ফ্রান্স ,জার্মানী, চীন ইত্যাদি দেশের জ্বলন্ত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে, যারা তাদের নিজস্ব ভাষার ওপর ভর করে উন্নতি-অগ্রগতির সকল সোপান অতিক্রম করেছে। অতঃপর এটাও একটা বাস্তবতা যে, ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার অনেকটা দখল রয়েছে। যদি সে চায় তাহলে তার প্রয়োজন বেড়ে যাবে। আর যদি হ্রাস করতে চায় তাহলে তা হ্রাস হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটার ব্যবহার করা আজ একটি মানবিক প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যখন লোকজন কম্পিউটারের আরবি প্রোগ্রমের চাহিদা পেশ করল তখন কম্পিউটারের কোম্পানিগুলো আরবি প্রোগাম বেশি পরিমাণে তৈরি করতে বাধ্য হলো। ফলে এসব লোকের ইংরেজিতে কম্পিউটারের পরিভাষা জানার আর কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকল না।[২৮১]

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে ইংরেজির ব্যবহার কম করতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন শুধু ইচ্ছা, সংকল্প ও সাহসের অতঃপর তা বাস্তবায়ন করা।

৬. মানুষের মস্তিষ্কে একথা বসে গেছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও উন্নত চাকরির জন্য ইংরেজি জানা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ধারণা সরকার ও বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দূর করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

৭. আরবি ইউনির্ভাসিটির দায়িত্ব হলো, তারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ও রচিত জ্ঞানগর্ভ ও উপকারী পুস্তকগুলোর আরবিতে অনুবাদ করানোর ব্যবস্থা করবে, যাতে সে সমস্ত গ্রন্থ হতে আরবি ভাষাতেই উপকার লাভ করা সম্ভব হয়। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা শেখানোর প্রয়োজন নেই। অতঃপর অনুবাদকও এমন হতে হবে যারা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত, যাতে কিতাবের অনুবাদের সময় নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতিকার করতে পারে।

৮. শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকবৃন্দ, ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর, অধ্যাপক ও লেকচারারদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তারা নিজেরাও বিশুদ্ধ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন

---

[281] ড. হাসান জামান, mvs¯'wZK weKvqb, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯

করবে এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দানকারী নতুন প্রজন্ম যারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে তারা তাদেরকেও আরবি ভাষার পণ্ডিত বানাবে এবং একটি ভাষাগত বিপ্লব আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৯. স্কুল ও কলেজে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতে হবে, যার মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, গল্পসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণ করার জন্য উৎসাহিত করবে।[২৮২]

হুসাইন বিন জাওয়াদ-এর প্রবন্ধ হতে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, যদিও পয়েন্টগুলো আরবি ভাষা ও আরব জনগণ সম্পর্কে। কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবাবলির আলোকে অন্যান্য ভাষাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। প্রবন্ধকারের মত আরো অনেক লোক রয়েছে। যাঁরা ভাষানুরাগী, স্বীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধকারী, স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকারী এবং স্বীয় উজ্জ্বল অতীতের পদাংকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত বির্নিমাণের সাহস ও বর্তমানে যুগের সবচে' বেশি প্রত্যাশিত বিষয় অর্থাৎ দ্বীনি গোঁড়ামি যাঁদের অন্তরে জাগ্রত আছে। কিন্তু এমন লোকদের সংখ্যা আটায় লবণের বরাবর। সাধারণ পরিমণ্ডল থেকে সরকারি পরিমণ্ডল পর্যন্ত যদিও উল্লিখিত সিদ্ধান্তাবলি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ভাষাগত বিশ্বায়নের এই প্রবাহমান সয়লাবের সামনে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব নতুবা সেদিন বেশি দুরে নয় যেদিন পশ্চিমা দেশের পক্ষ হতে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ প্রতিটি ছোট-বড় ভাষার মূলোৎপাটন করে দেবে এবং পানি মাথা হতে এ পরিমাণ উঁচু হয়ে যাবে, যাতে স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দাবি নিয়ে আর কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

৪. ১১. সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল টার্গেট মুসলমান

বিশ্বায়নের মাধ্যমে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি যার মাধ্যমে চীন ও আফ্রিকার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতিও অন্তর্ভুক্ত। যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু ড. মুহাম্মদ মাখযুন-এর ভাষায়, এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট কিছু কারণের ভিত্তিতে কেবলই মুসলমানগণ এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তিনি এর যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো–

(ক) মুসলিম উম্মাহ বিশাল বস্তুগত সম্পদের অধিকারী। যেমন তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

(খ) পশ্চিমাদের স্বীয় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সেন্টার, ইউনির্ভাসিটি ও প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমে একথা ভালভাবেই জানা আছে, মুসলিম উম্মাহকে সে সময় পর্যন্ত পরাজিত করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে

---

২৮২. হুসাইন বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ, Av j -Av I j vgvn Av j j Mvweqvn, gvmmK Av j -eqvb, পৃ. ১৭০

ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধ বাকী থাকবে। এজন্য মুসলিম জাতিকে অধীনস্থ করার একই পথ, আর তা হলো মুসলিম উম্মাহর সেই বিপ্লবী ধর্মকে পরিবর্তন করে দিতে হবে, যে ধর্ম সকল ধরনের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়।[২৮৩]

(গ) ইসলামী শরীআহ, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন এবং ইসলামী আকাঈদ ও নৈতিক ব্যবস্থাই প্রকৃত পক্ষে বিশ্বায়নের দর্শন ও তার বস্তুগত মূল্যবোধের সবচে’ বড় আতংক।[২৮৪]

৪. ১২. সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়ন

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ-এই তিনটি শব্দ বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে অপরের নিকটবর্তী মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তিনটিরই ক্ষেত্র আলাদা আলাদা। সংস্কৃতির অর্থ ও তার বিষয়াবলি আলাদা। তাহযীবের অর্থ ও তার বিষয়াবলি আদালা। আর সমাজের অর্থ ও তার বিষয়াবলিও আলাদা। বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা যখন মানব তৈরি করলেন তখন তার জন্য কিছু আইন-কানুন ও নির্ধারণ করলেন, যা মেনে চলা তার জন্য অপরিহার্য। তাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার পরিবর্তে দাম্পত্য জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন যাতে একদিকে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্য পূরণ হয়, অপর দিকে জীবনের নিঃসঙ্গতাও দূর হয় এবং তার একজন কল্যাণকামী জীবনসঙ্গীও সুখে-দুঃখে সান্তনা দানকারিণী মিলে যায়। সুতরাং মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন থেকে দাম্পত্য জীবনে যখন পদাপর্ণ করে, তখন সে অনেক নতুন নতুন সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বিবাহের পূর্বে সে কারো সন্তান এবং কারো ভাই-ভাতিজা প্রভৃতি ছিল। এখনো বিবাহের পর সে কারো স্বামী, কারো পিতা এবং কারো জামাই হয়ে গেল। এভাবে একজন ব্যক্তি হতে একটি পরিবার গঠিত হয়। আর কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত হয় একটি সমাজ। এজন্য আমরা বলতে পারি, পরিবার সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর ব্যক্তি পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ, যেমনিভাবে ব্যক্তি ছাড়া পরিবারের কল্পনা অসম্ভব তেমনিভাবে পরিবার ছাড়াও একটি সমাজের পরিকল্পনা অসম্ভব। এই বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের ফল হলো যদি ব্যক্তির মধ্যে কোনো অনিষ্ট ও রোগ-ব্যাধি পাওয়া যায় তাহলে সে সমাজের ওপর সরাসরি তার প্রভাব পড়ে। এমনিভাবে পরিবারে যদি রোগ-ব্যাধি ও অন্যায়-অপরাধ প্রবেশ করে তাহলে সমাজে তা সংক্রমিত হবেই।

---

২৮৩. আল আওলামাহ বাইনা মনযুরীন, gwmK Av j eqvb সংখ্যা ১৪৫ মাহে রমযান, ১৪২০, পৃ. ১২৬

২৮৪. ড. সালেহ আর রাকাব, Av j -Av l j vgvn্, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

উল্লেখ্য যে, এখানে ইতিবাচক ভঙ্গিতে এভাবে বলা যেতে পারে, ব্যক্তি সৎ হলে পরিবার সৎ হবে এবং পরিবার সৎ হলে সমাজও সৎ ও সুশীল হবে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। মানব জীবনের জন্য এই তিনটি বস্তু অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা তথা বিশ্বায়ন আন্দোলন স্বীয় উদ্দেশ্যে তখনই পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করতে পারবে যখন মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার অনুপ্রবেশ ঘটবে। এজন্য সর্বপ্রথম বিশ্বায়ন রাজনীতিতে পা রাখে, তারপর অর্থনীতির রাস্তা ধরে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচারের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করে। তারপর এক পর্যায়ে সমাজের ওপর আগ্রাসন চালায়। এভাবেই সে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্বায়নের পর সামাজিক বিশ্বায়নের দিকে পা বাড়ায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই সামাজিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বে পশ্চিমা সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ ও বাস্তবায়ন করা এবং পশ্চিমা মূল্যবোধ ও পশ্চিমা চরিত্রের আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবতা এই যে, যখন সমাজের বিশ্বায়ন হয়ে যাবে তখন এর ফলশ্রুতিতে নৈতিকতার বিশ্বায়ন নিজে নিজেই হয়ে যাবে।

বিশ্বায়ন চায় নৈতিকতার পতন ও অবক্ষয়। এই যুগে সবচে' নিকৃষ্ট ও নীতি-নৈতিকতাহীন জাতির অপবিত্র নীতি-নৈতিকতা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে এবং জাতি যেন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি সৎ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, বরং জাতি যেন কোনো সমাজ বিনির্মাণের কষ্ট করতেও প্রস্তুত না হয়। কারণ তার সমাজ হবে পশ্চিমা দেশে বির্নির্মিত “ইম্পোর্টেড” সমাজ।[২৮৫] আসুন এবার আমরা দেখি বিশ্বায়ন সমাজকে কিভাবে বিশ্বকরণ করে? সে উপায়-উপকরণগুলো কী, যা দ্বারা সামাজিক বিশ্বায়ন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে?

৪. ১৩. সামাজিক বিশ্বায়নের মাধ্যম

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ব্যক্তি পরিবারের কেন্দ্রীয় উপাদান। আর পরিবার সমাজের বুনিয়াদ। এজন্য পশ্চিমারা চিন্তা-ভাবনা করল, সমাজ পরিবর্তনের জন্য পরিবারে প্রভাব ফেলা একান্ত প্রয়োজন। সমাজকে পশ্চিমাদের সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারকে সকল দ্বীনি, ধর্মীয়, নৈতিক ও দেশীয় সীমারেখা হতে মুক্ত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যের জন্য সে পরিবারের অংগ তথা ‘ব্যক্তি’র প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করল, ব্যক্তির মধ্যে পুরুষের মত নারীও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে সামাজিক বিশ্বায়নের বিনির্মাণে নারীর আশ্রয় নিল। তাকে ব্যবহার করে ‘পরিবার’ ও তার অধীনস্থ সকল চারিত্রিক ও নৈতিক

---

[285] বিশ্বজিৎ ঘোষ রায়, ‘বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ’, রতনধনু ঘোষ সম্পাদিতগ্রন্থ eûgwÎK wekvqb ২য় খণ্ড, (ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ১৯৯৯,) পৃ.২১৫

মূল্যবোধ পদদলিত করার প্রচেষ্টা করল। বিশ্বায়নের জন্য সবচে' বড় বিপদ ইসলাম। এজন 'নারীর সহায়তায় পশ্চিমাগোষ্ঠী ইসলামের ওপরেই সবচে' বেশি আঘাত হানতে শুরু করল। মুসলিম নারীকে এই ধারণা দেয়া হলো, সে ইসলামী সমাজে একজন মজলুম। তার বৈধ অধিকার সে পাচ্ছে না। ইসলাম নারীর ওপর পর্দার বিধান দিয়ে তাকে পুরুষের গোলাম ও দাসীতে পরিণত করেছে। ইসলামে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো সাম্য নেই। সুতরাং নারী জাতির উচিত পশ্চিমা সমাজের ক্রোড়ে চলে আসা, যে সমাজ ঐ সকল (তথাকথিত) অন্যায়-অপরাধ হতে মুক্ত নারীকে পুরুষের সমাজ মর্যাদা দান করে ইত্যাদি। পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকা অনেক বেশি। এজন্য ইসলামী সমাজের অস্তিত্বকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করার জন্য পশ্চিমাগোষ্ঠী নারীর মাধ্যমে স্বীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করল। তার অনুমান এভাবে করা যায়, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আল-জাযায়েরের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে ধর্মহীনতা ছড়িয়ে দিল। কিন্তু তারপরেও সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়নি। সুতরাং ফ্রান্স একজন সমাজবিদ-রোজিয়া মোবিনিয়া এর সহায়তা গ্রহণ করল। রোজিয়া মোবিনিয়া আল-জাযায়েরের শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে সেখানের সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষনের পর ফরাসী সরকারকে একটি রিপোর্টি পেশ করে। সেই রিপোর্টে তিনি বলেন, যদি তোমরা আল-জাযায়েরকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে তার জন্য নারীই হলো মোক্ষম অস্ত্র। সেখানের নারীরা ইসলামী মূল্যবোধের রক্ষক। যদি তোমরা তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে সফলকাম হও তাহলে মনে করো তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করে ফেলেছো।[২৮৬]

এই সমাজতত্ত্ববিদের উক্ত রিপোর্ট শুধু ফ্রান্সেরই সংবিধান হয়নি, বরং গোটা পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামে নির্মূল করার জন্য উক্ত রিপোর্ট নিজেদের কৌশল ও পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিল। সুতরাং নারীর হাতিয়ার দ্বারা ইসলামের ওপর আক্রমণ চালানো এবং ইসলামী সমাজের মজবুত প্রাচীর ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করলো। যেমন,

(ক) ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষ হতে নারীদের আঞ্চলিক, সোস্যাল ও সেক্যুলার সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, যার উদ্দেশ্য বস্তুগত উপকরণ ব্যবহার করে নারী সমাজকে পথ ভ্রষ্ট করা এবং সঠিক রাস্তা হতে তাদেরকে দূরে সরানো। সুতরাং পশ্চিমা জগৎ এ ধরনের নারীবাদী সংগঠনগুলোকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৪-এ কায়রোতে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন

---

286 আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRwZK m¤úK, ঢাকা: অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স, ২০১২ পৃ. ৬৪৯

অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মিসর, জর্ডান ও তিউনিসে নারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান তুলল, এদেরকে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের পক্ষ হতে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়া হলো।

ফিলিস্তিন হলো এমন একটি দেশ যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংসের শিকার, বেকারত্ব ব্যাপক, লোকদের নিকট খাবার কিছু নেই, যারা জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ, যাদের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণ বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় শুধু পশ্চিম তীর অঞ্চলের নারীবাদী সংগঠনগুলোকেই পশ্চিমাদের পক্ষ হতে বার্ষিক ৭০ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিল যা শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে দেয়া সাহায্যের দুইগুণ! ঐ অঞ্চলে ১৮০০ সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও অফিস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে নারীদের সক্রিয় সংগঠনের সংখ্যাই প্রায় ১২০০!

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মুসলিম ফিলিস্তিনের নারীবাদী সংগঠনগুলোকে পাশ্চাত্যে পক্ষ হতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নিশ্চিতভাবে এ কথাই প্রমাণ করে, পাশ্চাত্য সামাজিক বিশ্বায়নের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নারী সমাজকে বস্তুবাদের জালে আবদ্ধ করে সমাজ ও নারীদের ধ্বংস করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

আর এই প্রয়াসে তারা অনেকটা সফলকামও। সে মতে এই প্রচুর আর্থিক সহযোগিতার প্রভাব ১৯৯৫ সালে বেইজিং–এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে সম্মেলনে মুসলিম নারীদের বিরাট প্রতিনিধিত্ব ছিল। উক্ত সম্মেলনের সুপারিশমালা অধ্যয়ন করলে ভালভাবেই অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য জগত ও তাদের দোসররা মুসলিম দেশের সমাজব্যবস্থাকে কিভাবে বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।

কনফারেন্সের প্রস্তাবাবলির মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল, মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে তখন তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। পিতা-মাতা কিংবা অন্য কোনো অভিভাবকের তার স্বাধীন কর্মকাণ্ড থেকে তাকে বাধা দেয়ার বা বিরত রাখার অধিকার থাকবে না।

(খ) নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করার পশ্চিমাদের দ্বিতীয় কর্মকৌশল হলো মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং নারীদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি করানো। এই কৌশলের মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজ নারী জাতির ইজ্জত-সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোকে তাদের ঋণ মাফ করে দেয়ার লোভ দেখিয়ে এসব বিষয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে

এবং তাদের দেশে এ চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকারকারী দেশগুলোকে মানবাধিকার লংঘনকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। এ সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হবে।[২৮৭]

(গ) জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনসমূহ নারী সমাজকে ধ্বংস করার পশ্চিমাদের তৃতীয় কৌশল। এসব কনফারেন্সের একমাত্র উদ্দেশ্য মানব সমাজ, বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। ইসলামী দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলো অধ্যয়ন করলে জানা যায়, এসব সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য নারী জাতিকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে সরানো যে সমাজের বুনিয়াদ নারীর প্রকৃতি ও সতীত্ব, তার আভিজাত্য, পবিত্রতার ওপর। জাতিসংঘ নারী সমাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও দৃষ্টি দিয়েছে, সে নারী জাতির জন্য বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনও কায়েম করেছে, যার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে কনফারেন্স ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা এবং সামাজিক বিশ্বায়নের পথে সূচিত সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা। এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ বিভিন্ন পৃথক পৃথক কমিটি ও সংগঠন-সংস্থা কায়েম করেছে বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য।[২৮৮]

৪. ১৪. সামাজিক বিশ্বায়নের প্রভাব

সামাজিক বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে উন্নত ও অনুন্নত সকল দেশে অন্যায়-অপরাধের হার রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জার্মান লেখক হ্যানস পেটার মার্টিন ও হেরাল্ড সৌমিন স্বীয় গ্রন্থ লিখেন, অর্থনীতির উপর আরোপিত আইনী নিষেধাজ্ঞা দূর হয়ে যাওয়া দ্বারা অপরাধী গোষ্ঠীর সবচে' বেশি ফায়দা হয়েছে যাদের নেটওয়ার্ক কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে আছে। পুলিস ক্রাইম কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠানের নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সুসংগঠিত অপরাধের হার বিস্ময়কর সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুলিশ (ইন্টারপোল)-এর একজন অফিসার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যেসব বিষয়কে আজ আমরা মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থের অনুকূল মনে করি, সেসব বিষয়ই আজ অপরাধী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে চলে যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বায়নের এ ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক সেক্টরে ততটুকু প্রবৃদ্ধি ঘটেনি যতটুকু সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও অপরাধের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। স্মাগলিং-এর সাথে জড়িত গোষ্ঠী প্রতি বছর

---

২৮৭. ড. সালেহ আর রাকাব, A⁄j-A⁄l j⁄g⁄n, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৮৮. ড. সালেহ আর রাকাব, A⁄j-A⁄l j⁄g⁄n, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫০০ মিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে, অথচ তারা সবচে' বেশি দু'টি জিনিসেরই লেনদেন করে তা হলো হিরোইন ও কোকেন। এক সমীক্ষা মতে শুধু ২০১৫ সালে সন্ত্রাসীরা যতটুকু হিরোইন চোরাচালান করেছে বিগত দীর্ঘ ২০ বছরেও ততটুকু হিরোইন চোরাচালান হয়নি। কোকেনের ব্যবসাতেও ৫০ গুণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।[২৮৯]

প্রকাশ থাকে, এই বিপুল পরিমাণ হিরোইন ও কোকেন এমন সমাজেই ব্যবহৃত হয়, যে সমাজের মানুষ নাইট ক্লাবে যাওয়া এবং মদ ও নেশাকেই উন্নত জীবন মনে করে। ইউরোপ ও মার্কিন সমাজে মাদক ও নেশা দ্রব্য অর্জন করা কোনোই কঠিন নয়। অতঃপর স্কুল-কলেজে পড়ুয়া নতুন প্রজন্মের জন্য তো কেমন যেন শুধু নেশাযুক্ত বস্তুর চাহিদাই যথেষ্ট! এসব কিছু তাদের চোখের সামনেই সব সময় বিদ্যমান থাকে। এ কারণেই নতুন প্রজন্মের নিকট নেশাযুক্ত ড্রাগস-এর ব্যবহার লজ্জা-শরমের কারণ হওয়ার পরিবর্তে সাধারণ জিন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ও বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে যখন এই জাতি ঘর থেকে বের হয় তখন পশুত্ব ও মানবতার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়! সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়, সভ্যতা ও ভদ্রতাশূণ্য ঐ সমস্ত লোককে মানবরূপী পশু বলা হবে না পশুরূপী মানব বলা হবে?

সুসংগঠিত অপরাধও পশ্চিমা সমাজের একটি ধর্ম। যদিও অন্যায়-অপরাধ ও সন্ত্রাস হতে বিশ্বের কোনো ভূ-খণ্ডই মুক্ত নেই, কিন্তু সভ্যতার দুর্গ দাবীদার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ একটি মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। মার্কিন প্রদেশ ক্যালিফোর্নিয়া (যে নিজেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষেত্রে সপ্তম নম্বরে) সেখানে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বাজেটের চেয়ে বেশি বন্দী-কয়েদীদের ওপরে ব্যয় হয়। ২৮ মিলিয়ন মার্কিন নাগরিক (অর্থাৎ জনসংখ্যার এক-দশমাংশ) নিজেদেরকে অত্যন্ত সুদর্শন ও সুরম্য অট্টালিকা ও অঞ্চলে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এ কারণেই মার্কিন সরকার পুলিশের ওপর বার্ষিক যতটুকু ব্যয় করে তার চেয়ে দ্বিগুণ মার্কিন নাগরিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের সশস্ত্র গার্ডের ওপর ব্যয় করে।

শুধু ২০১৪-সালে গোটা আমেরিকায় ৫ মিলিয়নের বেশি অপরাধ সংগঠিত হয়। অতঃপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার গতির ফলে আরো দশ গুণ বেশি দ্রুততার সাথে ভয়াবহ অপরাধ বৃদ্ধি হতে থাকে অর্থাৎ প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশ, আর ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার ১৮৭ শতাংশ। অতএব, অবস্থা এত শোচনীয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১২ সেকেণ্ডে একটি ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রতি ঘন্টায় একটি হত্যা হয়। প্রতি ২৫ মিনিটে কাউকে ধর্ষণ করা হয়। অথচ মার্কিন সমাজে যৌন কর্মকাণ্ডকে কোনো

[289] ড.আবুল বারাকাত, 'বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশ', evsjv‡'k A_bxwZ mwgwZ mvgwqKx 2004, (ঢাকাঃ ডিসেম্বর ২০০৪,) পৃ ৪৮৩

দূষণীয় মনে করা হয় না। মার্কিন সমাজে এই ব্যাপক মহামারীর ফলাফল, এ সমাজে সে ব্যক্তির উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে বিবাহ ছাড়া অবৈধ কোনো যৌন সম্পর্ক কায়েম করেনি। প্রতি ৫ মিনিটে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি মিনিটে ন্যূনতম একটি গাড়ী চুরি হয়।[২৯০]

এই জরীপ ২০১৪-এর। যে দ্রুততার সাথে মার্কিন সমাজে অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ২০১৪-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ২ বছরে আমেরিকায় সংঘটিত অপরাধের রেকর্ড রাখাও সম্ভবত অসম্ভব হয়ে পড়েছে! কারণ এ ধরনের এমন অসংখ্য অপরাধ রয়েছে যেগুলো পুলিশের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ নেই। তবে একথাও অস্বীকার করি না, উন্নয়নশীল দেশ যেমন ভারত-পাকিস্তানে এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর নয়। কারণ পুলিশ ও সিকিউরিটি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকার স্বীয় জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম, বরং উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোও বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ অপরাধে জড়িত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিজেকে সভ্য দেশ দাবি করে, যেখানের নাগরিক স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে উন্নতির মাপকাঠি দাবি করতে দ্বিধা করে না। আর টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের বিস্ময়কর উন্নতি দেখে তাদের দাবি খণ্ডন করাও যায় না। এরকম দেশে এত বিপুল আকারে অপরাধ সংঘটিত হওয়া শুধু বিস্ময়ের কারণই নয়, বরং সে সব দাবির পুল খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যে সব দাবি তারা রাত-দিন করে বেড়ায়। এসব অপরাধের কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে জানা যায়, হলিউডের চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই গোটা মার্কিন সমাজ অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। সে সব চলচ্চিত্র দেখে নতুন প্রজন্ম অপরাধ ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ কারণেই নিক্সন হলিউডের ওপর অভিযোগ করেছিলেন, অশ্লীল, নগ্ন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক এবং ভয়াবহ অপরাধ বিস্তারকারী ফিল্ম তৈরি করে মার্কিন সমাজকে ধ্বংস করে দেয়ার কারণে। আরেকজন সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন হলিউডের চার শত চলচ্চিত্র নির্মাতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে তাদের কাছে মার্কিন সমাজের ওপর দয়া করার আবেদন করেছিলেন এবং তাদের নিকট অশ্লীল-নগ্ন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবির প্রোডাক্ট থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এমনিভাবে সামাজিক বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাধুনিক উন্নতি-প্রগতি ও যান্ত্রিক জীবনের কারণে অগণিত মানুষ বেকার হয়ে গেছে। কারণ তাদের স্থান নতুন আবিষ্কৃত মেশিনগুলো দখল করে নিয়েছে। এক সমীক্ষা মতে যদি পরিস্থিতি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে

---

২৯০. ড. আলী ইজ্জত, Avj-Bmjvg evBbvk-kviK Iqvj Mvie, বৈরুত: তুরাসুল আরাবিয়া আল ইসলাম, তাবি, পৃ. ১১৭

সমাজের মাত্র এক অংশ কাজের যোগ্য থাকবে আর বাকী অংশ বেকারত্বের জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। সাম্প্রতিক জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্বায়ন যেমনিভাবে অনেক দেশ ও সেখানের জনগণকে উপকার করেছে, তেমনিভাবে তার কারণে অনেক দেশে দারিদ্র ও বেকারত্বের শতাংশের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজ করার সুযোগ-সুবিধা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এমন সংস্থাও হ্রাস পাচ্ছে যারা দরিদ্রের সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা করবে।[২৯১]

এটাই হলো পাশ্চাত্য সমাজের একটি খুব সাধারণ চিত্র যার বিশ্বায়নের জন্য আজ পাশ্চাত্যের শয়তানী মস্তিষ্ক বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, বরং প্রত্যেকে এমন কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে-যার মাধ্যমে অন্য জাতির সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। এর জন্য তারা মৌলিকভাবে নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং সমঅধিকারের সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের পবিত্রতা, কোমলতা ও সতীত্বের ওপর হামলা চালিয়েছে। নারী পরিবারের একটি মৌলিক উপাদান। যখন তার ওপর আক্রমণ হবে তখন অবশ্যই পরিবার প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারবে না। আর পরিবার প্রভাবিত হলে সমাজ প্রভাবিত হওয়া অনিবার্য। অতঃপর যেহেতু প্রতিটি নষ্ট সমাজকেই পশ্চিমা সমাজ বলা হয়, এজন্য সামাজিক বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে বেশি সময় লাগার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি মুসলিম উম্মাহ আবার জেগে ওঠে, স্থবিরতা ও গাফলতির চাদর দূরে নিক্ষেপ করে, নিজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে, নিজের ধর্মকে আদর্শ ও আইডিয়াল মনে করে, তার বিশ্বজনীন পয়গামকে স্বয়ং নিজে গ্রহণ করতঃ তা ব্যাপক করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালায় এবং পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের সামনে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং এই প্লাবন ও সয়লাবের ধ্বংসকারী অবক্ষয়ের ওপর বাঁধ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

---

291 ড.আবুল বারাকাত, 'বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশ', পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: বিশ্বায়ন ও তৃতীয় বিশ্বের নতুন সংজ্ঞায়ন

বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ঔপনিবেশিকতাভিত্তিক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। এটি ঘটে একটি আস্ত ব্যবস্থার বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে। তা সত্ত্বেও একে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ঘোষণা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার (New World Order) প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্বভাবতই এ প্রয়োজন পুরনের জন্য বহুবিধ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এতে সমকালীনতার ভূমিকাকে ক্রমাগত মূল্যহীন করে দিয়ে উন্নতবিশ্বের স্বার্থ ও ক্ষমতার অনুকূল এক নতুন বিশ্বব্যবস্থাক্রমের সূচনা করা হয়। নয়া-উদারীকৃত বিশ্বসমাজে এ মেরুকরণের প্রভাবে একদিকে যেমন সমাজক্ষেত্রে সার্বিক প্রস্তুতির প্রভাব চোখে পড়ল অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থানটাই বদলে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বদলে ভৌগোলিক আরেক সীমা-বিভাজন অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে রূপান্তরিত হল। আবার পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং প্রান্তবর্তিতা পর্বের এমন সূচনা ঘটল যা পরোক্ষ উন্নত দেশগুলোর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতন্ত্রের কোমর ভেঙ্গে দিল। পুঁজিবাদী কেন্দ্রের নামাঙ্কিত এক উত্তর-পুঁজিবাদী সন্ধিক্ষণের সূচনা ঘটল যেখানে 'মহাজাগতিক অন্ধকার গহবরের' মতো সমস্ত চিরাচরিত তত্ত্ব এবং তত্ত্ববিশ্লেষণকে যুগসন্ধিক্ষণের কৃষ্ণগহ্বর শুষে নিতে লাগল।[২৯২] সারা পৃথিবী জোড়া এই অন্ধকারের চোরা স্রোত বর্তমানে এককথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বিশ্বের সমাজব্যবস্থাগুলোকে। ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে সামাজিক পরিচয়, পোশাক-আশাক, ভাষা, স্বপ্ন, চেনা-জানা পরিবেশ, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এমনকি প্রাচুর্য এবং অভাবের যাবতীয় চিরাচরিত বৈপরিত্য পর্যন্ত।

এর সাথে সাথে আর অনেক এবং অল্পের এই ফারাক বাড়তে বাড়তে মানুষের চিন্তা-চেতনার বাইরে চলে যাওয়ায় শ্রেণি সংগ্রামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে এই সময়ে। ফলত তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃত সংজ্ঞাগত অবস্থান পুনরাবিষ্কারের পথে বিস্তর নতুন গজিয়ে ওঠা উপপথ, শাখাপথের মধ্যে দিয়ে হাঁটতেই হবে কারণ বেশিরভাগ পুরনো ব্যাখ্যা-পথগুলো বুঝিয়ে নতুন রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে বিশ্বায়নের প্রোমোটাররা। আর তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলোকে ধরে ধরে এক অদ্ভূত খাঁচার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, যাতে এতটুকু স্বাধীন নড়াচড়া না করতে পারে। এতে মানুষ পেয়েছে সংগ্রামহীন এক নিরাপদ জীবন, যাতে তার একান্ত

---

292 নীলোৎপল বসু, 'ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব', অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত wekvqb fvebv-' fvebv wØZxq LÐ, পূর্বোক্ত পৃ.৩৫৪

অপেক্ষা মৃত্যুর, সে মৃত্যু দুর্ঘটনায় হোক, জরায় হোক, হতাশায় হোক কিংবা বিপদেই হোক, সব মৃত্যুকেই সে স্বাভাবিক এবং বিধিসম্মত হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভোগবাদ ছাড়া আর কোনো জৈব উপাদানের পথ খোলা থাকল না। এ কাজে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হল গণমাধ্যমের বিশ্বজোড়া বিজ্ঞাপন ক্ষমতাকে, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থে। ফলে একদিকে কর্পোরেট বিশ্বায়ন, অন্যদিকে গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন কর্মসূচি একেবারে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ শুরু করল।

সামাজতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড এস. হারমানের বিশ্লেষণ এখানে দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক ঃ "It is the commercial media that play the central role in this process. The development of a global commercial media system that tends to regard corporate domination as natural and benevolent was and is the logical out-growth of the 'free market' communication policies that have come to dominate globally in the 1980s and 1990s. The global media are the missionaries of our age, promoting the virtues of commercialism and the market loudly and incessantly through their profit driven and advertising supported enterprises and programming." [293]

ফলে একদিকে সোভিয়েত উত্তর কালে বিশ্বজোড়া একমেরুকরণ, তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এক অদ্ভূত নয়া-উদারীকৃত বাজারিকরণ প্রক্রিয়া যা পুরনো ধনতন্ত্রকেই ক্রমশ মূল্যহীন করে তুলেছে অন্যদিকে এরই প্রভাবাশ্রিত কর্পোরেট বিশ্বায়ন এবং দেশীয় সীমারেখার উর্ধ্বে আর্থিক উদারীকরণ প্রক্রিয়া গণমাধ্যমের প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বায়নকে হাতিয়ার করে প্রধানত তৃতীয় বিশ্বকেই এক উত্তর-তাত্ত্বিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেশীয় সীমা এবং সার্বভৌমত্বকেই বিলোপ করে দিতে উদ্যত হয়েছে। বলা যায়, ইতোমধ্যে এর কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃত সংজ্ঞায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট

---

[293] Edward S. Harman, *The Threde of Globalization,* (from new Politics, vol. 7 no. 2, new series, whole no. 26, winter 1999), p.743

সমকালীনতার নিরিখে না ভেবে অনিবার্যভাবে প্রতিবাদী তত্ত্বভিত্তিক করতে হবে। এর বিকল্পের নাম হঠকারিতা।[২৯৪]

ফরাসি অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড সভির হাত ধরে ১৯৫২ সাল থেকে তৃতীয় বিশ্বের যে সংজ্ঞা বা পরিসীমা প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত বা প্রচলিত হয়েছিল, তাতে প্রথম বিশ্বে ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত এবং সামরিক শক্তিধর দেশগুলো, আর দ্বিতীয় বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবস্থান নির্ধারিত হবার পর, নিশ্চিতভাবে অনুন্নত, গরীব, পশ্চাৎপদ প্রভৃতি বিশ্লেষণযুক্ত পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের নাম তৃতীয় বিশ্ব। প্রথিতযশা দার্শনিক পল সার্ত্র তৃতীয় বিশ্বকে 'Banner of hungry and oppressed' বলেছেন।

আলফ্রেড সভি লক্ষ্য করেছেন যে, তৃতীয় বিশ্ব হল সেই দেশগুলো যাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব সর্বদা দমন করতে উদগ্রীব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই তৃতীয় বিশ্বের এই পৃথক অবস্থান সম্পর্কে একদিকে যেমন সার্বিকভাবে সমাজ-রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অভাবজনিত প্রবণতার ঠান্ডাস্রোত বহমান ছিল, তেমনই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বরূপ চেনার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবিশেষে এক তীব্র অনীহা যা তৃতীয় বিশ্ব নামক পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক বিশ্বকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবদমিত করে রেখেছিল। এই পর্বের সূচনা ঘটেছিল তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নামে নতুন গোষ্ঠীসম্পর্কের জন্মের মধ্যদিয়ে। এই জোটের নিরপেক্ষতা দাঁড়িয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী কোনো এক পৃথক অবস্থানে। শুধু তাই নয়, ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত প্রথম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক চীনকেও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। জোটবদ্ধ দেশগুলোর নিরপেক্ষতার এমন অদ্ভূত ভিত্তি কোনোদিনই তৃতীয় বিশ্বকে প্রকৃত নিরপেক্ষতার শক্তিশালী বাস্তব ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াতে দেয়নি, ফলত ক্ষুধার্ত, পীড়িতদের এই তৃতীয় বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যর্থ হয়েছিল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে নিজেদের আরও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মনে রাখা দরকার এই ইন্দোনেশিয়াতেই স্বৈরাচারী সুহার্তো সরকারের আমলে মার্কিন বাহিনীর হাতে নিহত লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু কিংবা সত্তরের দশকের প্রারম্ভেই মেক্সিকোতে অভাবনীয় দমনপীড়ন। আবার এই এশিয়া, লাতিন আমেরিকার মাটিতেই বিশ্বায়নের প্রবল অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী

294. Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization*, (Delhi: Maddhom Books & London-New York: Zed Books, 2000,) p.2-3

আক্রমণ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সূচনার পর অর্ধশতক সময়ের মধ্যে গোটা তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক অস্তিত্বকেই নব-দাসপ্রথার চিরকালীন অন্ধকারে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে।

যাই হোক চীন এবং জাপান বাদে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলো চিহ্নিত হয় তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে। তবে জাতিসংঘে পরবর্তীকালে অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ বিশেষণের বদলে Peripheral Countries বা প্রান্তবর্তী দেশসমূহ হিসেবে ঘোষণা হয়েছে।[২৯৫]

সাংবাদিক অ্যাশ নারায়ন রায় লিখেছেন, nitially the term third world was rejected by the west (because it suggested that some countries were poor as a result of some other countries exploiting them to become rich) and the East (because it implied a non-socialist alternatives to capitalism).[296]

পরবর্তীকালে জাতিসংঘ উন্নতিশীল দেশসমূহ বা developing countries হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের পরিচিতির নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'উন্নতিশীল' এই বিশেষণটি যারপরনাই স্বীকৃতি লাভ করলেও 'তৃতীয় বিশ্ব', বা 'দরিদ্র জাতিরাষ্ট্রসমূহ', 'অনুন্নত বিশ্ব' পরিচয়ও ঝেড়ে ফেলা যায়নি। যদিও এই অধ্যায়ে পৃথিবীকে আবার উত্তর এবং দক্ষিণে ভাগ করাটা 'উন্নতিশীল' বিশেষণের মতো সকলের মনঃপুত হয়েছে। যদিও উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীর এমনতরো বিভাজন তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের চেহারাটাই বদলে দিয়েছে। এই মত অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানে 'উত্তরে' এবং বাকি অনুন্নত দেশগুলো পৃথিবীর 'দক্ষিণ' ভাগে। এতে অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষ তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রায় বিনা উন্নতিতেই প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে এক পঙক্তিতে পাত পাড়বার সুযোগ পেয়েছে। ফলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা মঞ্চ থেকে তৃতীয় বিশ্বের জন্ম হয়েছিল।

অবশ্য ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে এর প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাওয়া কখনই যায়নি, হয়তো পাওয়ার কথাও ছিল না। কারণ গোটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব গর্জন করে উঠেছিল 'শুধু ইতিহাসই নয়, সার্বিকভাবে 'ism' বা মতাদর্শের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। অথচ সামগ্রিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে কোনো আদর্শের লড়াই তৈরিই হয়নি। ক্ষুধার্ত, অনাহারক্লিষ্ট, দরিদ্র, অত্যাচারিত মানুষগুলোকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তৃতীয় বিশ্ব, যার জোট নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ তথাকথিত নিরপেক্ষতার নামে দেশগুলোকে

---

[295] নীলোৎপল বসু, 'ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব', পূর্বোক্ত পৃ.৩৫৪

[296] Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization,* ibid, p.7

মার্কিনিদের হাতেই তুলে দিলেন। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টিন এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, বিশ্ব অর্থনীতির একটিই মাত্র পর্যায় আছে এবং সেটা হল 'পুঁজিবাদ'। বিশ্ব অর্থনীতিকে তিনি তিনটি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করেন ঃ এক, Capitalist core বা পুঁজিবাদী কেন্দ্র, capitalist periphery বা পুঁজিবাদী প্রান্তবর্তী এবং বাকিটা হল পুঁজিবাদী আংশিক প্রান্তবর্তী। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ সামির আমিন অবশ্য পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং প্রান্তের অব্যবহিত পরবর্তী নয়-পুঁজিবাদী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও প্রত্যক্ষ করেছেন।[২৯৭]

এখন প্রশ্ন হল জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন থেকে বা তার কিছু আগে থেকেই, উদ্ভূত তৃতীয় বিশ্বের তৎকালীন অবস্থান থেকে অনুন্নত বিশ্ব, দক্ষিণ বিশ্ব এবং সবশেষে পুঁজিবাদী প্রান্তবর্তী বিশ্ব পর্যন্ত জাঁ পল সার্ত্র অভিহিত ক্ষুধার্ত এবং নিপীড়িত জনগণের অবস্থানের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছে কি? প্রযুক্তি বিপ্লবের পর্যায়ক্রমিক ধারায় সিঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে তথাকথিত তৃতীয় বা দক্ষিণ বা প্রান্তবর্তী বিশ্বের মানুষের প্রকৃত লাভের পরিমাণ কতটুকু? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে প্রকৃতপক্ষে এক মেরুকরণের মতো কয়েকটি দেশে জমা ক্রমবর্ধমান সমস্যার পাহাড় সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে একতরফা বাণিজ্যের নামে এক প্রকার লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে সৃষ্টি এই একচেটিয়া প্রক্রিয়া অস্বীকার করা যায় কি? ফলে তৃতীয় বিশ্ব সম্বন্ধীয় এই ভাবনাচিন্তার বিবর্তন তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জীবন-সংগ্রাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ভাবধারার বিবর্তনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সাযুজ্য কখনোই স্থাপন করতে পারেনি। তার ফলে এই দেশগুলোর নিজভূমে উন্নতির যাবতীয় সম্ভাবনার মূলে একমাত্র প্রয়োজনীয় 'সার্বভৌমত্ব' জন্মলগ্নেই বিসর্জিত হয়েছিল পরিকল্পনার হঠকারিতার জন্য। এই অবস্থায় এশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় চীনের সরাসরি উত্থান এবং সেভিয়েত ভেঙ্গে যাওয়ার প্রত্যক্ষ ফল গোটা বিশ্বজুড়ে একদিকে যেমন নয়া একমেরুকরণ পরিস্থিতির সূচনা করল যাকে ইতোমধ্যেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অন্যদিকে এক নয়া ঔপনিবেশিকতার সূচনা করল।

অ্যাশ নারায়ন রায় অত্যন্ত সুচারু বিশ্লেষণের দ্বারা এই নয়া-অবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন, "The global change in the post cold war world has created an anomalous situation for the third world countries. While bi-polar structure is dead, the emerging unipolar world is fraught with dangers of a return to the old dominance of the powerful over the weak. One analyst goes to the extent maintaining

---

[297] নীলোৎপল বসু, 'ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব', পূর্বোক্ত পৃ.৩৫৯

that the third world countries could now be subjected to a phase of recolourization, now that the world seems to be ruled by one superpower backed by allies... the fact remains that whether it is international trade or technology transfer, the dice is loaded against the third world. They are confronted by a paradox of an increasing globalization of the world economy, together with wide chasm that persists between the north and the south. The post cold war world is still a world of transition.[298]

শুধু তাই নয়, প্রাক ঠাণ্ডা লড়াই থেকে ঠাণ্ডা লড়াই-উত্তর পর্ব পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের সাংগঠনিক জোট, পরস্পর অর্থনৈতিক যোগসূত্র বা বোঝাপড়ার পারস্পর্য, অভ্যন্তরীণ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথাগত সাংস্কৃতিক বৈচিত্রসমূহের উর্ধ্বে একটি সার্বিক সমতারক্ষার নিরন্তর প্রয়াস প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দারুণরকম ব্যর্থতা ইতোমধ্যে চাগিয়ে ওঠা বিশ্বায়ন পর্বে গোটা তৃতীয় বিশ্বকেই একেবারে নড়বড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যার অভিমুখ ছিল অনিবার্য উত্তর ঊপনিবেশিক দাসত্বের দিকে যেখানে তথ্যবিপ্লব নতুন করে সংকট তেরি করল। এখন প্রশ্ন হল এই সংকটের প্রকৃত মাত্রাটি কি? এই সন্ধিক্ষণেরই বা প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলো পুঁজির পুনর্বিনিয়োগের অর্থনৈতিক পথ সন্ধানের প্রশ্নে নিদারুন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ঠাণ্ডা লড়াই পর্বেই। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পগুলো সহ অন্যান্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি স্তরে পাহাড় প্রমাণ পুঁজি এক অস্বাভাবিক গতিহীনতার পর্যায়ে এই দেশগুলোকে মরিয়া হয়ে বিশ্বের অন্যত্র বাজার সহ অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন করে প্রভুত্ব বিস্তারের পথে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করল। এই সুযোগে Transnational Corporation গুলো শুধু নতুন বাজারের সন্ধানই নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ দখলের লড়াইতে নেমে পড়ল। যে এশিয়ার বাজার এতকাল অচ্ছুত ছিল আজ সেখানেই নতুন বাজার উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দিল।

কেনিচি ওমের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য “Today nearly 10% U.S. fund is invested in Asia. Ten years ago, that degree of participation in Asian markets would have been unthinkable.... As corporations more, of course, they bring with

[298] Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization*, ibid, p.19

them working capital. Perhaps more important, they transfer technology and managerial know-how. These are not consensus to host governments; they are the essential raw materials these companies need to do their work."[299] আবার অ্যাশ নারায়ন রায় লাতিন আমেরিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, "The significant dependence on foreign capital and assistance to fuel economic growth in the developing countries, especially the least developed countries, and the diminishing not inflow of funds from developed countries to most developing countries have intensified the need for greater South-South cooperation."[300]

তাহলে একদিকে এশিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন বাজার দখলের লড়াইয়ে যথেচ্ছ অর্থ বিনিয়োগ মূলত মার্কিন নেতৃত্বাধীন শিল্পোন্নত বিশ্বের উন্নত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে, অন্যদিকে অনুন্নত, দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের উন্নত বিশ্বের প্রতি নির্ভরতা এবং পক্ষান্তরে উন্নত বিশ্বের ক্রমাগত উপেক্ষা স্বভাবতই দেশগুলোর সার্বভৌমত্বই বিপন্ন করে তুলেছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জে. এইচ. ডানিং (১৯৮১) তাঁর "International Production and the Multinational Enterprise" গ্রন্থে এই মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর চরিত্রের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "The distinctive nature of the TNC, which differentiates it from a purely national enterprise. Unlike the multilocation domestic enterprise, the TNC owns income generating assets in different nation-states (that is, it engages in international production) unlike the national firm that exports all or parts of its products, much of the TNC's trade takes place within the corporation, rather than between independent economic agents, unlike the national firm that exports part of its inputs (materia or

[299] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, (New York: Harper Leans Publishers, 2002,) p.30

[300] Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization*, ibid, p.22

human capital), the TNC supplies such inputs as part of `package', and maintains control over the use that is made of them."[301]

ফলত এটা আজ স্পষ্ট যে কিভাবে এই মহাজাতিক শিল্পকর্পোরেশনগুলো জাতিরাষ্ট্র তথা উন্নয়নশীল দেশীয় অর্থব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের মালিকানাধীন করে একদিকে যেমন সার্বভৌমত্ব সমূলে বিনাশ করছে, অন্যদিকে গোটা তৃতীয় বিশ্বটাকেই পদানত করে চলেছে। তাই কথা উঠছে যে, "Third worldism has to rebrand itself or die." কিভাবে এই Rebranding বা নয়া-আত্মপ্রকাশ ঘটবে? কারণ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ঘিরে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার কেন্দ্রিক যে নয়া আঞ্চলিকীকরণ বা Regionalisation ঘটেছে তাতে কোনো একটি দেশ নয় তৃতীয়বিশ্বের সার্বিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

কেনিচি ওমের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্যঃ "On old economic maps, the most important cartograpic facts had to do with things like the location of raw material deposits, energy sources, navigable rivers, deepwater ports, railroad lines, paved roads__ and national borders. On today's maps by contrast, the most salient facts are the foot prints cast by TV satellites, the areas covered by radio -signals, and the geographic reach of newspapers and magazines.... Physical terrain and political boundaries still matter of course, but neither—and the geographic boundaries still matter of course, but neither—especially not political boundaries—matter as much as what people know or want or value."[302] অর্থাৎ দেশীয় সীমার বহু উর্ধ্বে আজকের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া মূলত শিল্পোন্নত বিশ্বের শিল্প-বিহারের প্রস্তুতিকল্পে গোটা পৃথিবীসহ তৃতীয় বিশ্বের অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে চরম জুয়াখেলায় মেতে উঠেছে।

---

[301] J H Daning, *International Production and the Multinational Enterprise, (*London: MacMillan & Co, 1981,) p.21

[302] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.37

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শিল্পোন্নত বিশ্বের আধিপত্যের প্রকৃত রূপরেখা নিরূপণ করতে গেলে তৃতীয় বিশ্বের উপরোক্ত অবস্থানগত বিবর্তনের ক্রমবিশ্লেষণের পাশাপাশি বিশ্বায়ন পর্বের বর্তমান গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন, যদিও তার গতিপ্রকৃতির সূচনা পর্বের চিত্রটা আমরা এই অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই তৈরির চেষ্টা করেছি।

সমাজতত্ত্ববিদ সামির আমিন বলেছেন, "Actually the existing globalization is like an archipelago bathed in an ocean. The density of distribution of the islands of that archipelago varies: it is higher in the central areas where the transnational's are concentrated, average in the peripheries more advanced in modern industrialization, and very low in the peripheries of the fourth world."[303]

বিশ্বায়নের এহেন ব্যাখ্যা ধরে এগিয়ে গেলে কিছু দূরেই এর সত্যতা মিলবে যেখানে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর জাতীয় ভৌগোলিক সীমা অভ্যন্তরে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে কোথাও এই মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলো ভিড় করেছে, যে স্থানে ঐ বিশেষ দেশগুলোর কোনো গণতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চলে না; আবার কোথাও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সরাসরি অভ্যন্তরীণ জাতীয় বাজার দখলের তীব্র লড়াইয়ে নেমে পড়েছে মূলত দেশীয় শিল্পগুলোর সঙ্গে, আর বাকি অংশের পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে না', এমন করে বর্জন করেছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সম্পূর্ণ বাজারিকরণ প্রক্রিয়া চলেছে, অন্যদিকে এই বাজারিকরণের সুবাদে মহাসাগরের ঐ দ্বীপপুঞ্জের মতো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বে আঞ্চলিক বা স্বশাসিত প্রশাসন গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। এই প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং বাকি প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রেও এর সূচনা হয়েছে।[৩০৪] এই পুঁজিবাদী কেন্দ্রের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একদিকে যেমন জাতীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বে বিশ্বপুঁজির বিধিনিষেধহীন গন্তব্যস্থল, তেমনি প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রগুলোতে জমে থাকা অতিরিক্ত শ্রম অব্যবহার্যে উৎপাদনশীলতার তলানিতে পৌঁছে গেছে এবং যাকে আধুনিক শিল্পায়ন প্রকল্পে পুনর্ব্যবহার্য করে তোলার জন্য কোনো

303 Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, (London 2003,) p.10-11

304 নীলোৎপল বসু, 'ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব', পূর্বোক্ত পৃ.৩৫৫

অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রায় অসম্ভব। এর পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আয়ের বণ্টনে তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান অসমতা এই আধুনিক বা পরাআধুনিক পুঁজিবাদীকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় অবস্থা চরমে উঠেছে। ফলত এই পুঁজিবাদী কেন্দ্র ব্যতীত প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রের অব্যবহার্য শ্রম চিরকালই অব্যবহৃত থেকে যাবে এবং এই পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর অনন্ত বৈভবের পাশে যাবতীয় দারিদ্র্যসূচক প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাবে এই প্রান্তিকের দল।[৩০৫]

সামির আমিন এ প্রসঙ্গে সার্বিক তৃতীয় বিশ্ব বা চতুর্থ বিশ্বে একতার লড়াইয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। পাশাপাশি একথাও ভুললে চলবে না যে বিশ্বায়নপূর্ব সমাজের একদিকে যেমন শোষণ ছিল, শ্রেণি বৈষম্য ছিল, শ্রেণি অসন্তোষ ছিল তেমনি শ্রেণি সংগ্রামও ছিল। কিন্তু বিশ্বায়ন পর্বে শ্রেণি সংগ্রামের বিশেষ কোনো সুযোগই সৃষ্টি হয়নি বরং পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং প্রান্তিকের মাঝে সমাজ, সভ্যতা, পুঁজি, অযাচিত বিশ্বায়নবোধ, জৈব-সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং তথ্যবিশ্বায়নে উত্তর আধুনিকতা পড়াবৃত্ত বহুস্তরীয় পাঁচিল তুলে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই। যদিও সামির আমিন এ প্রসঙ্গে অনেকটা আশাবাদী হয়ে এই বিশ্বজোড়া দেশীয় সীমার ঊর্ধ্বে এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সন্ধান ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন, তবু দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় এই সম্ভাবনার গতি প্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়।

আবার লাতিন আমেরিকার প্রান্তিক দেশ বা অঞ্চলগুলো এ ব্যাপারে মতাদর্শগত ঐক্য দেখাতে পারছে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রাথমিক পথ ধরে। তবু তৃতীয় বিশ্বের বুকে এই চিত্রটা নেহাতই অপরিণত কারণ এখানে অত্যাধুনিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া একমাত্র চাহিদা নয়, কারণ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের আস্তিনের নীচে সভ্যতা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, বিজ্ঞান পড়াবৃত্তের মধ্যে এলিট এবং সাধারণ ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি পৃথক তাস লুকিয়ে রয়েছে তাই নয়, ইতোমধ্যে খেলেও ফেলেছে, তাকে প্রতিহত করার প্রয়োজন এখানে সর্বাগ্রে। কারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণ সার্বিকভাবে পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রে সার্বিক পণ্যায়ন বা commodification এবং বেসরকারিকরণ বা privatization ঘটাচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেনশন তহবিল, বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা, মেধাভিত্তিক, শিল্পভিত্তিক সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই।

---

305. Edward S. Harman, *The Threde of Globalization,* ibid, p.743

সামির আমিনের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ "We have now reached a stage of advanced polarization, to the point where the majority of the world population has become superfluous to the needs of capital."[306] অর্থাৎ বিশ্ববাজারের অধিষ্ঠাত্রী পুঁজির প্রয়োজনে যত মানুষের থাকার প্রয়োজন আছে, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই তার অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছেন।

পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং তার প্রান্ত আজ এক বিশ্বব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংজ্ঞায়ন আজ পুঁজিবাদী কেন্দ্রের পরিচয়েই নিরূপিত হয়েছে। সামির আমিনের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র একটি উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে মূলত সামাজিক শ্রম উৎপাদনবাজার, পুঁজির বাজার, এবং শ্রমবাজার এই তিনটি পর্যায়ের উপর নির্ভর করে। সেখানে পুঁজির যে অসম সঞ্চয় আমরা বিশ্বজুড়ে প্রত্যক্ষ করেছি এবং পুঁজির লাভজনক পুনর্ব্যবহার বা লাভজনক উৎপাদন স্বার্থের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশেই উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরটুকুর পদচিহ্নও যেখানে পড়েনি, সেখানে জাতীয় বাজারের কৌলিন্য এবং জাতীয় ভৌগোলিক সীমার সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং অন্যান্য সঞ্চয় ক্ষেত্রে বিপুল পুঁজির সম্ভার সৃষ্টি করেছে। এটাই ছিল ধনতন্ত্রের প্রকৃত দেশীয় চেহারা। বিশ্বক্ষেত্রে এর সঙ্গে শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রূপরেখো নিরূপণ করলেই হত। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দীর্ঘ সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পুঁজি আর সামরিক শক্তির প্রভাবে একেবারে একপেশে চেহারা নিয়েছে এবং আামেরিকাসহ উন্নত দেশগুলোর পুঁজিভাণ্ডার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এই ক্রমবর্ধমান পুঁজির ক্রমবর্ধমান অব্যবহার্যতা উত্তর-ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে গোটা শিল্পোন্নত বিশ্বকে দারুণ সংকটের মধ্যে ফেলল। ফলে নতুন বাজারের সৃষ্টি ও অনুসন্ধানের গতিবেগ তীব্রতর হল। এই তীব্রতা একদিকে যেমন শিল্পোন্নত বিশ্বের নয়া উদারনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সীমানা প্রায় তুলে নিতে বাধ্য করেছে এবং খোলা বাজারে মুক্ত বানিজ্যের অবস্থা তৈরি করেছে, তেমনি পরিবেশ সংস্কার বা environment reform-এর নামে নতুন অর্থনৈতিক-সামাজিক আধিপত্যবাদের সূচনা করেছে। দেশগুলোতে প্রশাসনের জাতীয়করণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উড়িয়ে দিয়ে নয়া আঞ্চলিক প্রশাসনিক স্বাধীন স্তরের সূচনা ঘটেছে ইতোমধ্যেই মূলত শিল্পোন্নায়ন এবং পরিবেশ-

---

[306] Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, ibid, p.13

পরিকাঠামো উন্নয়ন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে। ফলে পুঁজিবাদী কেন্দ্রের এই উদ্ভবের বিপরীতে বা পেছনে প্রান্তবর্তী, ব্রাত্য মানুষের বিশ্বায়নও একটি নতুন মাত্রা নিতে বসেছে।

বিখ্যাত পরিবেশ গবেষক জন বেলামি ফস্টার বলেছেন, "It was the promise of development in the periphery of the capitalist world economy that was invariably used as the justification for watering down and effectively eliminating meaningful global environmental change. As conceived by the centers of world capital, development could only be sustained by pursuing the neo-liberal agenda of opening only whole countries and every single sphere of economic activity to market forces. Far from developing the global south, this strategy,however, only served to deepen the economic stagnation or decline of most third world countries and to reinforce a growing gap between rich and poor countries-along with accelerated destruction of environment."[307]

ফলে এহেন আধিপত্যবাদের মুখে পড়ে তৃতীয় বিশ্ব তথা Global South-এর দেশগুলোর নাভিশ্বাস উঠেছে ইতোমধ্যেই। তাকান ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য উপমহাদেশীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে। দারিদ্র এবং বেকারত্ব এই দেশগুলোতে আজ এক অবাস্তব সীমায় পৌঁছেছে, যেখানে পরিস্থিতি পুরোপুরি আয়াতের বাইরে চলে গেছে বললে বোধহয় খুব অত্যুক্তি হয় না। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জোট নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে যে Self-development বা নিজ উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়েছিল তা একদিকে জোট নিরপেক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন গৃহীত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে আন্তঃদেশীয় উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক এবং পুঁজি-সম্পদের উন্নত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঐ এক জোট নিরপেক্ষতার নামে কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিরোধিতা তাদের আর এক সুপার পাওয়ার অর্থাৎ আমেরিকার নেতৃত্বে শিল্পোন্নত বিশ্বের থাবা থেকে বাঁচতে দিল না এবং সোভিয়েতের পতনের আগে থেকেই এবং অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকেই

[307] Sirajus Salekin, 'Globalization : Perspective Aisa', ibid, p.12

আরও শক্তিশালী আক্রমণে নতুন করে পদানত করে নয়া-উপনিবেশে পরিণত করল গোটা তৃতীয় বিশ্বকে নয়া কৌশলে, নতুন হিংস্রতায়। গোটা পৃথিবী জুড়ে Industrialization বা শিল্পোন্নয়নকেই অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নতির একমাত্র 'সূচক' হিসেবে প্রচার করা হল। ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশগুলো পড়ল ভয়ঙ্কর সমস্যায়। শিল্পোন্নয়নের নামে এবং অকথ্য বেসরকারিকরণের মাধ্যমে একেবারে মাফিয়াবৃত্তির সূচনা ঘটল গোটা দেশজুড়ে। এদিকে বিশ্বজোড়া মার্কিন একচেটিয়া রাজ্যপাটের একচ্ছত্র হাতিয়ারগুলো অর্থাৎ একচেটিয়া শিল্পকর্পোরেশনগুলোর দ্বারা প্রত্যক্ষ শিল্পায়নের প্রক্রিয়া সফল করার অসম্ভব লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে গোটা দেশকেই বিলিয়ে দেবার থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেছে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। তাই সামির আমিন বলছেন, "contemporary peripheral capitalism is therefore no longer same as non-industrialization. It is very different. As for the future one can easily imagine a scenario of global evolution that would reproduce and exacerbate polarization at world level on new foundations, produced by monopolies that belong to the centres (Triad: US/Canada, European Union and Japan)"[308] । এর ফলে বিশ্বের বাজারতান্ত্রিকতার নয়া নীতির মাধ্যমে মার্কিন এবং তৎসহ ত্রয়ী সহযোগী তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব পুরোপুরি মুছে দিয়ে বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া সর্ববাণিজ্য নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বায়ন কায়েম করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

এ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম পদক্ষেপ পুঁজির বিশ্বব্যাপী মুক্তগমন অধিকার প্রতিষ্ঠা। মূলত আর্থিক সংস্থাগুলোর প্রাথমিক উদারীকরণ এবং পরবর্তীধাপে অনুন্নত এবং অবদমিত দেশগুলোতে তার বলপূর্বক ব্যবহার কেনিচি ওমের বক্তব্য ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে) এবং বিশ্ব পুঁজিবাজারের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করা হয়েছে।

সামির আমিন বলেছেন, "Not long ago, most of the saving of a nation could not circulate out of the space-usually national-controlled by its financial institutions. Nowadays it is no longer the case: these savings are centralized

---

[308] Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, (London 2003,) p.10-11

by the intervention of financial institution whose field of operation is now the entire world. They constitute finance capital, the most globalized section of capital.”[309]

অতএব এটা মোটেই বোঝার অগম্য নয় যে কী মারাত্মক প্রক্রিয়ায় অনুন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য। আজ এশিয়ায় দাক্ষিণ্যের প্রতি তাই তাদের এত আগ্রহ যা, কেনিচির ভাষায়, পনের বছর আগেও অচিন্তনীয় ছিল।

এই পর্যায়ে গোটা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী প্রকাশ ঘটল গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যমের একচেটিয়া বিশ্বায়ন এবং বিভিন্ন দেশে গণবিধ্বংসী হাতিয়ার থাকার আশংকাকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের গণতন্ত্রের প্রতি সামরিক আক্রমণ সংগঠিত করা। গণমাধ্যমের বিশ্বব্যাপী প্রসারণের ফলে পুঁজির বিশ্বপ্রবাহ থেকে শুরু করে, তৃতীয় বিশ্বসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রেরিত বার্তার মাধ্যমে বিশ্ববাজারের প্রতিষ্ঠা করাই মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য যাকে সামির আমিন বলছেন, “The expansion of modern media is already one of the main factors in eroding the concept and practice of democracy in the west itself.[310] গণবিধ্বংসী অস্ত্রভান্ডার নির্মূল করার নামে ইরাকের উপর গত দেড় শতকের মধ্যে যে তীব্রতায় আক্রমণ চালিয়ে গোটা দেশটাকেই ধ্বংস করে ফেলা হল তার প্রকৃত মাত্রা নিরুপণ করা সামাজিক মনস্তত্ত্বের অতীত। সারা বিশ্বজুড়ে এই একপেশে যুদ্ধ প্রবণতার প্রকৃত সূত্র খোঁজার অনেক প্রচেষ্টার একটাই ফল এই অনুন্নত বা অবদমিত বিশ্বের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল জাতীয় সার্বভৌমত্ব বা মানবিকতার সার্বভৌমত্বের কোনো স্থান নেই, এখানে এ মরুভূমিতে মানুষের অস্তিত্বের একটাই নামকরণ এবং তা হল চিরকালীন উপনিবেশ; যদি না আদর্শ অস্তিত্বের লড়াইয়ে বড় সামাজিক পরিবর্তন করা যায়।

---

[309] Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, ibid, p.15

[310] Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, ibid, p.25

শিল্পোন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকট, পুঁজিবাজারের গতিস্তব্ধতা, মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর নতুন বাজারের খোঁজ এবং বাজার মরণপণ প্রচেষ্টা, পরিবেশ সচেতনতার নামে নয়া আধিপত্যবাদের সূচনা, আন্তর্জাতিক তেলের বাজারদরের একচ্ছত্র নিয়ন্তা হয়েও অর্ধমৃত ইরাককে খুন করার জন্য বিধ্বংসী অভিযান, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে গোটা দেশীয় প্রশাসনিক গণতন্ত্রের ঊর্দ্ধে নতুন অঞ্চল প্রশাসনের ঢালাও অনুমোদন, মানবজীবনের সবকটি প্রকোষ্ঠে সম্ভাব্য সবকটি জৈবিক, জাগতিক, সভ্যতা এবং ঐহিত্যকেন্দ্রিক এমনকি আধ্যাত্মিক উপাদনগুলোকেও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী কেন্দ্র ও প্রান্তবর্তী এই দুই বিশ্ব বিভাজনের মাধ্যমে যে আধিভৌগোলিক অবস্থানের নয়া প্রকাশ ঘটে চলেছে তাকেই বোধহয় বিশ্বায়ন বলা যেতে পারে, যেখানে তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্বই মুছে গেছে। এই কারণে বলা যায় যে বর্তমাণে অনুন্নত Global-South-এ ভারতবর্ষ এমনকি ভুটান, পাকিস্তানও তাদের ভৌগোলিক রেখাভিত্তিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে পড়ে না। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটাই এমনতরো আশ্চর্যের যেখানে তথাকথিত ধনতন্ত্রের সংজ্ঞায় বোধহয় আর সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা চলে না। ফলে পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলো আসলে সামগ্রিকভাবে উত্তর-পুঁজিবাদী সন্ধিক্ষণেরই প্রতীক।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গিলবার্ট অ্যাচকার লিখেছেন, “The first decade of the 21st century now developing under the threat of allout war—some, as in the U.S, have no hesitation in saying, it will last as long as the could war-against those whom. Washington claims the right to designate as it wishes, announcing each time the targets of its next military aggression... public aid to development in the next U.S. budget has been reduced to less than 1% of the federal budegt, while the Bush (former) administration plans to augment military spending by 48 billion dollars: an increase equal to Japan’s total military budget.”[311]

একইভাবে তাকান ভারতবর্ষের দিকে। যে দেশের রাজকোশে ঘাটতি বর্তমানে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে বার্ষিক আর্থিক বাজেটের অর্ধেকের বেশি অংশ অর্থ ব্যয় করা হয় প্রতিরক্ষা ও সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বছরের শেষে আসল খরচ সেই বরাদ্দকেও ছাড়িয়ে যায়। ইরাক

[311] Sirajus Salekin, ‘Globalization : Perspective Aisa’ ibid, p.12

দখল করার পরেই আমেরিকা ও ব্রিটেন শক্তিদ্বয় গণতান্ত্রিক কোরিয়া আক্রমণ করার হুমকি ইতোমধ্যেই দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, এও বিশ্বায়নেরই অনুবর্তী এবং অনিবার্য পরিণতি যা ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর কালে আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী ফ্রাসোয়াঁ হুতার বিশ্বায়নের সার্বিক সামাজিক প্রতিফলন সম্পর্কে বলেছেন, The globalization of capital and economic decisions effect many sectors of human life. We know what it means at a strictly economic level but it should be emphasized that the market logic is expanding into more and more fields of human existence, including education, health, social security and culture. The mercantilist logic introduced into these fields weakens their nature as human rights, which have been won through social struggle, and it sells them off, according to the creditworthiness of individuals. This logic leads inevitably to the exclusion of the poor or, at best, to their being forced into accepting assistance. It is hardly surprising that, with the help of communications, increasing numbers of people are reacting.”[312]

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে তৃতীয় অনুন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ সমাজগুলোতে যে চিরায়ত উন্নতকামী, প্রগতিশীল ভাবধারাপ্রসূত সামাজিক বিন্যাস, মূল্যবোধ ও মানবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তার মূলে বিশ্বায়নের যে প্রধান উপাদানটি আঘাত করল তা হল সার্বিক পণ্যীভবন বা পণ্যায়ন। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো দেশে স্বাধীনতাউত্তর পর্যায়ে অনেক প্রয়োগগত গাফিলতি-তত্ত্বের সমাহার ঘটিয়ে শিক্ষানীতি প্রণেতারা আধুনিকতা বা অতিআধুনিকতার মোড়কে যখন প্রাথমিকভাবে বেসরকারিকরণ এবং তৎপরে বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাইলেন তখনই গোল বাঁধল। আজ সত্যিই শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণের ফলে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা বিশেষত উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য নয়। নিম্নমধ্যবিত্তদের কথা ছেড়ে দিলাম মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চমধ্যবিত্তরা যখন শিক্ষা নামক মৌলিক, মানবিক অধিকারটি ক্রয় করে পেশাবাজারের আঙিনায় পা বাড়াচ্ছে তখন কিন্তু চাকরি বা পেশা

[312]Sirajus Salekin, ‘Globalization : Perspective Aisa’, ibid, p.12

ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের আর থাকছে না। অপরদিকে প্রযুক্তির বিশ্বায়ন চিরাচরিত দেশীয় পেশাক্ষেত্রগুলোকে সার্বিক আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে এমন পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছে যে প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রগুলো থেকে ফেরৎ চাকুরি প্রার্থীরা শূণ্য ময়দানে এসে জড়ো হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল ধারার প্রতিষ্ঠায় ঘটে যাওয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবি-আন্দোলনের পথ নির্দেশ করে গেছে।

ভাবুন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবসের দিনটির কথা। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিক্রিয়াশীল এবং মৌলবাদী আক্রমণে শুধু শহিদের জন্মই হয়নি, আজ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অথবা ভাবুন ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষা আন্দোলনের শহিদদের কথা। মনে করুন পশ্চিমবাংলায় খাদ্য আন্দোলন, তারও আগে তেভাগা আন্দোলন, কিংবা অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ। এগুলোতে রাষ্ট্রীয় মহাবাচকগণের অসি ও মসীচালনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের পরিধির মধ্যে অর্জিত হয়েছে সামাজিক দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে আন্দোলনের অধিকার। শুধু কি তাই, একটি বিশ্ব সংস্কৃতি তথা তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতির প্রশ্নে প্রত্যেকটি সদস্য দেশগুলোর আপন আপন সংস্কৃতির চিরায়ত ধারা বা অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য আজ প্রভাবশালী সংস্কৃতির তীব্র এবং বাঁধনহারা আক্রমণে একদিকে যেমন জমি হারাচ্ছে তেমন অন্যদিকে এক পৃথক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নামে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন এক তত্ত্বপর্যায়ের সূচনা ঘটেছে। উত্তর-আধুনিকতা নামক এই পর্যায়ের নয়া ব্যাখ্যাধারায় এক সার্বিক সাংস্কৃতিক ভাঙনের প্রতিচ্ছবি দেশীয় অভ্যন্তরীণ সমাজসমূহের অবয়বে ক্রমশ ফুটে উঠছে।

এ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ জোনাথন ফ্রিডম্যান বলছেন, "The tendency to cultural fragmentation is, in this view, not part of a process of development, of the emergence of a post-industrial order, an information society on a global scale. It is rather a question of real economic fragmentation, a decentralization of capital accumulation, an accompanying increase of competition, a tendency for new centres of accumulation to concentrate both economic and political power in their own hands, that is, the beginning of a major shift in hegemony in the world system."[313] অর্থাৎ এই

[313] Jonathon Freedman, *Globalization : New World Conception,* London: 2012, p.27

আধিপত্যবাদ আসলে যে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন কায়েম করার চেষ্টা করছে মূলত তৃতীয় বিশ্বের উপরে তাতে একদিক যেমন প্রভাবশালী সংস্কৃতির বাজার প্রতিষ্ঠা করছে অন্যদিকে এই উপায়েই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভূত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও পুঁজির বিশ্বায়ন এবং নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে পুরোদমে। এই উত্তর-শিল্পায়ন-সমাজই আসলে উত্তর-আধুনিকতাবাদ হিসেবে অভিহিত হয়েছে নতুন মোড়কে, যেখানে গণযোগাযোগ পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিশ্বব্যাপী বিচরণ স্বীকৃত হয়েছে। তাই উত্তর আধুনিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রিডম্যান একে পাঁচটি উপাদানের মাধ্যমে চিত্রায়ন করেছেন। এগুলো হলো,

(ক) মূলত এলিট এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতি।

(খ) দেশ, প্রতিষ্ঠান এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সঙ্গে বিজড়িত।

(গ) স্বশাসিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মধ্যবিত্তের নীতিআদর্শ, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাজকর্মের স্বাধীন ক্ষেত্রসমূহ যেমন কর্ম, ঘর, অবসর, শিল্প ইত্যাদি), ফ্রয়েডীয় মতে অহং অতি-অহংবোধের সামাজিক পর্যায় প্রভাবশালী মূল্যবোধ হিসেবে অনুন্নত বিশ্বের সামাজিক মূল্যবোধের যৌক্তিকতা বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(ঘ) ব্যক্তির আত্ম উন্নয়ন, সাফল্য, প্রতিযোগিতা এবং মর্যাদা সন্ধানের মানসিকতা।

(ঙ) সমাজের পৃথক এবং নিরপেক্ষ ভূমিকাই প্রভাবশালী এবং আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক, যৌক্তিকতা এবং নিয়ন্ত্রণের আধিপত্য।[৩১৪]

ফলে শিল্পোন্নত বিশ্বের এই যে উত্তর-শিল্পায়ন নামক উত্তর আধুনিক পর্যায় তা এই সাংস্কৃতিক-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোতে চিরায়ত সংস্কৃতির আঙিনায় ভয়ঙ্কর ভাঙন তৈরি করছে। সৃষ্টি করছে বাজার সর্বস্ব নয়া অঞ্চল যাকে নয়া-পুঁজিবাদী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে, বাকি অংশটিকে প্রান্তিকতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে। এই অসহায়তা আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরে সর্বত্র দৃশ্যমান।

সাংবাদিক অ্যাশ নারায়ণ রায়ের গবেষণাপ্রসূত জিজ্ঞাসা এই পর্যায়ে যথেষ্ট প্রণিধানযোগ: "Is the third world still there? Is it a concept whose time has passed? Does the third

[314] Jonathon Freedman, *Globalization : New World Conception,* ibid, p.29

world have a future? What role do third world and NAM countries have in the new topography of power? What is the agenda for the 21st century?"[315]
উত্তর বিশ্ব এবং দক্ষিণ বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহ বিন্যাসের এই নতুন সমীকরণে তৃতীয় বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহ বিন্যাসের এই নতুন সমীকরণে তৃতীয় বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ গঠন অর্থহীন হেয়ে গেছে। এর পরিণতিতে হয়তো নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র ও প্রান্তের দেশীয় ক্ষেত্র বিশেষের নতুন বিশ্ব-সমীকরণ হয়তো ভারতবর্ষের মতো দেশের সিংহভাগ মানুষ এবং অঞ্চলকেই প্রান্তবর্তী ঘোষণা করে দেবে আর দু-একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নতুন করে দেশীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বে ক্ষমতা-সম্পর্কের নতুন বিন্যাস তৈরি করবে। এই প্রক্রিয়া ভারতে শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। কারণ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ৭৭টি দেশের মহাজোট ও আরো ছোটখাটো জোট পৃথিবীর বুকে আর কোনোভাবেই ক্ষমতার নতুন শক্তি বিন্যাস ঘটাবে না, যদি না সব হারানোর যন্ত্রণা বিশ্ব কমিউনিস্ট আদর্শের হাত ধরে নতুন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন সমাজতান্ত্রিক জোট তৈরি করতে পারে।[৩১৬]
সোভিয়েতের পতনের সঙ্গে শেষ হওয়া ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলস্বরূপ যে এক মেরুকরণের সূচনা ঘটেছে পৃথিবীতে, তাকে অনেকেই তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পিছনে একমাত্র কারণ হিসেবে মানতে চান না। আসলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিশ্বজোড়া এই আধিপত্যবাদ এবং তার বর্তমান প্রকৃত কেন্দ্র-প্রান্ত বিভাজন, এও যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানেরই একমাত্র ফল একথাও তো ঠিক নয়। ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে গোটা পৃথিবীতে দ্বিমেরুকরণ বা মেরুবিভাজন ঘটেছিল তাতে আমেরিকা তার দিকের বিশ্বকে সামরিকশক্তি, পুঁজিশক্তি দিয়ে অবদমিত করে রাখেনি? আবার পাশাপাশি স্তালিন-উত্তর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বও সমাজতন্ত্রের নামে সংশোধনবাদীদের অনুশাসনে চলতে হয়নি অপর বিশ্বের মানুষকে? এর মাধ্যমে আরাধ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সমাজ-অর্থনৈতিক কর্মসূচি, জোট নিরপেক্ষতা, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম-এর রাজনৈতিক আদর্শ থেকে নিজেদের পৃথক রাখা, এই সবের অন্তরালে নিজেদের অজান্তেই মার্কিন বিশ্ববাণিজ্যের একাধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেই বসেছিল।

---

[315] Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization*, ibid, p.6

316. Jan Pul Sattro and Sree Nibash Melkott, *Communication for Development in the Third World,(* London: 1998,) p.4-7

এই প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আজ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গেছে।

ঐতিহাসিক হব্সবন বলছেন, "The astonishing great leap forward of the (capitalist) world economy, and its growing globalization not only divided and disrupted the concept of third world, it also brought virtually all its inhabitants consciously into the modern world."[317]

যদিও হবসবন পক্ষান্তরে একে অর্থনীতির অগ্রগমন বলেছেন, কিন্তু বর্তমান শিল্পোন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ সংকট এখানে ইতোমধ্যেই আলোচনায় প্রমানিত হয়েছে। কালের গতিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে অনেক আগেই এসেছিল, ছিল না শুধু প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটানোর মতো সরকারি এবং বেসরকারি পুঁজির শক্তি।

সাংবাষিক অ্যাশ-এর মন্তব্য এখানে উল্লেখ্যঃ "Globalization considered by some as a destructive leviathan, has pushed many third world countries on the verage of economic marginalization. In Latin America, perceptions of the failure of neo-liberalism have prompted echoes in some quarters of pre-globalization, pre-reform arguments that emerging markets in the third world are either not ready, or else not suited for liberal economic internationalism. These may or may not be real backlash against neo-liberalism but the third world countries can't afford to accept asymmetric globalization. The way the industrial world has sought to impose and interpret globalization, particularly the behaviour of free financial markets, implies a protectionism of the strongest in which perverse processes tend to turn markets into casions."[318]

---

[317] Jonathon Freedman, *Globalization : New World Conception*, ibid, p.31

[318] Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization*, ibid, p.9

তবু সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্ব ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে আমেরিকা সহ শিল্পোন্নত বিশ্বের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিল শুধুমাত্র সোভিয়েত বিশ্বের থেকে অবস্থান পৃথক করার জন্য। তাই প্রাক-বিশ্বায়নপর্বে যখন মুক্তবাণিজ্যের প্রশ্ন উঠল তখন তার শক্তিশালী স্রোত ঠেকানোর ক্ষমতা তাদের ছিলও না; পাশাপাশি একটুখানি শিল্পায়নের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে। আগেই বলেছি যে শিল্পায়নকেই বিশ্বায়ন তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল শিল্পোন্নত বিশ্ব, কারণ প্রধান প্রধান মহাজাতিক শিল্পকর্পোরেশনগুলোর নতুন বাজারের সন্ধান এবং সর্বোপরি পশ্চিমা বিশ্বপরিক্রমাকে প্রতিষ্ঠা দানই তৃতীয় বিশ্বে এইরকম একটি ধারণার জন্ম ঘটাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। আবার একই সঙ্গে গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণযোগাযোগতন্ত্রেরও সার্বিক বিশ্বায়ন প্রধানত এই মহাজাতিক শিল্পকর্পোরেশনগুলোর বদান্যতায় সম্ভবপর হওয়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বে স্বরূপত নির্ভরশীলতার অবিচ্ছেদ্য অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই প্রচার কর্মসূচির প্রাথমিকপর্ব সমাধা হতে হতেই একদিকে যেমন তৃতীয় বিশ্বসমাজে সংস্কার কর্মসূচির সূচনা হল যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতির মূলে আঘাত করে একেবারে উত্তর-আধুনিক সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সূচনা ঘটাল। যাকে সংস্কৃতির ভাঙন বলে বিকল্প পথের গবেষকরা ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে অনুন্নত বিশ্বের সাধারণ তথা দরিদ্র মানবসমাজ নিজস্ব এমনকি প্রতিবেশী সমাজ থেকেও বিতাড়িত হতে শুরু করল। এই শুন্যতাই পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর উদ্ভবের নেপথ্যে শিল্পোন্নত বিশ্বের মূল চাবিকাঠি।

এই ব্যাখ্যার প্রমাণ মেলে আশির দশকের প্রারম্ভে রাষ্ট্রসংঘের New World Information and Communication Order (NWICO) থেকে মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে আন্তঃসীমানা প্রসারণের বহর থেকে। সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড এস্ হারমান বলছেন, “It is this new stage of corporate capitalism that has come to provide the basis for the formation of a global media system.”[319] আর এই সার্বিক বিবর্তনের বিশ্বায়নে গণমাধ্যমের বাণিজ্যিকিকরণ পর্বের সমাপ্তি ঘটল, যেখান থেকে নতুন বাজারকেন্দ্রিক সামাজিক প্রথাপর্বেরও নবপর্যায়ের সূচনা ঘটল গোটা অনুন্নত বিশ্বের অসম উন্নয়নের ফলে গঠিত পুঁজিকেন্দ্রগুলোতে। এডওয়ার্ড এস্ হারমান তাই বলছেনঃ “Throughout the world the

319 Edward S. Harman, *The Threde of Globalization*, ibid, 76

commercialization of national television systems has been regarded as an integral part of economic liberalization programmes"[320]

নব্বইয়ের দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও জাতীয়-সরকারি গণমাধ্যমগুলোতে বেসরকারিকরণ বা আরও বানিজ্যযোগ্য করে তোলার হিড়িক পড়ে যায় মূলত অর্থনৈতিক নয়া-উদারীকরণ প্রক্রিয়ার অনুবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে। মিডিয়া ও বিনোদন বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি কায়েম করতে দেশীয় গণমাধ্যমগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শুরু হল। এই পর্যায়ে আরও একটি দিগন্তের সূচনা হল যাকে শিল্পোন্নত বিশ্বে নাম দেয়া হল convergence বা কেন্দ্রবর্তিতা। এই কেন্দ্রবর্তিতা মূল প্রযুক্তিক্ষেত্রে পারস্পরিক পারম্পর্য অনুযায়ী প্রক্রিয়াবদ্ধ বা সংজ্ঞাবদ্ধ হলেও পরবর্তী ধাপে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বাজারিকরণের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই কেন্দ্রবর্তিতার বা convergence-এর প্রেক্ষাপট আরও বাড়ল এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হল সাম্রাজ্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বপ্রবাহ। বিশ্বায়ন পর্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা WTO-এর জন্ম পৃথিবীর বুকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী কেন্দ্রবর্তিতা পর্যায়ের সূচনা করল। ফ্রাসোয়াঁ হুতার একে কৌশলগত কেন্দ্রবর্তিতা বলে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আসলে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, জেনেভায় অনুষ্ঠিত সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন, শিল্পোন্নত আটটি দেশের মহাজোট, এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন মূলত পুঁজির বিশ্বায়ন এবং বাজারের বিশ্বায়ন পর্বে বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার সৃষ্টির মাধ্যমে চূড়ান্ত কেন্দ্রবর্তিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এরই সঙ্গে চলেছে গণমাধ্যমের প্রযুক্তি ও কৌশলগত কেন্দ্রবর্তিতা যা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রচারক হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ধারার মূলে আঘাত করে নির্মূল করতে যে প্রবল লড়াই আমাদের সবার চোখের সামনে অবিরত চলেছে তাকে নতুন করে কি আর বর্ণনা করা যায়! এই লড়াই কখনও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের সঙ্গে, কখনও জাতপাত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কখনও শিক্ষাপ্রসারের জন্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের জন্যে, কখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তো কখনও সর্বহারার বেঁচে থাকার অধিকারের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য, কখনও ইতিহাস থেকে উৎসারিত আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, কখনও ধর্মীয় ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে, কখনও জাতীয় একতা ও সংহতি রক্ষার জন্য। আর এই লড়াইপর্বও এখন কেন্দ্রবর্তী হয়ে একত্রে বিশ্বায়ন বিরোধিতায়

[320] Edward S. Harman, *The Threde of Globalization*, ibid, 79

সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে এটাও একধরনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রবর্তিতা বা Convergence for democracy–তে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের এই বর্তমান অবস্থায় বিশ্বায়নের অবস্থান সমাজতত্ত্ববিদ গুস্তাভো এস্তেভার উক্তিতেই প্রতিফলিত “For two-thirds of the people on earth this positive meaning of the world ‘development’ is a reminder of what they are not. It is a reminder of an undesirable and undignified condition.”[321]

ফলত তৃতীয় বিশ্বের এই সামগ্রিক না-পাওয়া এবং তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল এখানেই কিছু অতি অল্পসংখ্যক মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে আকাশচুম্বী অতিরিক্ত প্রাপ্তিতে সব দেশগুলোতেই তীব্র শ্রেণি বিভাজনের সূচনা ঘটেছে বহু আগে থেকেই, তাই বিশ্বায়নপর্বে এই শ্রেণি বিভাজনকে অস্বীকার করে অন্তবর্তী সমাজের নিপীড়িতদের মুখ বন্ধ করে শ্রেণিশূন্যতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া এখানে অব্যাহত। এই শ্রেণিশূন্যতার ব্যাখ্যা দুটি প্রত্যক্ষ পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। এক, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বসংস্কৃতির প্রবাহের নামে সরাসরি অস্বাভাবিক চাকচিক্যের দ্বারা দেশীয় স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, আর দুই, প্রাপ্ত এবং বঞ্চিতের পরস্পরের শ্রেণিগত ফারাক অসীম করে, সম্পর্কশূন্য করে আক্ষরিকভাবে এই বঞ্চিতের সমাজটাকে অস্তিত্বশূন্য করে শ্রেণিবিভাজনের উপস্থিতিকেই কার্যত মুল্যহীন করার চেষ্টা। যেখানে গোটা তৃতীয় বিশ্বটার অস্তিত্বকেই মুছে দিয়ে বা মূল্যহীন করে দেয়া গেল, সেখানে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা বা এশিয়ার দরিদ্র শ্রেণি কোন পংক্তিতেই বা স্থান পেতে পারে? বিষয়টি আরও হতাশার উদ্রেক করে, যখন এই বিশ্বেরই শিক্ষিত সমাজ এহেন মেকি দেশীয় এলিটিজমের সমর্থনে গলা ফাটিয়ে আবার শিক্ষা এবং ডিগ্রির জোরে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ কোনো রাগের প্রকাশ নয়, এই আজকের একাডেমিক্সের প্রকৃত চেহারা! তাই এই বিশ্বায়নের তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় ২০০০ সালে ২৫ নভেম্বর সংখ্যার ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর “বৈষম্যই স্বাভাবিক, জোর করে সাম্যবাদ আনার দরকার নেই” শীর্ষক লেখায় দার্শনিক রুশোর প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সাম্যের চিন্তাকে ‘ডাহা মনগড়া ও

---

[321] Gustavo Asteva, উদ্বৃতিঃ বিবেক দেব রায়, “বৈষম্যই স্বাভাবিক, জোর করে সাম্যবাদ আনার দরকার নেই” †‘k, (কলিকাতা: ২৫ নভেম্বর ২০০০,) ৪৫

মিথ্যে কথা' বলে অভিহিত করেছেন এই বলে যে, "কোথায় দেখতে পাচ্ছেন এমন সাম্য"-এমন একটি সহজ সমাধান দিয়ে।[৩২২]

নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলো ক্রমশ তৈরি হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সার্বভৌম অবস্থানও খুব দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝামাঝি সময়কালেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে গেছে এবং সোভিয়েত-উত্তর একক পৃথিবীতে বিশ্বায়নটাই বুঝি বিশ্বপ্রভুর কাছে একমাত্র কাম্য হয়ে উঠেছে। বিশ্বপুঁজির এই আক্রমণ তৃতীয় বিশ্বের মাটির রূপ রস সব শুষে নিয়ে আরাধ্য অন্যকোনো প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলো প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে তৃতীয় বিশ্বে শিল্পায়ন যেমন স্থায়ী দারিদ্র্য সৃষ্টি করে চলেছে, অন্যদিকে এই অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বে সমাজের অন্ধকার অংশকে চিরকালীন অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। প্যাট্রিসিয়া অ্যাডাম্স্ এবং লরেন্স সলোমনের মতে "The international financial have-money-must-loan' institutions are one of the main causes of the sad state of economic affairs in parts of the third world."[323]

তবু তৃতীয় বিশ্ব বাঁচবে, প্রথম বা শিল্পোন্নত বিশ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নয়া অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচবে, কারণ অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে চাইলেও পুরোপুরি মেরে ফেলা যাবে না। আবার এই মাটি থেকেই বিকল্প আদর্শকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির এই অন্তহীন ফারাক দিয়ে বেশিদিন শ্রেণিসংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

---

[322] দ্রষ্টব্যঃ বিবেক দেব রায়, "বৈষম্যই স্বাভাবিক, জোর করে সাম্যবাদ আনার দরকার নেই" †'k, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭

[323] Patricia Adams and Lorence Solomon, *Globalization : The Ultimate Futer of the World*, (London: 2011,) p.77

ষষ্ঠ অধ্যায়: গণযোগাযোগের বিকাশ ও বিশ্বায়নে গণযোগাযোগের ভূমিকা

৬.১. গণযোগাযোগের দৃষ্টিতে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

কালের গতিপথ বেয়ে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসমাজ এবং এর অন্তর্নিহিত জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাজগুলোর বৈচিত্র্য বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। বিশ্বের সকল অঞ্চলের মানুষের অবাধ সংযোগের ধারাপথের মিলনে একদিকে যেমন ভৌগোলিক বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সমাজ স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি সব স্বতন্ত্রতার সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথও সুগম করেছে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মানদণ্ড হল গণযোগাযোগ বা Mass Communication। বিশ্ব-প্রগতির ইতিহাসের পথে প্রত্যেকটি সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য যদি গণজাগরণ হয় তবে সেই জাগরণের পথে উত্তরণের মূল অস্ত্রই হল গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া বা Mass Communication Process। মুদ্রণ ব্যবস্থার আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার বহু আগেই মানবজাতির বা মানবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে এই প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ। গোটা বিশ্বে মানবজাতির প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্যোগ যদি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং স্বয়ংসম্পৃক্তকরণ হয়, তাহলে বেঁচে থাকার পথে বা গোষ্ঠীবদ্ধতার দ্বারা সমাজগঠনের অনুঘটকের নামই হল গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া।[৩২৪] এই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত থেকে ভাষার বিবর্তন প্রক্রিয়ার পথে যে প্রযুক্তি-উত্তরণ মানবজাতি আজ পর্যন্ত ঘটাতে পেরেছে তার প্রতিপাদ্য বা উপজীব্যই হল গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার উত্তরণ এবং সেইসূত্রে Message বা বার্তা প্রবাহের গতিশীলতা এবং বিষয়ানুবর্তিতা উন্নয়ন। মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটেছে তেমনি এর পাশাপাশি গণমাধ্যম হিসেবে খবরের কাগজ এবং খবর সরবরাহ পদ্ধতি মানবজীবনে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। বলা যায় আধুনিক সভ্যতার নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হিসেবে গোটা মানবসমাজ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তখন থেকেই। আজ একবিংশ শতকে যাবতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা সাফল্যের কেন্দ্রস্থল কিন্তু সেই একই অর্থাৎ বার্তা ও খবর তৈরি এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে তা সরবরাহ করা। সেই লক্ষ্যে সভ্যতার প্রত্যেকটি পর্বে উন্নয়নের যাবতীয় ধারার সঙ্গে গনমাধ্যমের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলে মূল কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ার গুণগত এবং সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটেছে প্রতিনিয়ত।

---

[324] আবদুল হালিম, MY‡hvMv‡hv‡Mi BwZK_v, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ.২

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসেবে ব্রিটেনে সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করল, দেখা গেল যে খবরের কাগজ এবং তার মধ্যে লিখিত খবরসমূহ সম্পর্কে মানব সমাজের প্রতিক্রিয়ারও আত্মপ্রকাশ হল এক চূড়ান্ত সহজাত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, যে সহজাত ভাবনা বা প্রক্রিয়ায় মৌলিক কোনো প্রভেদ দেখা যায় না একবিংশ শতাব্দীতেও। সমাজবিজ্ঞানী জন থমসন বলেছেন যে, গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া সমাজ গঠনের প্রারম্ভ থেকেই সমাজের অভ্যন্তরে বার্তার উৎপাদন, সঞ্চয় এবং বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, সামগ্রিক সমাজ বিবর্তনের পথে সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে আধুনিকতার বিবর্তনের পথে গণমাধ্যম এবং সামগ্রিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সমাজের একটি স্বতন্ত্র অথচ সমাজপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্বভাবতই গোটা বিশ্বে যাবতীয় আপেক্ষিকতার শর্ত মেনেই কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া সমাজের প্রতিটি স্তরের গঠন বা পুনর্গঠনে প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীস্বরূপই নয় বরং অনুঘটকেরও কাজ করে এসেছে।[৩২৫]

কালের যাত্রাপথে সমাজের গঠনপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে এবং অবশ্যই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে একদিকে যেমন প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং উন্নয়ন ঘটে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে, অন্যদিকে পথ চলতে চলতে সমাজের অভ্যন্তরে সমান গুরুত্বে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিয়ত সংঘাতে তৈরি হয়েছে অজস্র মত এবং তৎসহ আদর্শ, যার কোনোটা দীর্ঘস্থায়ী, কোনোটার মূল্য তাৎক্ষণিক আবার কোনোটি সমাজের প্রতিটি উন্নয়ন বা অবক্ষয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে হয় বেঁচে আছে নতুবা পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে সমাজের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত যাবতীয় আদর্শ এবং পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নতির এক সুষম মেলবন্ধন ঘটানোই গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য। এখানেই এই প্রক্রিয়া অনুঘটকের কাজ করে, নতুবা কোনো সমাজের পক্ষেই এই সমন্বয়-প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা নিতান্তই মুশকিল। ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রে অষ্টদশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে শুরু করে গণমাধ্যমগুলো জন্মলগ্ন থেকে সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তার সুষম বিকাশে স্বপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া সমাজগঠনে অংশ নিয়েছিল। শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর যে

---

৩২৫. Emanuel Walarstin, *The Oxford Companion to Politics of the World,* (Oxford: 1997,) p.909

কোনো সামাজেরই রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিয়ত পুনর্গঠনে এই প্রক্রিয়া নব নব আদর্শের জন্ম দিয়েছে যা সমাজের ভিতর থেকে উৎসারিত এবং সমাজের ভবিষৎ নিয়ন্ত্রাও বটে।

অধ্যাপক ইয়েল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “Ideologies are implicated by their origins.”। অর্থাৎ সমাজের প্রাণকেন্দ্র থেকেই এই আদর্শের উৎপত্তি। তিনি বলেছেন, “Ideology is a fit expression to describe the values and public agenda of nations, religious groups, political candidates and movements, business organizations, schools, labour unions, even professional sporting teams and rock bands. But the term most often refers to the relationship between information and social power in large scale, political economic contexts. In this sense, selected ways of thinking are advocated through a variety of channels by those in society who have political and economic power.”[326]

তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে সমাজের অভ্যন্তরে উৎসারিত আদর্শতত্ত্বসমূহের প্রয়োগ নির্ভর করে মূলত অতি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তৈরি করা নিজস্ব গণমাধ্যমের চ্যানেলের উপর, অন্যদিকে এর ফলে সমাজে একটি dominant ideology তৈরি হয় যা সমাজের যাবতীয় অনুবর্তী আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এর দ্বারা জনমানসের মতাদর্শ অনেকাংশেই প্রভাবান্বিত হয়। এই মতাদর্শ ক্রমান্বয়ে সমাজে শ্রেণিসম্পর্ক এবং শ্রেণির বিভাজন প্রভৃতি ত্বরান্বিত করে।

এখানে মূলগত আলোচ্য হল যে, এই মতাদর্শ আসলে কার? সমাজনিয়ন্তাদের না জনমানসের? এই সমস্যার সমাধান সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। তবু তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে মতাদর্শ এবং চেতনা এই দুই-ই জনমানসের নির্যাস বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও কার্যক্ষেত্রে জনমানসের সরাসরি অংশগ্রহণ একেবারেই থাকে না। সেখানে dominant ideology এবং তার অনুসারী hegemony বা নতুন আধিপত্যবাদের জন্ম হয়। আবার এই আধিপত্যবাদই জন্ম দেয় শ্রেণিবিভাজনের, যার ফলস্বরূপ সদা জাগরুক থাকে শ্রেণি-সংগ্রাম। যখন গণমাধ্যমগুলো এই

[326] Professor Jems Yall, *Political System of the World*, (London: Hudson Pulications, 2011,) p.65

dominant ideology বা কর্তৃত্বের আদর্শের প্রকাশ ঘটাতে থাকে তখন স্বাভাবিকই যে কোনো সমাজে স্বাভাবিক অসমতার সৃষ্টি হয় যার ফলে সমাজের প্রচলিত আদর্শের ধারার পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও এই পরিবর্তন ক্রিয়া বা প্রতিনিয়ত আদর্শের সংগ্রামে কোনো না কোনো একটি আদর্শ সবচেয়ে প্রভাবশালী বা most dominant ideology-তে পরিণত হয় এবং কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমগুলোকে প্রভাবিত করে বিশেষত সমাজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতিভূগোষ্ঠী।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন সমাজবিজ্ঞানী Harold Innis। এই তত্ত্বের নাম bias of communication বা পক্ষপাতসূচক গণযোগাযোগ। এই তত্ত্বে তিনি বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করে তা সে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী যাই হোক। এইভাবে কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া এবং সমাজে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব এই দুইয়ের মধ্যে এক প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৩২৭] পরবর্তীকালে এই তত্ত্বকে আরও উন্নত এবং সামাজিক অভিঘাতে সমৃদ্ধ করেছেন মার্শাল ম্যাকলুহান, জসুয়া মেরোউইজ প্রমুখ।

ম্যাকলুহান মূলত সমাজের প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রভাব নিয়ে ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেন। বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রভাবে সমাজ যে আধুনিকতার স্তরে পৌঁছে তাতে কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ার শুধু যে মাত্রা বৃদ্ধি পেল তাই নয়, সমাজের মধ্যে উদ্ভূত অসমতা আরও জটিলতর হল এবং পাশাপাশি সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের স্বল্প বদলের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর হল। অধ্যাপক জন থমসন বলেছেন যে, সমাজের আদর্শ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাই শুধু নয়, কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া সমাজের নিত্যপ্রয়োজনীয় বার্তার উৎপাদন, সঞ্চয় এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যা মানবসমাজের যাবতীয় কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।[৩২৮]

---

327 Harold Innis, *World Politics : Today and Tommorow*, (Manchester: Robson & Sons, 2002,) p.12

328 Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, (London: Books Harber, 2001,) p.27

তিনি বলেছেন, "It is easy to lose sight of this symbolic dimension and to become preoccupied with the technical features of communication media."[329]

গণমাধ্যমগুলোতে প্রযুক্তিগত উন্নতিই শেষ কথা হতে পারে না যতক্ষণ না মানবসামজে তার আক্ষরিক এবং সঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে। গণমাধ্যমের প্রযুক্তি নির্ভর উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চরিত্র বদল করেছে যা সমকালীন সমাজব্যবস্থাতেও এই একই পথে চলেছে যেখানে গণমাধ্যম এবং গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া গোটা সমাজের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করেছে।

বর্তমানে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যের সমাজগুলোতে তথা সমকালীন বিশ্বে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটা প্রধান বিশেষত্ব হল গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন। এই প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক ধাপগুলো ছিল প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি অন্যদিকে এর বিশ্বায়নের প্রভাবে গোটা বিশ্বের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সমাজ তো দূরের কথা, উন্নত সমাজগুলোও দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং সমাজের তথাকথিত ঐতিহ্যশালী সামাজিক বন্ধনগুলো ক্রমাগত মূল্যহীন হয়ে পড়ছে এবং ভেঙ্গে পড়ছে। যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা Social fragmentation বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের কোনো তথ্যই আজ অজানা নয় বরং আগে থেকেই জানা হয়ে যায়। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবশ্যই নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এতে করে ম্যাকলুহানের 'গ্লোবাল ভিলেজ' মতাদর্শের কতখানি মানবিক এবং সর্বোপরি সামাজিক প্রাপ্তি ঘটেছে তা অবশ্যই পুনর্মূল্যায়নযোগ্য। অবশ্য যে কোনো মূল্যায়নের প্রশ্নে চিরাচরিত সামাজিক ন্যায়, বৈষম্য, যুদ্ধ, সংগ্রাম, শান্তি জড়িয়ে আছে একথাও ভুলে গেলে মূল্যায়ন অবশ্যই অসম্পূর্ণ থাকবে। তবে এই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের উন্নতিতে প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের গুণগান প্রথমেই করে নেওয়া প্রয়োজন কারণ এই উন্নতিতেও মানুষের মেধারই কৃতিত্ব জড়িয়ে আছে এবং তাকে অস্বীকার করার যে কোনো প্রয়াস অর্থহীন।

অধ্যাপক থমসন বলেছেন, "Distance has been eclipsed by proliferating networks of electronic communication. Individuals can interact with one another, or can act with in frameworks of mediated quasi-interaction, even though

[329] Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, ibid, p.29

they are situated, in terms of the practical contexts of their-to-day lives, in different parts of the world."[330] অর্থাৎ ভৌগলিক দূরত্ব এবং সময়ের সংক্ষেপকরণের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে যে নতুন একীভূত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তাকেই সমাজবিজ্ঞানীরা গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করেছেন।

এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রভাব বুঝতে হলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংজ্ঞাটিও যথাযথ অনুধাবন করতে হবে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সংযোগরক্ষাই গণমাধ্যমের কাজ নয় বরং প্রতিক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একীকরণ বা একীভবন নয়, সমন্বয় প্রয়োজন, ঐক্য প্রয়োজন। কিন্তু এখানেই এসে পড়ে পূর্বোল্লিখিত dominant ideology-এর কথা যা যে কোনো দুর্বল আদর্শকে গ্রাস করে।

অধ্যাপক থমসন বলেছেন, "The term Globalization is not a precise one, and it is used in differing ways in the literature. In the most general sense, it refers to the growing interconnectedness of different parts of the world, a process which gives rise to complex forms of interaction and interdependency. Defined in this way, 'globalization may seem indistinguishable from related terms such as 'internationalization and terns-nationalization."[331]

এই বিশ্বায়নের প্রাথমিক ব্যাখ্যা থেকে গণমাধ্যমের যাবতীয় উন্নতির একটা মূলগত প্রয়োজনীয়তার আভাস পাওয়া যায় কিন্তু আন্তর্জাতিকীকরণের দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে Internationalization এবং trans-nationalization-এর গুরুত্ব মূলত অর্থনৈতিক এবং পৃথকভাবে বিবেচ্য। যাহোক, একথা ঠিক যে গণমাধ্যমের প্রভূত প্রযুক্তিগত উন্নতি গোটা বিশ্বকে প্রায় দরজার সামনে দাঁড় করিয়েছে। ফলে প্রশ্নটা একটাই এবং তাহলো 'মাধ্যমই একটা বার্তা' বা medium is a message' এই ম্যাকলুহান প্রদত্ত তত্ত্বের সমকালীন বাস্তবিক অবস্থান কোথায়? পর্যায়ক্রমে এই তত্ত্বের মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু বর্তমান

330 Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, ibid, p.108

331 Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, ibid, p.49

অবস্থায় পূর্ব উল্লিখিত dominant ideology এবং আধিপত্যবাদ বা hegemony প্রসঙ্গটি কিন্তু প্রায় অনিবার্যভাবে সমাকালীন বিশ্বে দেখা দিচ্ছে। যার ফলে যাবতীয় transnational activities-এর যুগে, তা সে অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন পূর্বে এই নয়া আধিপত্যবাদ কার উপরে ন্যস্ত হবে তা নিয়ে ইতোমধ্যেই বিশ্বে আলোড়ন শুরু হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ম্যাকিনসে কনসালটেন্সি-এর প্রাক্তন অধিকর্তা কেনিচি ওমে বলেছেন, "গোটা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের যাবতীয় সামাজিক প্রয়োজন রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করেছে এবং সেখানে কোনো দেশের সীমানার আর কোনো মূল্য নেই এবং কোনো দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, গণমাধ্যম সংক্রান্ত কোনো নীতিরও কোনো মূল্যই নেই, সবই কেন্দ্রীয়ভাবে গোটা বিশ্বে নিয়ন্ত্রিত হবে।[৩৩২] তাহলে কে নেবে এই বিশ্বনিয়ন্তার দায়িত্ব? রাষ্ট্রসংঘ নয়, কারণ এটি কতগুলো দেশের সমষ্টি, এমনকি জি-৮ দেশসমূহও নয়। তাহলে কারা? কেনিচি ওমে বলেছেন World Trade Organisation এই বিশ্বনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেবে। একটি কথা সহজেই অনুমেয় যে, কারা WTO-কে নিয়ন্ত্রন করে। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্ব অবশ্য এক বৃত্তাকার কুয়োর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। WTO-এর ছত্রছায়ায় বহুজাতিক এবং বর্তমানে Transnational Corporations গুলো যাবতীয় গণমাধ্যমে প্রেরিত এবং প্রেরণযোগ্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অবশ্যই করছে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, একবিংশ শতকের গণযোগাযোগের প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্যই এক সার্বিক বিশ্বায়নের দিকে নির্দেশ করা আছে, যেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন যা গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পরস্পরের সঙ্গে প্রাথমিক এবং ন্যূনতম সংযোগ রক্ষা করবে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম উপাদান হল News বা খবর যা খুব সাফল্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুখ্য বিক্রয়যোগ্য এবং অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলত বিশ্বপ্রতিযোগিতার আসরে কোনো প্রয়োজনীয় বস্তুর গুণ এবং দামের যেমন বিশ্বব্যাপী সুসমতা রক্ষিত হয় তেমনি খবরের ক্ষেত্রেও বিশ্বজুড়ে সমাজ সার্বভৌমত্বের ঊর্ধ্বে এক অভূতপূর্ব সাধারণীকরণ ঘটানোর প্রয়াস পরিলক্ষিত হল এবং স্বভাবতই এর প্রাথমিক প্রভাব পড়ল সংস্কৃতিক্ষেত্রে। বিশ্বব্যাপী যে কোনো ঘটনাবাহিত খবরের প্রয়োজনীয়তা, মাত্রা, আপেক্ষিক বাজারগ্রহীতা প্রভৃতি সূচকের চেয়েও সবার আগে সেই খবরের বিশ্বমান বিচার করা হয়।

---

[332] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, (New York: Harper Leans Publishers, 2002,) p.30

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৃতীয় বিশ্বে বর্তমান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যবসা, বাণিজ্য, সংস্কৃতির কোনো খবর বিশ্বের খোলা বাজারে খবরের মাত্রা বা গুণ অনুযায়ী পরিবেশনযোগ্য হলে তা বাজারে ছাড়া হবে। কিন্তু প্রথম বিশ্বের কোনো খবর যদি দেশগুলোর পক্ষে মর্যাদাহানিকর বা বিশ্ববাজারে ক্ষতিকারক হয়, তাহলে প্রচারিত হয় না। কিংবা খবরের গতিপথ ঘুরিয়ে একটি অতি সাধারণ খবর হিসেবে প্রচারিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের কোনো খবর বিশ্বের বাজারে পরিবেশনযোগ্য তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্তত বর্তমানে, সমাজগুলোর স্বাভাবিক চাহিদা অথবা খবরের স্বাভাবিক গতিপথে চলবার স্বাধীনতা কোনোটাই সুরক্ষিত হয় না বরং কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিশ্বে খোলা বাজারে যেখানে টাকা/ডলারের সুসমতা নেই, বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনো সুসমতা নেই/ ভাষার সুসমতা নেই/ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিন্নতা স্পষ্ট অর্থাৎ সার্বিকভাবে একটি দেশের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বর্তমান, সেখানে যাবতীয় আপেক্ষিকতা মাপবার জন্য নির্দিষ্ট তুলাযন্ত্র একটি ওজনে নির্দেশিত আছে যেখানে মুড়ি এবং মিছরির দর একই হতে হবে কারণ সাধারণীকরণ প্রক্রিয়াটি এমনই। যেমন রক ব্যান্ড সারা পৃথিবীতে, বিশ্ববাজারে সাফল্য লাভ করেছে। কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা হয়েছে। আমাদের গৌরব পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ বিশ্ববাজারে নিঃসন্দেহে সমাদৃত হয়েছেন। বুদ্ধিমান পাঠকগণই বলতে পারবেন এতে লাভ হয়েছে কার বা কোন দেশের। হলিউড সিনেমা প্রতিবছর যথেচ্ছ অস্কার পুরস্কার জিতে চলেছে আর সত্যজিৎ রায়ের ঐ পুরস্কার পেতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এজাতীয় অসমতা বর্তমান বিশ্বে ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। আর এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কে বা কারা পালন করে? এর প্রাথমিক সূত্র হল বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোর মালিকানার সূত্রে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর অধিপতিবৃন্দ যারা বিশ্বের বাজারের ৫৫ শতাংশের বেশি নিজেদের দখলে রেখেছেন।

বিশ্বসমাজ এবং বিশ্ববাজারের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ম্যাকিন কোম্পানির প্রাক্তন অধিকর্তা কেনিচি ওমে তাঁর "The End of the Nation State" গ্রন্থে চারটি "I"-এর উল্লেখ করেছেন যারা বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলো হল Investment বা বিনিয়োগ, Industry বা শিল্প-বানিজ্য, Information Technology তা তথ্যপ্রযুক্তি এবং চতুর্থটি হল Information বা খবর বা বার্তা।[৩৩৩] যদিও এখানে

[333] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.33

আর একিট ‘I’ প্রায় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে তা হল উদ্দেশ্য বা Intention বা বৃহদর্থে Global Intention যা গোটা বিশ্বের আপামর জনসাধারনের মস্তিষ্কে গনমাধ্যম বাহিত হয়ে প্রবেশ করছে এবং মানব সত্তাকে বা মানবমেধাকে প্রভাবিত করছে। গণযোগাযোগের যে কোনো পর্যায়ে প্রেরণযোগ্য বার্তার সমাজ প্রেক্ষাপটে উৎকর্ষের মাত্রা এবং সার্বিক বৈচিত্র্য এসবই নির্ভর করে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণকারী বা নিয়ন্ত্রক motiv বা Intention-এর উপর।

যেমন বর্তমানে যে কোনো সভ্য সমাজে Internet শুধু একটি নিছক পরিসেবা নয়, এই গণমাধ্যমে স্থায়ী ভাবে একটি বার্তা পরিবেশকের আদর্শ, জ্ঞাপন পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের বদলে উত্তরকালের অযাচিত সমকালীনতার উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। শুধু গণমাধ্যমই কেন কেনিচি ওমের প্রস্তাবিত চার ‘I’ তত্ত্বের প্রথম দুটি অর্থাৎ বিনিয়োগ এবং শিল্পক্ষেত্র এই দুই ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক, স্থায়ী এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রয়োজন আছে যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে একদিকে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক সীমাবিচ্ছিন্ন সমাজের প্রস্তাবনা যেমন WTO খসড়ায় পরিস্ফুট হয়েছে অন্যদিকে এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সাফল্যের প্রশ্নে গণমাধ্যমের যে পূর্ণ এবং চূড়ান্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে তার জন্য এক বিশ্বায়িত অভীষ্ট (global intention) কাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় সার্বিকভাবে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করা বিশেষভাবে সমকালীণ প্রেক্ষাপটে, খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। গণমাধ্যমের এই নিত্যনৈমিত্তিক প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং অনিবার্যভাবে বিশ্বায়িত সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রশ্নে অনুঘটকের ভূমিকা এবং সর্বোপরি এই দুইয়ের যাঁতাকলে উদ্ভূত এক নয়া বিশ্ব-সংস্কৃতির লাগামছাড়া রূপ এবং এক অভূতপূর্ব সংজ্ঞাহীনতা যে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্ন আধুনিকতার জন্ম দিচ্ছে বা দিয়েছে সেই নিত্য পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বিশেষ তাৎপর্য ও প্রভাব অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে আধুনিকতার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে পিছনে ফেলে যেভাবে উত্তর আধুনিক সংস্কৃতির প্রস্তাবিত সগুণসম্পন্ন সমাজ তৈরি হচ্ছে বা অন্যথায় ঘুরিয়ে বললে গণমাধ্যমবাহিত হাজারো টুকরো টুকরো বৈশিষ্ট্যসহ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের একীভূত (unification) সংস্কৃতি এবং এর প্রভাবে সমাজগুলোতে আপাত শ্রেণিশূন্যতা প্রভৃতি সামাজিক উত্তরণ বা অবতরণের পর্যায়কে উত্তর আধুনিকতার সংজ্ঞায় শ্রেণিভুক্ত করার ফলে যে পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে সামগ্রিক বিচারে সমকালীন গণযোগাযোগ

প্রক্রিয়ায় তার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহলেই বর্তমান বিশ্বের গণযোগাযোগের ভূমিকা সঠিক যুক্তিগ্রাহ্য হবে এবং তার বিকল্পের সন্ধানও সূচিত হবে।[৩৩৪]

গণযোগাযোগ এবং গণমাধ্যম গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ আগেই বলা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইনিস এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে মার্শাল ম্যাকলুহান সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গণযোগাযোগ বা মাস-কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সর্বপ্রথম যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেন। গত শতাব্দীতে ১৯৫০ সালে হ্যারল্ড ইনিস তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমাজে কথা বা Speech হল গণমাধ্যমের একমাত্র উপায় সেখানে মূলত মুখোমুখি কথপোকথন এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা Interpersonal Communication পদ্ধতিতে মানুষের সামাজিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারিত হয়। আবার লেখা-পদ্ধতি গণমাধ্যমের আর একটি উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মানুষ গোষ্ঠী থেকে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালনে সফলতা লাভ করল। ক্ষমতার লিখিত আদানপ্রদানের মাধ্যমে গত কয়েক শতাব্দীতে রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য এবং তৎসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির পুঞ্জীভবন (Power Blocs) দেখা গেছে।[৩৩৫]

রোমান সাম্রাজ্যের কাল থেকে উনবিংশ শতকে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার এবং ব্যবহারে পূর্ব সময় পর্যন্ত লিখন মাধ্যম প্রধান গণমাধ্যম হিসেবে তার ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, তার লিখিত রূপের সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। হ্যারল্ড ইনিস এই পর্যায়ে প্রাচীন সমাজে গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং সমাজের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট এই দুইয়ের সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতার ভিত নিয়ে গবেষণা করেন। পরবর্তীকালে মার্শাল ম্যাকলুহান এই প্রাসঙ্গিকতার রেশ টেনে সভ্যতার আধুনিক পর্বের ব্যাখ্যা করেন এবং গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার সার্বিক উত্তরণ ঘটান।

ম্যাকলুহান গণযোগাযোগ এবং গণমাধ্যমের বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর্ব থেকে শুরু করেন (Typographical man) এবং ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে একটি মুদ্রিত বই জ্ঞান এবং আদর্শের প্রসারের ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপে এক শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছিল।

---

[334] আবদুল হালিম, MY‡hvMv‡hv‡Mi BwZK_v, পূর্বোক্ত, পৃ.২১

[335] Harold Innis, *World Politics : Today and Tommorow*, Manchester: Robson & Sons, 2002, p.12

তিনিই প্রথম বৈদ্যুতিক মাধ্যম এবং মুদ্রণ মাধ্যমের আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা করেন এবং মুদ্রণ সংস্কৃতি ও বৈদ্যুতিক সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং শক্তিশালী প্রভাবের বিস্তার করে তা দেখান। এখানে পূর্বেই কিছু পরিমাণে তার অবতারণা করা হয়েছে। শুধু মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমই নয়, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি গণমাধ্যমের সামাজিক সম্পৃক্ততা নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন।

১৯৯০ সালে সমাজবিজ্ঞানী এন্টনি ডিডেন্স তার গবেষণায় বলেন, বৈদ্যুতিক মাধ্যম সামজিক প্রেক্ষপটে সময় এবং স্থান এই দুইয়ের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে যা যে কোনো পর্যায়ে আধুনিক জীবনযাত্রার এক বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বর্তমানে উত্তর আধুনিক পর্বে এই বক্তব্যের সত্যতা আরও পরিস্ফুট হয় যখন গণমাধ্যম বাহিত সংস্কৃতি সমাদৃত না হলেও মনোজগতে উপনিবেশের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই প্রশ্নে এক অন্তহীন স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়া চলেছে গোটা বিশ্বজুড়ে সন্দেহাতীতভাবে। তিনি এই তত্ত্বের সমর্থনে দেখিয়েছেন কীভাবে কোটি কোটি মানুষ বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে থেকে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারছে। যেমন বিশ্বকাপ ফুটবল বা অলিম্পিক গেমস এবং লাস ভেগাসের বক্সিং রিং-এর বাইরে বিশ্বজোড়া জুয়ার ফাঁদ বা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের (World Trade Centre) সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার বিস্তারিত প্রদর্শন।

সমাজবিজ্ঞানী ডায়ান এবং কজ বলেন, বর্তমানে টেলিভিশন বিশ্ব রাজনীতি, বিশ্ব অর্থনীতি এবং বিশ্বজোড়া যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ব সংস্কৃতি এবং বিশ্ব ধনতন্ত্রের পক্ষে টেলিভিশন এক ক্ষমতাশালী গণমাধ্যম হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, এর ফলে জাতীয়, আঞ্চলিক সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ এককথায় বিপন্ন। এই বিপন্নতার ব্যাখ্যা সাধারণভাবে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

যা হোক হ্যারল্ড ইনিস এবং মার্শাল ম্যাকলুহানের গবেষণাই গণযোগাযোগের বিশ্বব্যবস্থার (Global System) প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠার তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট বা ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এরও আগে এই গবেষণা হয়েছে অনেকটা এবং বিকল্প তত্ত্বেরও অবতারণা হয়েছে (ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব কমিউনিকেশন)। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কফুর্ট তত্ত্বপ্রতিষ্ঠান তথ্যের উৎপাদন এবং প্রাচ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর আধিপত্যের সুস্পষ্ট অবতারণা করেছেন বহুপূর্বেই। এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রবক্তারা হলেন জুরগেন হেবারমাস, ম্যাক্স হোরখহাইমার, থিওযর অ্যাডোরনো,

হারবার্ট মারকিউজ, ডগলাস কেলনার প্রমুখ। রাজনেতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজ পরিবর্তনের আশু লক্ষ্যে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে গণসংস্কৃতি এবং যোগাযোগতত্ত্বের পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির ক্রমাগত বাণিজ্যিভবনের ধারা এবং বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী গণযোগাযোগ আসলে মার্কিন তথা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলোর মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

সমাজবিজ্ঞানী ডগলাস কেলনার এই তত্ত্বধারা প্রসঙ্গে বলছেন, "This situation was most marked in the United States that had little state support of film or television industries and where a highly commercial mass culture emerged that came to be a distinctive feature of capital societies and a focus of critical cultural studies."[336]

এই ক্রিটিক্যাল যোগাযোগতত্ত্বধারায় দেখানো হয়েছে যে, সংস্কৃতির এই বাজারিকিকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রসূত গণসংস্কৃতি অন্যান্য যে কোনো উৎপাদিত পণ্যের মতো তিনধারার চরিত্রে সমৃদ্ধ, যেমন সার্বিক পণ্যভবন বা commodification, বিশ্বস্বীকৃত মান বা Standardization এবং এর গণপ্রচার বা massification এবং এর মাধ্যমে সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাগুলোর বৈধতা প্রচার করাই এই গোটা প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। তাঁদের মত অনুযায়ী গণসংস্কৃতি এবং গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া আসলে রাজনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিকীকরণ (socialization) প্রক্রিয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। ফলে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এগুলোকে এক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়। অর্থাৎ একথা সহজেই অনুমেয় এবং অধুনা প্রতিষ্ঠিত যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো অধুনা বিশ্বায়নের নামে যে নয়া আধিপত্যবাদের সূচনা করেছে মুলত অর্থনৈতিক নয়া উদারিকরণের সুযোগে, তাতে মূলত বিশ্বসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এবং গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সার্বিক প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তথ্যের বিশ্বভ্রমণে উন্নত বিশ্বব্যবস্থা আজ প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে। এর ফলে গণমাধ্যম এবং তৎবাহিত বার্তার বিবিধ বিষয়ের গুরুত্বই গেল কমে। বরং প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি এবং গণযোগাযোগের ব্যবহারই প্রধান হয়ে উঠল। এর দ্বারা বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমগুলোর উপর আধিপত্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারা প্রকাশ পেল। পরবর্তীকালে রেমন্ড উইলিয়ামস ১৯৭৪-৭৫ সালে তাঁর Technological

[336] Doglas Kelnar, উদ্ধৃতিঃ ড. মো. আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া, ‖ekভqb, (ঢাকা: আনন্দ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৫,) পৃ.২৪

Determinism অর্থাৎ প্রযুক্তিগত বর্হিনিয়ন্ত্রণবাদ তত্ত্বে বলেন যে গণমাধ্যমপ্রসূত যে কোনো তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই তার যথাযথ প্রচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরিত্যক্ত হয় বহিরাগত কোনো শক্তির প্রভাবে।[৩৩৭]

গবেষক অধ্যাপক রাওল্যান্ড লোরিমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "One of the dengers of McLuhun-Innis approach is what Raymond Williams calls technological determinis, with a central emphasis on media from, other elements of the communication process, such as media content or how media products are made by producing institutions, are sidelined. Partly becuase of Mcluhun's emphasis on technology, the new wave of Marxist media theorists of the 70s saw his ideas as reactionary.[338]

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে গত শতকের শেষ দশক থেকে সামাজিক বিবর্তনের পর্যায়গুলো যখন উত্তর আধুনিকতার (Post-modernism) প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ শুরু হল তখন অবশ্য অধ্যাপক লোরিমারের মতে, ম্যাকলুহানের গবেষণার প্রাসঙ্গিকতার নবমূল্যায়ন ঘটল। কারণ পরাধুনিকতা তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যার চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করার ফলে গণযোগাযোগের নতুন করে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত হল গবেষক মহলে। এই প্রসঙ্গেও প্রাথমিকভাবে ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত অবতারণা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমাজগুলো পরস্পরকে জানতে পারল তেমনি তাদের মধ্যে সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের এবং অর্থনৈতিক-সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটতে লাগল। এই প্রক্রিয়াটিই হতে পারত বিশ্বায়ন। কিন্তু উন্নত ধনতন্ত্র প্রস্তাবিত বিশ্বায়নের আওতায় অন্যান্য অতিসামাজিক (Supra Societal) বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ঘটাল।[৩৩৯]

---

337 Remond Williums, *Technologicla Determinism,* (London: MacMillan & Co, 1975,) .43

338 Rawland Lorimar, *Mass Communication,* (Manchashter University Press: 1998,) p.10

৩৩৯. Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, ibid, p.29-30

যেমন উপরোক্ত সংস্কৃতির আদান-প্রদান প্রক্রিয়া এবং তার ফলস্বরূপ প্রাথমিক প্রভাব পর্যন্ত বিষয়টি থেমে থাকল না বরং রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের প্রভাবে একমুখী প্রক্রিয়া প্রাচ্য তথাকথিত অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত সমাজগুলোতে প্রবেশ করতে লাগল। এই প্রবাহের উৎসমুখ হল পশ্চিমা সমাজ, পশ্চিমা অর্থনীতি। ফলে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের বা গণযোগাযোগের ফল বলতে গেলে ভালোই হলো। এই প্রসঙ্গে ম্যাকলুহান গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে সমালোচিত হয়েছিলেন এবং শতাব্দীর শেভভাগে আবার তাঁর 'গ্লোবাল ভিলেজ' তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। গণমাধ্যমের জগতে ম্যাকলুহান প্রদত্ত বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণীর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আজ একবিংশ শতকে অন্তত কোনো সন্দেহ থাকার নয়।

অধ্যাপক লোরিমার বলেছেন যে, প্রযুক্তিগত বহির্নিয়ন্ত্রণবাদ বা technologicla determinism-এর প্রশ্নে ম্যাকলুহান, ইনিস প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যায় কিছু ঘাটতি থাকতে পারে। যেমন ম্যাকলুহান বলেছেন, "We shape our tools; thereafter our tools shape us"এই বক্তব্যে ম্যাকলুহান 'We' বা আমরা অর্থাৎ মানবসমাজের যথার্থ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেননি। যদিও এইখানেই লুকিয়ে আছে যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ।

যাহোক বিকল্প জ্ঞাপনতত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তারা যেমন রেমণ্ড উইলিয়ামস, আন্তোনিও গ্রামসি, লুই অ্যালথুসার, এ্যান্টনি গিডেন্স, ইয়েন অ্যাঙ, ডেভিড মোরলে প্রমুখ দেখিয়েছেন কীভাবে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিশ্বায়িত রূপের মধ্যে যাবতীয় সামাজিক বৈষম্য এবং অসমতা লুকিয়ে আছে এবং সমাজের ঊর্ধ্বস্তরে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির বিস্ফোরণ একধরনের গণসংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে যা বিশ্বব্যাপী মানবজাতিকে শক্তিশালী আচার, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি ধারায় সরাসরি প্রভাবিত করছে এবং বাধ্য করেছে এই ধারায় সম্পৃক্ত হতে। ফলত এই ধারাই সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ডেনিস ম্যাকুয়েল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, শুধু সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বায়নের সার্বিক অর্থাবলির সামগ্রিক প্রকাশে এই প্রক্রিয়াকে পশ্চিমাকরণ (westernization) এমনকি আমেরিকিকরণ পর্যন্ত বলা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা সর্বৈব সত্য যে, গণমাধ্যমে তথ্য প্রবাহ ঘটছে মূলত উন্নত-পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্ব থেকে অনুন্নত বিশ্বের দিকে, যার ফলে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত সমাজগুলো এক ভারসাম্যহীনতা, সাম্যবৈষম্যতায় ভুগছে। ডেনিস ম্যাকুয়েল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The concept of cultural imperialism implies these

unequal international processes, and suggests certain degree of coercion, invasion, or repression. The increases the global power of large and wealth countries and hinders the growth of an appropirate national identities and self-images in the receiving nations."[৩৪০]

ফলে এইভাবে গ্লোবাল-সংস্কৃতি আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে। ম্যাকুয়েল cultural hegemony বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে, এই কর্তৃত্ব বা আধিপত্য বা hegemony জন্ম দেয় এক dominant culture-এর যার সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলোর মানব সমাজের কোনো স্পষ্ট পরিচিতি বা ধ্যান–ধারণা নেই। এইভাবে জাতীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারা তার নিজস্ব স্রোত হারাচ্ছে এবং অস্তিত্বসংকটে ভুগছে। যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আধিপত্যবাদ অনেকেই মেনে নেননি। তাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন এই বলে যে, গণমাধ্যমের তুলনামূলক অপ্রতুলতার সুযোগে অনেকাংশে বহিঃসংস্কৃতি এই সমাজগুলোতে বাসা বাঁধার সুযোগ পাচ্ছে, যদিও বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে প্রায় কোনো সমাজের ক্ষেত্রেই এই যুক্তি খাটে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে গণমাধ্যম শিল্পের (industry) চেহারা নিয়েছে।

আসলে যে কোনো সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী তত্ত্ব হল সমকালীন আধুনিকতার পথে ক্রমউত্তরণ। এই উত্তরণ প্রক্রিয়ায় যা কিছু প্রাচীন, পুরাতন এবং ক্ষণস্থায়ী তাকে টপকে গিয়ে সমাজ সমকালীন আধুনিকতার স্তরে উন্নীত হয়। পুরনো প্রথার অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুনের জন্ম হয় পুরাতনের গর্ভ থেকে। কিন্তু এই তত্ত্ব আবার কোনো একটি বিশেষ সমাজের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। এই ভাবে প্রত্যেকটি সামজের উত্তরণের ধারা অব্যাহত হলেও তার চরিত্র ভিন্ন, মানসিকতা ভিন্ন এমনকি পরিপ্রেক্ষিতও ভিন্ন। এমতাবস্থায় পূর্বে উল্লেখিত সমাজের উত্তরণ যদি 'গ্লোবাল' চরিত্র পেয়ে বসে, যাবতীয় উৎস-ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, সেখানে গণমাধ্যমবাহিত গ্লোবাল সংস্কৃতি সব সমাজের পক্ষে সুষমভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, একবিংশ শতকে যেভাবে গোটা বিশ্বে বিশ্বায়নের নামে এ রকম ক্ষমতার সঞ্চরণ বা অসম ঘনীভবন ঘটেছে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তাতে একটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ বা সমাজের পক্ষে তাকে মোকাবিলা করা খুবই শক্ত। ম্যাকিনসের

340. Deniss MacCuel, উদ্বৃতিঃ ড. মো. আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া, ‖ek\/qb, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬

প্রাক্তন অধিকর্তা যেমন চারটি 'I' -এর অবতারণা করেছেন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের চারটি শর্ত হিসেবে, ঠিক তেমনি আরেকটি বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানী জন মসন আরও চারটি চরিত্রের ক্ষমতার কথা বলেছেন। এগুলো হল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দমনমূলক এবং প্রতিকী শক্তি বা ক্ষমতা।

গোটা বিশ্বে একবিংশ শতকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্যই হল উন্নত দেশগুলোতে জমে থাকা অব্যবহার্য বিপুল অর্থ সম্পদ, যা আমেরিকাতে Pension Fund নামে পরিচিত এবং শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে শ্লথতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বাজার দখল করা, এই সেই জমে থাকা সম্পদের পুনর্ব্যবহার করা। রাজনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াও মূলত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের লক্ষ্যে পরিচালিত। বাকি দুটি ক্ষমতার পরিচয় পাঠকসমাজ ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ভালোভাবেই পাচ্ছেন। এমতাবস্থায় গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার বা গণমাধ্যমের এই কয়েক শতাব্দীর সামাজিক প্রথাভিত্তিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞা কি অচিরে বদলে যাবে বিংশশতাব্দীর শেষ দশক এবং একবিংশ শতকের বিশ্বায়নের ধাক্কায়? এ পর্যন্ত বিশ্লেষণের আলোকে আমরা এবার গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার এ যাবৎ উত্থাপিত সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করব:

১৯৭২ সালে ডেনিস ম্যাকুয়েল তাঁর "Towards a Sociology of Mass Communications" বইতে গণযোগাযোগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন। সেগুলো হল:

ক) এই প্রক্রিয়ায় সাধাণভাবে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

খ) এই প্রক্রিয়া বিপুল পরিমাণ শ্রোতা বা দর্শকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

গ) গণযোগাযোগের বিষয় সমাজে সবার কাছে প্রেরিত হয় অপ্রত্যক্ষভাবে।

ঘ) দর্শক বা শ্রোতা সবসময়ই সমাজে বিভিন্ন অবস্থায় বাস করে এবং সংস্কৃতির প্রশ্নেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে।

ঙ) গণমাধ্যম বিভিন্ন দূরত্বে বসবাসকারী ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে একই সময়ে সংযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপনে পারঙ্গম।

চ) গণমাধ্যমকর্মী এবং শ্রোতার মধ্যে সম্পর্ক দুজনের জ্ঞাতার্থে রচিত হয়। অর্থাৎ জনসাধারণ তার গণমাধ্যমকর্মীকে চেনে এবং গণমাধ্যমকর্মীও কাদের উদ্দেশ্যে বার্তা জ্ঞাপিত হচ্ছে তাও জানে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত জনসাধারণকে জানা সম্ভব নয়।

ছ) গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় দর্শক বা শ্রোতা সেই বিশেষ আধুনিক সমাজের মধ্যেই বিশেষিত। কোনো একটি সাধারণ সমষ্টিগত স্বার্থে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবিশেষ একত্রিত হয় এবং সেখানে সাধারণভাবে জনসাধারণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে জনসাধারণ একে অন্যের কাছে নিতান্তই অপরিচিত।

জ) জনসাধারণের মধ্যে আলাপ পরিচিতার সীমাবদ্ধতার কারণে সামজিক মেলামেশার সুযোগও কম, যদিও সমষ্টিগত উদ্দেশ্যে কিছু পরিমানে সুযোগ বা মত বিনিময় হতে পারে।[৩৪১]

উপরোক্ত আটটি সমাজনিঃসৃত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া পরিচালনে সাধারণভাবে যে সমাজের প্রয়োজন তাতে চিরাচরিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন সমকালীন প্রযুক্তি, শিল্প, মানুষের চিরাচরিত সমাজবদ্ধতা, সামাজিক প্রথাসমূহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আশু প্রয়োজন। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট জনসাধারণ কাজে, মানসিকতায়, প্রথা, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অর্থাৎ একটি সমাজের মধ্যেই এতগুলো ভিন্নতা কাজ করছে যার ফলে প্রেরিত বার্তার সর্বজনগ্রাহ্যতা বিচার করা প্রয়োজন। যদিও এক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের উপর জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু এই heterogeneity বা ভিন্নতাকে জোর করে সমীভবন বা homogeneous করার বা এই প্রক্রিয়ায় একীভূত বার্তার কথা বলা হয়নি। যেমন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে বা বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে প্রায়শই জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরিত হয় কিন্তু সেই বার্তায় সংস্কৃতির বৈচিত্রের এক সুষম মেলবন্ধন ঘটে বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সমন্বয় সাধিত হয় এমনকি সমাজের বা দেশের এক সামগ্রিক সংস্কৃতি রচিত হয় কিন্তু তাতে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম, সমাজবিজ্ঞানী রাসেলের প্রজ্ঞা, বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে পিকাসোর শ্বেত কপোতের ছবি, স্টালিনের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের ভাবনা, জাঁ পল সার্তের বিশ্বামানবাতার বার্তা, নোয়াম চমস্কির মানবতার বিশ্বজনীন ভাবনা অবশ্যই বিশ্বে এক সুষম সংস্কৃতির বিকাশে প্রত্যক্ষ সহায়ক কিন্তু তা দেশীয় বা সমাজভিত্তিক সংস্কৃতির বিনাশ করে না। অথচ এই প্রক্রিয়াকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বলা যেত। কিন্তু বিংশ শতকের শেষ দশকে প্রস্তাবিত বিশ্বায়নের সুরটা ছিল একটু ভিন্ন এবং সংস্কৃতির বিশ্বায়ন মূলত আর্থিক বিশ্বায়নের উপর বা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়েছে। ফলে গণমাধ্যমের বিশ্বজনীনতা বিশ্বসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই পথেই এখন ঘটেছে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ। এখানে আরও একটি বিষয়

[341] Denis Mackuel, "Towards a Sociology of Mass Communications" (Oxford University Press, 1972,) p.22

বিচার্য যে, বার্তাপ্রবাহের বিশ্বায়ন বা একচ্ছত্র স্বাধীনতা।[৩৪২] কিন্তু একথা আগেই বলা হয়েছে যে, বার্তা বা খবর বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। তাহলে নতুন তথ্য সরবরাহ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত Mac Bride খসড়া আজও অপ্রকাশিত থাকতো না। ১৯৭৬ সালে সান জোসে ডি কোস্টারিকা-তে আয়োজিত এবং ১৯৭৯-তে কুয়ালালামপুরে আয়োজিত ইউনোস্কোর এই বিশেষ সম্মেলনে যে নীতি গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলঃ

ক) কমিউনিকেশন পলিসি বা যোগাযোগনীতি প্রণয়নের সময় সমাজগুলোর পরিপ্রেক্ষিত, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতো বিষয়গুলো ভিত্তি করতে হবে।

খ) যোগাযোগ প্রক্রিয়া একাধারে জাতির বা সমাজের সমষ্টি সত্তার বিকাশে সহায়ক হবে এবং সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হবে। এছাড়া সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুরক্ষায় প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এই সমাজে তথ্য এবং বার্তা বহুমুখী হবে যার ফলে গণমাধ্যম থেকে জনসাধারণ বা এর বিপরীত প্রক্রিয়া দুই-ই সুষমভাবে সাধিত হবে। এছাড়াও এই রিপোর্টে জাতীয় ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের উপর সরকারি প্রভাবের কথা বলা হয়েছিল।

দেখা গেল যে ম্যাকব্রাইড রিপোর্টকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানালো পশ্চিমা বিশ্ব মূলত আমেরিকার নেতৃত্বে। আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম মূলত দুটি ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাল। প্রথমত, তারা গণমাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করল। দ্বিতীয়ত, তথ্য সরবরাহের প্রশ্নে যে অসমতার উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে তার বিরোধিতা করল। এটি অনেক প্রাচীন বিষয় তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও আন্দোলন ঘটেছে। কিন্তু মূলত অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান এবং প্রধান সংবাদপত্র New York Times-এর নেতৃত্বে এই রিপোর্টের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো সত্ত্বেও ইউনেস্কো এই রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

যাহোক, গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণের ধারাবাহিক গবেষণায় ডেনিস ম্যাকুয়েলের পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালে যে সব কাজ হয়েছে আমরা সেদিকে এবার মনোনিবেশ করব।

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক জন থমসন গণযোগাযোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলছেন যে, যখন আমরা ‘গণমাধ্যমের’ কথা বলি, তার দ্বারা একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ সৃষ্টি বা বিশেষ সৃষ্টিধর্মিতার কথা ভাবি। যেমন বই, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার অনুষ্ঠানসমূহ, সিনেমা, ক্যাসেট, কম্প্যাক্ট ডিস্ক,

[342] আবদুল হালিম, MY‡hvMv‡hv‡Mi BwZK_v, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬

চিত্রকলা প্রভৃতি। অর্থাৎ উপরোক্ত এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমরা গণযোগাযোগের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। কিন্তু গণযোগাযোগ কথাটার মধ্যে এক ধরনের অসামঞ্জস্য নিহিত আছে। যেমন mass বা জনগণ এই কথাটির অত্যন্ত অস্বচ্ছ। সাধারণভাবে mass বলতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলনে গঠিত শ্রোতাবৃন্দ বা দর্শকবৃন্দ বা পাঠকবৃন্দের কথাই ধরা হয়। আধুনিক যুগের টেলিভিশন, সিনেমা এবং সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে হয়তো mass-এর এরকম অবয়ব খানিকটা যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু অধিকাংশ গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এমন প্রতিনিধিত্ব বোধহয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সংবাদপত্রের প্রথম যুগে, সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বা বর্তমানে ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য বিশেষ কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে পাঠকসমাজকে মোটেই mass শব্দটি দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক, এককথায় গ্রহীতা সমাজ অত্যন্ত ছোট এবং বিশিষ্ট। ফলে অধ্যাপক থমসন বলেছেন, গণযোগাযোগ শব্দটিকে এভাবে বিস্তৃতকরণ সমীচীন নয়। তিনি বলেছেন, গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসংখ্যাই বড় থাকা নয় বা জনসংখ্যার অংশবিশেষটাই মুখ্য নয় বরং “The products of mass communication are available in principle to a plurality of recepients.”[343]

অর্থাৎ গ্রহীতাকূলের একত্ব বা বহুত্বের কাছে গ্রহণযোগ্যতাই গণযোগাযোগের সাফল্যের মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক থমসন আরও বলেছেন, mass কথাটি অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন পরিচয়ে সমাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও ডেনিস ম্যাকুয়েলসহ অনেক গবেষকই সমাজে জনগণের পেশা, ধর্ম, রাজনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতেই বিশেষ সত্তাজনিত ভিন্নতার উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমানে তথাকথিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এই ভিন্নতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক ভূখণ্ডের (যেমন তৃতীয় বিশ্ব) জনগণ বা mass-এর যাবতীয় সত্তার ভিন্নতাকে বা সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অস্বীকার করে অভিন্নসত্তায় দেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপক থমসনের মতে, সভ্যতার বিকাশের প্রশ্নে সংস্কৃতির বা গণসংস্কৃতির মূল ভাবনা কখনই সাদামাটা বা common নয় বর্তমানে বরং অনেক সামাজিক মূল্যবান তত্ত্ব বা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে।

---

[343] Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, ibid, p.73

গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় Intrapersonal থেকে Interpersonal এবং Group communicaiton পর্যন্ত তথ্য বা বার্তার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ ঘটে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে। আবার গণযোগাযোগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি একমুখী হয়ে পড়ে মূলত বিপুল গ্রহীতা জনসাধারণের পরস্পরের অপরিচিতির ফলে।

থমসন আরো বলেছেন, "Hence the recepients of media messages are not so much partners in a reciprocal process of communictive exchange but rather participants in a structured porcess of symbolic transmission. Hence I shall generally speak of the 'transmission' or diffusion of media messages rather than communicaiton as such."[344]

এই Structured communication বা পরিকল্পিত যোগাযোগ বা পরিকল্পিত গণযোগাযোগ প্রক্রিয়াতে প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ আছে, যেমন বৈদ্যুতিক মাধ্যমে টেলিফোন করা বা সংবাদ মাধ্যমে সম্পাদককে চিঠিপত্র কলামে লেখা প্রভৃতি, অথবা সরাসরি গণমাধ্যমের সেই বার্তাটিকে অস্বীকার করা, সংবাদপত্রটি না কেনা প্রভৃতি। তবে অধ্যাপক থমসন 'গণযোগাযোগ' পরিভাষার বদলে mediated communication বা 'প্রচারিত যোগাযোগ' ব্যবহারের পক্ষপাতী।

বাওলিং গ্রীণ স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ওরেগন ইউনিভার্সিটির দুই কৃতি অধ্যাপক শ্রীনিবাস মেলকোট এবং লেসলি স্টিভস যোগাযোগ বা গণযোগাযোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় বলেছেন, "The context in which communication takes place, as differnent communication contexts have yielded their own sub-fields or communication studies. [৩৪৫]

অর্থাৎ যে কোনো পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রেক্ষাপটে যেখানে কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল বা ঘটমান, সেখানেই বিভিন্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তৈরি বিভিন্ন উপ-পরিপ্রেক্ষিত বা উপ-প্রেক্ষাপট তৈরি হয় সেখানে নতুন করে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গণযোগাযোগ

---

[344] Professor John Thomson, *Realization of Globalization*, ibid, p.77

[345] Professor Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, উদ্বৃতিঃ অধ্যাপক এস.আমিনুল ইসলাম, Ôwekvqb c‡i‡cÖwÿZ mgvRweÁvb, রতনতনু ঘোষ সম্পাদিত বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, ঢাকাঃগ্রন্থ কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.২৭

সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। গণযোগাযোগে আগেকার পুরনো তত্ত্বভিত্তিক মডেল বা রূপরেখাগুলোর প্রায় সবগুলোই আপেক্ষিকভাবে রৈখিক বা Linear প্রক্রিয়া ছিল, যেখানে এই প্রক্রিয়ায় একজন বার্তা প্রেরণ করেন কোনো একজনের উদ্দেশ্যে। এই প্রেরণ প্রক্রিয়া ঘটে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা। বার্তা পাওয়ার পরে গ্রহীতা তার উত্তর দানের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যোগাযোগের ভাষায় এই প্রক্রিয়ার নাম পুনঃপ্রত্যাবর্তন। এছাড়া এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত শর্ত বা উপাদান প্রবেশ করলে তাকে বিশৃঙ্খলা বলা হয়। এই বিশৃঙ্খলা পরিবেশ সূত্রে বা মানসিকভাবে সঞ্জাত হতে পারে। বার্তা প্রেরক এবং গ্রহীতার এই তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কমবেশি মাত্রা আছ। কিন্তু যেখানে এই উদ্যোগের যাবতীয় দায়িত্ব প্রেরকের উপর ন্যাস্ত থাকে সেখানে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া মূলত একমুখী অর্থাৎ বার্তা একইদিকে প্রবাহিত হয়। প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও তা প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হতে পারে। এই প্রক্রিয়া গণযোগাযোগের ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান হয় যেখানে গণমাধ্যমগুলো বার্তা তৈরি করে এবং সরবরাহ করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে।

বর্তমানে কেবল টেলিভিশনের যুগে হাজারো চ্যানেলের মাধ্যমে বার্তার জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং তা সরবরাহ করা হচ্ছে যেখানে লক্ষ্যবস্তু বা জনগণের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনের যথার্থ সুযোগ খুবই কম।

অধ্যাপক মেলকোট এবং স্টিভস খুবই সুচারু ভঙ্গিতে বলেছেন, “Given the sheer volume of messages transmitted by the mass media and broad access, expecially in societies with market economics, early theories assumed that mass media had considerable power to inform and influence.”[346] অর্থাৎ এখানে বার্তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বাজার দখল, যেখানে বার্তার বাজারমূল্য চড়া এবং বার্তার বিষয়কেও সেই বাজারে চড়ামূল্যে বিপণন করা যাবে।

সন্দেহাতীতভাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল সমাজভূক্ত বাজারগুলো হল লক্ষ্য, যেখানে বাজার দখল করতে পারলে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের চক্ষু-বিস্ফারিত বিকাশ তৃতীয় বিশ্বের সমাজ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বাজারগুলোর রাতারাতি চেহারা পাল্টে দিয়োছে। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিন ফ্যাক্স মেশিন প্রভৃতি একদিকে যেমন বার্তার গতি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করেছ

---

346 Professor Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, উদ্ধৃতিঃ অধ্যাপক এস.আমিনুল ইসলাম, Dbœqb c¨v‡c¨ÿZ mgvRweÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

অন্যদিকে বিশেষত গ্রহীতার সংখ্যা বা পরিমাণ শুরুতে অনেকটা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সমাজ ও জনসংখ্যার বিচারে গ্রহীতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি খুব আশাপ্রদ নয়। এর মূলে রয়েছে সমাজের সার্বিক অনুন্নতি, অব্যবস্থা এবং সংগঠিত অবস্থা। এমতাবস্থায় সমাজের চরিত্রানুযায়ী উন্নয়নের গতির হার বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন নাকি গণমাধ্যমের উন্নতির বা প্রচারিত বার্তার বা চরিত্র অনুযায়ী সামজের চরিত্র বদলের অসম/বিষম প্রচেষ্টা কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়? তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলো আজ এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে এককথায় দিশেহারা।

যাহোক সমাজবিজ্ঞানীরা এযাবৎকাল মূলত বার্তার সরবরাহ এবং সমাজে এরর প্রতিফলন এবং প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বই বিশ্লেষণ করেচেন। সেই অভিমুখে প্রতিনিয়ত তৈরি হয়েছে সমকালীন গণযোগাযোগের তত্ত্ব। এছাড়াও জ্ঞাপন পরিবেশের ক্রমজটিলতার ধারাবাহিক বিশ্লেষণেও রয়েছে নতুন তত্ত্বসমূহ, যা মূলতা গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান শক্তি, ক্ষমতার মূল্যায়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এর ফলে সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব এবং কর্তৃত্ব এই দুই পরিচয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অধ্যাপক মেলকোট ও স্টিভস বলেছেন, “Setting an agenda for public discourse; influencing public opinion, persuading or educating in the context of planned camepains; providing role models for children and others to imitate, providing varied gratifications that may meet the audience needs, and cultivating audiences perceptions of society, in a manner more consistent with media content than statistical reality.”[347] অর্থাৎ শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং নতুনতর গণমাধ্যমই নয়, সার্বিকভাবে একটি পরিকল্পিত প্রচারসর্বস্বতা সামগ্রিক গণমাধ্যমে চালানো হচ্ছে সমাজকে ইচ্ছেমত গড়ে তোলা এবং সমাজে আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে কতগুলো প্রায় অতিসামাজিক মডেল বা icon তৈরি করা, যাকে তারা অন্ধের মতো অনুসরণ করবে। সঙ্গে চলছে অকল্পনীয় বিনোদনের প্রবাহ যা ক্রমশ সমাজের অভ্যন্তরে মূলগত শিক্ষা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ডেনিস ম্যাকুয়েল (১৯৯৪) বলেছেন যে, “এই পরিবর্তন বা নয়া বৈশিষ্ট্য সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, গণমাধ্যমের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বিনোদনের মাত্রা

---

[347] Professor Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, উদ্বৃতিঃ অধ্যাপক এস.আমিনুল ইসলাম, ÔeKvqb cÖi‡cÖÿZ mgvRweÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

এবং বৈশিষ্ট্য"। ফলে সামজগুলো বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোর ভোগ বা উপভোগ করা ছাড়া কোনো কিছুই করণীয় থাকছে না।

সমাজবিজ্ঞানীরাও সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ারও বিশ্লেষণ করেছেন যথেষ্ট। অনেক সমালোচকই যোগাযোগতত্ত্বের রৈখিক বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, রৈখিক তত্ত্বগুলোতে সমাজের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোনো প্রভাব নেই। এই শিবিরের সমালোচক জে. কেরি তাঁর Communication as Culture: Essays on media and society গবেষণায় বলেছেন, গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সমাজের সংস্কৃতির বা ঐতিহ্যের এক সুষম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।[৩৪৮] তথ্যসরবরাহ এবং তথ্যের নিঃসৃত অর্থের মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের এক সম্ভাবনার সন্ধান করেন। আসলে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি, পরিচালনা এবং ব্যাখ্যা এই তিনটি ধারাবাহিক পর্বের উপর নির্ভর করে। এই পর্যায়ে "the processes and institutions of communicaiton, of culture and of development are woven together." অধ্যাপক মেলকেট বলেছেন গণযোগাযোগ প্রক্রিয়াকে শুধু তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবাই যায় না।[৩৪৯]

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সভ্যতার বিকাশ বা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিতির সাথে সাথে গবেষকরা আরও একটি বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা হল 'Communicaiton process reestablishes hegemonic values and priorities in society.' (Carey)। সমাজে এই অযাচিত কর্তৃত্বের মূল্যায়নের প্রাথমিক ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। পরে এর বিশদ আলোচনা করা যাবে। গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় নয়াকর্তৃত্ববাদকে প্রত্যক্ষ করা কিছু পরিমাণে মুশকিল এবং এই প্রক্রিয়া জনগণকে চূড়ান্ত প্রভাবিত করতে পারে কারণ বেশিরভাগ শ্রোতা বা দর্শক প্রেরিত বার্তার অভ্যন্তরে নিহিত বক্তব্য সঠিক মাত্রায় মূল্যায়ন করতে পারেন না ফলে কোনো বাধা ছাড়াই বার্তা এবং তার মধ্যে নিহিত ভাবটি জনমানসে প্রবেশ করতে পারে এবং বিনাবাধায় প্রতিষ্ঠিত

---

[348] J. Keri, Communication as Culture: Essays on Media and Society, New York: 1998, p.46

৩৪৯. Gilbart Achcer, *The Globalization of Rezistance: The Militarization of the World and the New Conditions for Peace*, London: 2003, p.174-175

হয়। এজন্য অন্তহীন বার্তার পরিমাণ ও স্রোত দায়ী। ফলে সমাজের মূলস্রোতের যাবতীয় বিষয়ের বাইরেও অন্যান্য তথাকথিত বিকল্প বিষয়গুলো মূলস্রোতের বিষয় বলে গৃহীত হতে থাকে এবং এইভাবে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বা তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে যা সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থেকে সমাজকে পুরোমাত্রায় প্রভাবিত করতে পারে। এরজন্য গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে গণমাধ্যম প্রেরিত বার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই যথেষ্ট।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মেলকোট এবং স্টিভস বলছেন, Exposure alone provides an important consciousness-raising function that may challenge hegemony."[350] কিন্তু যেখানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করার এক অতি অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হবে সেখোনে ইতিমধ্যেই বহুজাতিক শিল্পসংস্থা, বিশ্বরাজনীতি এবং উন্নতদেশগুলোর দখল স্থাপিত হয়েছে। ফলে ঘটনার উপর না পরিপ্রেক্ষিতের উপর, বিবাদ না ঐক্যের উপর ব্যক্তিসত্তা না সামাজিক সত্তা, কার উপরে গণমাধ্যম নজর দেবে এই প্রশ্নগুলোর উপরেই যাবতীয় আধুনিক গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে যেখানে সাংবাদিকদের ভালো খবরের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা, খবরের আর্থিক মূল্য খবরের প্রাসঙ্গিকতা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত বা পরিবেশিত হয়। Hegemony বা আধিপত্যবাদের এই প্রকাশের উদাহরণ স্বরূপ সমাজবিজ্ঞানী কে. স্ট্যাড বলেছেন যে, উপনিবেশের যুগে আফ্রিকাতে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের Tribe বা উপজাতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য যাদের বসানো হয়েছিল তারা কেউ সাধারণভাবে সেই গোষ্ঠীর স্বাভাবিক নেতা নির্বাচিত হননি অর্থাৎ এক নয়া আধিপত্যবাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর মনোনীত লোককেই সেই গোষ্ঠীর বা সমাজের নেতা নির্বাচন করা হত। এর ফলে প্রজাবৃন্দকে শাসক ইউরোপিয়ানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ঘটানো হত এবং তাদের মানতে বাধ্য করা হতো। ভারতবর্ষও উপনিবেশ যুগের এই প্রথার ব্যতিক্রম নয়। তথাকথিত আধুনিকতার নামে dominant ideology বা প্রভাবশালী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠার এহেন প্রয়াস বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনায় সঠিক এবং যথোচিত শব্দচয়নের দ্বারা ঘটনাকে আড়াল করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিশেষনীতি এবং শক্তিশালী জনসংযোগর চাপ যথেষ্ট পরিমণে অব্যাহত। মূলত সেই কারণে ১৯৯৪ সালে

---

[350] Professor Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, উদ্বৃতিঃ অধ্যাপক এস.আমিনুল ইসলাম, Ôekvqb cwi‡cÖwÿZ mgvRweÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

হুতু বাহিনীর আফ্রিকায় ওয়াভাবাসীর উপর যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডের পরেই আমেরিকা গণহত্যা বা Genocide কথাটি ব্যবহার করতে দিতে চায়নি। মেলকোট যেমন বলেছেন, ধরা যাক তৃতীয় বিশ্ব বা Third world। এই শব্দের বা শব্দগুচ্ছের একটি বিকল্প শব্দ হল 'অনুন্নতবিশ্ব'। কিন্তু এই বিকল্পের বদলে যদি 'অত্যাচারিত' বা 'শোষিত' বা অসংগঠিত বলা যায় তাহলে এই শব্দগুলোর প্রয়োগমাত্র যে কোনো বার্তার চেহারা বদলে যায়। তাই dominant ideology এবং hegemony-এর চাপে বা উন্নত বিশ্বের অতিব্যবহারে ফলে উন্নয়নশীল বা developing শব্দটি গৃহীত হয়েছে শুধু তাই নয়, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে সমাদৃত হয়েচে। ১৯৯৪ সালে এ. এ. মেমেকা তাঁর Communicating for Development' বইয়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন 'এমনকি বর্তমানে বিশ্বে 'Peasant' কথাটি সাধারণভাবে চাষী হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যবহারের যোগ্যতা হারিয়েছে। এর প্রতিশব্দ হিসেবে যেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো Poor, oppressed, marginalized, disadvantaged, peripheral, exploited, neglected, vulnerable, underpiviledge প্রভৃতি। এমনকি development starved শব্দ গুচ্ছটিও ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৫১] অর্থাৎ এর দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমানিত যে কীভাবে dominant ideology গণযোগাযোগ বা যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে তথাকথিত অনুন্নত সমাজগুলোতে প্রভাব বিস্তার করছে। অধ্যাপক জেমস ইয়েল বলেছেন, "I believe, to regard the effects of communicaitons technology and the flow of symbolic imagery as fully one -sided and exploitive in favour of dominant institutions, ideologies, and cultures.[352] সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক থমসনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক ইয়েল বলেছেন যে, dominant ideology এবং hegemony বাস্তবিকই অস্তিত্বসম্পন্ন এবং তারা জনমানসে যে কোনো অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি যে কোনো বার্তা বা খবরের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমাজে বা বিশ্বে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুশি করতে যে কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা সংস্কারের সূচনা করতে পারে। তবে অধ্যাপক ইয়েল একথাও বলেছেন যে, "Not every assumption of hegemonic power by the underclass is a sign of submission

[351] A. A. Memeco, *Communicating for Development*, New York: 1994, p.66

[352] Professor Jems Yall, *Political System of the World*, ibid, p.102

and not every rejection is resistance. Not everything that comes from above represents the values of the dominant class. Some aspects of popular culture respond to logics other that the logic of domination."[353]

যদিও এই গবেষণায় উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের প্রস্তাবিত বিশ্বায়ন তত্ত্বের অনুধা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ঘটনাবলি এবং তার সাম্প্রতিক প্রভাবের কথা মাথায় রেখেই dominant ideology-এর আলোচনা করা হয়েছে। অন্যথায় উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে খুব বেশি বির্তক থাকার কথা নয়। জনপ্রিয় সংস্কৃতির বা Pop-Culture-এর ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিটলসের কালজয়ী মতমাতানো পপ গান বা হ্যারিবেলাফন্টির কালজয়ী গান, অথবা হোসে সারামাগো বা গুন্টার গ্রাসের রহস্যভেদী সমাজদর্শন কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভি. এস. নাইপালেরর নস্টালজিক সাহিত্য বা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের উন্নয়নমূলক বা কল্যাণমূলক অর্থনীতি সমাজের প্রভাবশালী আদর্শে রূপান্তরিত হতেই পারে। কিন্তু আমাদের আলোচনায় dominance কথাটি আরও বৃহৎ পরিধি সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। একদিকে পশ্চিমা তথাকথিত পপ সংস্কৃতির বিশ্ব পরিবেশন বা আক্রমণ অন্যদিকে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি, উভয় ক্ষেত্রে প্রধানবার্তাই হল বিশ্বজোড়া এক সমীভূত সংস্কৃতির প্রচার। অথচ Popular বা পপ কথাটির ভাবটি কিন্তু কখনই বিস্তৃতি, মূলস্রোত, dominant এবং বাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে মোটেই সদা-সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ল্যাটিন আমেরিকাতে সাধারণ মানুষের সৃষ্টিধর্মিতা বা লোকসৃষ্টির উপরেই এই পপ সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে তৃতীয় বিশ্বে গণমাধ্যম বাহিত, প্রচারিত নব্য সংস্কৃতির নাম পপ-কালচার।

১৯৮৩ সালে সমাজবিজ্ঞানী ও'সুলিভান যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক একটি সামাজিক অবয়ব তৈরি করেন সেখানে তিনি বলেন, 'গণযোগাযোগ' শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ভাবাই উচিত। কারণ এই শব্দটি একটি প্রক্রিয়ার দিকে অর্থনির্দেশ করে কিন্তু এর ব্যাপ্তি বা আকার বোঝা যায় না অপাতদৃষ্টিতে। কারণ mass শব্দটি একটি বিশাল অভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মিলনক্ষেত্র বলে মনে হয় যেখানে ব্যক্তিসমূহের সামাজিক বন্ধন, সমাজবদ্ধতা, মিলনক্ষেত্র বলে মনে হয় যেখানে ব্যক্তিসমূহের সামাজিক বন্ধন, সমাজব্দ্ধতা, কর্মোদ্যম সবকিছুরই অভাব আছে। তিনি এও বলেছেন যে, জ্ঞাপন শব্দটির মধ্যে দিয়ে

---

[353] Professor Jems Yall, *Political System of the World*, ibid, p.132

গণমাধ্যমের সামাজিক এবং প্রতিষ্ঠানগত প্রকৃতি বা দায়িত্ব থেকে আড়াল করা হয়েছে। উপরন্তু এমনভাবে বার্তা প্রদর্শিত বা শ্রুত হয় যাতে মনে হয় পারস্পরিক জ্ঞাপন প্রক্রিয়া ঘটছে।[৩৫৪]

এতৎসত্ত্বেও তিনি অবশেষে গণযোগাযোগের একটা যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। 'Mass communication is the practice and product of providing leisure, entertainment and information to an unknown audience by means of corporately financed, industrially produced, state regulated, high technology, privately consumed commodities in modern print, screen, audio and broadcast media."[355]

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে গণযোগাযোগ যে বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো হল ঃ

ক) গণযোগাযোগের audience একেবারেই অজানা এবং অপরিচিত।

খ) গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদিত, সরকার নিয়ন্ত্রিত। এতে ব্যক্তিগত দ্রব্য হিসেবে প্রেরিত বার্তাকে ব্যবহার করা হয়।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহের যদিও অনেক আধুনিক রূপান্তর ঘটেছে তবুও বৈদ্যুতিক মাধ্যম এবং কম্পিউটারের সমাজ দখলের পরে হয়তো বিশ্লেষণ আরও কঠিন এবং জটিল হয়েছে। তবু corporatization of communication বা জ্ঞাপনে বাণিজ্যসর্বস্বতা নিয়ে যে বাস্তব ছবি এই সংজ্ঞায় ফুটে উঠেছে তাকে কোনোমতোই অস্বীকার করা যাবে না।

১৯৮২ সালে জেমস কুরান গণযোগাযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের পরিধির বাইরের জ্ঞাপন প্রক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করেছেন। যেমন গির্জা স্থাপত্য, শিক্ষা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মুদ্রা, প্রথা এবং আরও সমগোত্রীয় প্রক্রিয়াকে তিনি নির্দ্বিধায় গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া বলেছেন। অবশ্য সমাজের উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোর দ্বারা গণযোগাযোগ প্রক্রিয়াই সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। অর্থাৎ গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সাধারণ গণমাধ্যমই একমাত্র হাতিয়ার নয় ফলে গণযোগাযোগের সঙ্গে গণমাধ্যমকে এক এবং অভিন্ন করে ফেললে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হবে না।

---

৩৫৪. Frasoan Huter, *The Globalization of Resistence : The Social Dimention*, London: 1998, p.28-29

355 ড. মো. আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া, ‖ekv/qb, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

প্রায় একই বা সমভাবাপন্ন ব্যাখ্যা ১৯৮৬ সালে তাঁর 'The multiplication of the media' প্রবন্ধে আমবার্তো ইকো দিতে চেয়েছেন, "Once upon a time there were mass media, and they were wicked of course, and there was a guilty party. Than there were the virtuous voice that accused the criminals. And Art (ah, what luck) offered alternatives, for those who were not the prisoners of mass media."[356]

অধ্যাপক লোরিমারের মতে, গণযোগাযোগ এবং গণমাধ্যম যে একই জিনিস নয়, বা গণযোগাযোগের পরিধি যে আরও অনেক বড় তা বোঝানোর লক্ষ্যেই এই অবতারণা।

অধ্যাপক রাওল্যান্ড লোরিমার গণমাধ্যমের গবেষণার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম বা second order-media-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে গণযোগাযোগের গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তিনি 'রোলিং স্টোন' নামক বিশ্ববিশ্রুত 'পপ' গোষ্ঠীর উদাহরণ তুলে বুঝিয়েছেন যে, তৃতীয় বিশ্বেও কোনো পর্যায়ে কাউকে না কাউকে রোল মডেল বানানোর প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বের ক্রিকেট পরিবেশকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার ক্রমোন্নতি গণমাধ্যমের product বা message বা বার্তা হিসেবে প্রেরিত হল দর্শকের কাছে। এর ফলে খেলিয়ে দেশের আঙিনা ছেড়ে ক্রিকেট গণমাধ্যমের, যথা টেলিভিশন, পত্রিকা, সংবাদপত্র, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রভৃতির মাধ্যমে যখন আন্তর্জাতিক প্রচার পেল তখন ক্রিকেটের আঙিনায় ঢুকল কর্পোরেট স্পনসরশিপ। এতে ক্রিকেট গণমাধ্যমের ফসল হয়েও আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের গণ মাধ্যমের কাজ করছে যার Product বা ফসল হল শচীন টেন্ডুলকার, ওয়াসিম আক্রাম, ব্রায়ান লারা কিংবা ফুটবলে একই প্রক্রিয়ায় রোনালদো, জিনেদিন জিদান বা লুই ফিগো। অথচ যথেষ্ট নামডাক হলেও ক্রিকেটের ফ্রাঙ্ক ওরেল বা ক্লাইভ লয়েড হতে পারেননি গণমাধ্যমের product কারণ গণমাধ্যম তখনও আজকের চেহারা পায়নি। না এখানেই শেষ নয়। অধ্যাপক লোরিমার দ্বিতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমের ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু আজকের শচীন টেন্ডুলকারের শরীর, ব্যাট, খেলা এবং অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত বহুজাতিক শিল্পসংস্থাগুলো

[356] Ambarto Eco, *The multiplication of the media*, London: 1986, p.23

বা স্পনসর যেভাবে পর্যাক্রমে ভাড়া নিচ্ছে তার ফলে শচীন টেন্ডুলকর নিজে তৃতীয় পর্যায়ের বা Third degree গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছেন। যদিও তাঁর অর্জিত রানের গণমাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো পুঁজি নেই তবু তিনি অন্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে পারেন বা বিক্রিতে সাহায্য করতে পারেন।

অধ্যাপক লোরিমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, With the existence of an ever increasing number of media, secondary media vehicles and a proliferation of technological froms and capacities we appear to be moving away from the mass media to a small set of information and entertainment products to most of society." বক্তব্যের পরের অংশটি বিশেষ লক্ষণীয়ঃ "We have created an extensive mass media system no longer simply aimed at the general agregate audience but which has a sufficient capacity to distribute variety of specialized information and entertainment packages directed at fragmented or segmented audiences, small groups whose shared characteristic is their media selection, small communities or interest but not of geography." [৩৫৭]

তাহলে একদিকে সমাজের ভাঙ্গন এবং এর ফলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সামজে ছোটো ছোটো দল বা উপদলের ক্ষণস্থায়ী গঠন এবং তাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের তদুপযোগী বার্তা প্রেরণ এবং তথ্য ও বিনোদনের সম্মিলনে একটি সংগঠিত রঙিন এবং যুগোপযোগী মোড়কে মোড়া অনুষ্ঠানের সূচি, অন্যদিকে সার্বিকভাবে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমায় সুরক্ষিত সমাজের ক্রমঅবলুপ্তি, একবিংশ শতাব্দীতে এই তত্ত্বই গোটা বিশ্বে dominant ideology বা সবচেয়ে প্রভাবশালী বা দমনমূলক আদর্শ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের সামনে। তাই অধ্যাপক সুলিভান তাঁর গণযোগাযোগের সংজ্ঞাটি কিঞ্চিৎ অদলবদল ঘটিয়ে আরও যুগোপযোগী করেছেন। বর্তমান সংজ্ঞাটি

---

৩৫৭. Patricia Adams and Lorence Solomon, *In the May of Progress : The Underside of Foreign Aid*, London: Arthscan Publications 1991, p22

এরকমঃ “Mass communication is the practice and product of providing information and leisure entertainment to a larege oftenly unknown and increasingly fragmenting audiences.” [৩৫৮]

অধ্যাপক সুলিভান আরও বলেছেন, একদিকে প্রযুক্তির উন্নতির সথে সাথে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় কতগুলো শর্ত যেমন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ, সরকারের গণমাধ্যম পরিচালনায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ, স্পনসরশিপ প্রভৃতি; অন্যদিকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তথ্যের সরবরাহ, রূপকল্পিত প্রতিমূর্তির স্বপ্ন, বিনোদন প্রভৃতি সাধারণভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য পরিবেশিত হয় এবং গণমাধ্যম বিবেচিত হয় সার্বিক গণযোগাযোগের প্রক্রিয়ার একটি অংশমাত্র।

উপরে উল্লিখিত গণযোগাযোগের সার্বিক বিবর্তনের পথে একবিংশ শতকে উত্তর আধুনিক পর্বে পৌঁছে মোটামুটিভাবে গণযোগাযোগের বিকাশের তিনটি অস্থায়ী শ্রেণিবিভাগ বা বিশেষ পংক্তি চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমনঃ

(ক) Totalist বা সার্বিকতা পন্থী

(খ) Fragmentaiton বা ভঙ্গুরতা পন্থী

(গ) Segmentaiton বা বিভাজন পন্থী[৩৫৯]

সার্বিকতা পন্থীর প্রবক্তারা হলেন মার্কসীয় সমাজতত্ত্ববিদগণ, যেমন রেমণ্ড উইলিয়ামস, আন্তোনিও গ্রামসি, লুই অ্যালথুসার এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব কমিউনিকেশনের অন্যতম নেতৃত্ব জুরগেন হেবারমাস এবং থিওডর অ্যাডোরনো প্রমুখ। এই শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি হল সমাজের প্রতিটি বিভাগকে বিবেচনার মধ্যে রেখে উন্নতির পথ পরিক্রমণ।

Fragmentation বা ভঙ্গুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা স্বভাবতই উত্তর আধুনিকতাবাদী বা Post modernist যাঁদের কাছে সমাজের এতদিনের ঐতিহ্যের কোনো মানে নেই বা সম্পূর্ণ নীতিগতভাবে সভ্যতা ও ঐতিহ্যবিরোধী।

---

৩৫৮. Edward S. Harman, *The Threde of Globalization*, ibid, p.744

[359] John Dawning, 1996

Segmentation বা বিভাজনপন্থীরা পুরোপুরি আমেরিকা প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গির ধারকবাহক। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তরা গণমাধ্যমকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে (ডাউনিং, ১৯৯৬) শুধু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে রাখার এবং গোটা গণযোগাযোগ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার শর্তের পক্ষে। পরিবার সংক্রান্ত, নারী সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, ধর্ম সংক্রান্ত (অবশ্যই সংখ্যাগুরুর প্রাধান্য মূলক) প্রতিটি ক্ষেত্রের বার্তা বা message, আলাদা আলাদাভাবে গ্রাহকের কাছে এঁরা পৌঁছে দিতে চান। এই শিবিরের প্রবক্তরা হলেন পল স্নিডার, মাইকেল মরগ্যান, ন্যান্সি সিগনোরিলি প্রমুখ।[৩৬০]

৬.২. সামাজিক আন্দোলনে গণযোগাযোগের ভূমিকা

সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের এবং উন্নতির ধারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মত প্রভাববিস্তার করলেও অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি এক জায়গায় জড়ো করলে যা দাঁড়ায় তা হল সমাজে develoment communication বা উন্নতিশীল যোগাযোগের সাধারণ অর্থ হল বেঁচে থাকার শর্তগুলোর উন্নতির প্রশ্নে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সঠিক প্রয়োগ। এই বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বেঁচেবর্তে থাকার শর্ত বা প্রক্রিয়াগুলোর উন্নতি ঘটাতে গেলে সমাজকে কয়েকটি প্রেক্ষাপটে পরীক্ষিত হতে হয় বা সমাজের কতগুলো প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে সমকালীন আধুনিকতার সঠিক প্রয়োগ।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আধুনিকতার মাত্রা এবং তৎসহ বিভিন্ন বিবর্তনের পর্যায়ে এর প্রভাবের অনুপাত মূলত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর বিবর্তনের উপর নির্ভর করে। এই বিবর্তনের প্রশ্নেই সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বারবার। গান্ধিজির অহিংস আন্দোলন থেকে মিখাইল গরবাচেভের গ্লাসনস্ত এবং পরবর্তীকালে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ধ্বংস পর্যন্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সার্বিক বিবর্তনের পথই সূচিত করে। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন কর্মসূচীতে দুটি স্রোত যাবতীয় কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। একটি চরমপন্থী স্রোত, অন্যটি অহিংস আন্দোলন। সাধারণত জনগণ চরমপন্থী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ না হয়েও গান্ধিজির ডাকে অভূতপূর্ণ সাড়া দিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের পরের ২২ বছরে অর্থনীতির ক্রমাবনতি এবং দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে গান্ধিজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেয়ার সময় বুঝিয়েছিলেন যে জনগণ দারুণ সাড়া দিলেও তাদের অহিংস

৩৬০. Edward S. Harman, *The Threde of Globalization*, ibid, p.746

আন্দোলনে বেঁধে রাখা যাবে না। মনে রাখতে হবে গণমাধ্যমগুলোকে এই সময় সরকারিভাবে সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোরাগোপ্তা গণমাধ্যমের প্রসার বা বার্তার প্রচার ভারতের ত্রিশকোটি মানুষের দরজায় আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে গিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতেই প্রায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় শুধুমাত্র মাধ্যমবাহিত বার্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। প্রায় অনুরূপ কিন্তু বিপরীতধর্মী ঘটনা ঘটেছিল মিখাইল গরবাচভের গ্লাসনস্তের ঘোষণার ক্ষেত্রে। সোভিয়েত সমাজ পশ্চিমা বক্তব্যের বা চিন্তার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে বাজার খুলে দেয়ার প্রক্রিয়ার বিশ্বায়নী ব্যবস্থাকে সামলে উঠতে পারেনি।[৩৬১]

মার্কিন সমাজের উন্মুক্তির ঢেউ সোভিয়েত সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তৈরি হল এবং প্রতিষ্ঠা পেল অন্যতর এক dominant ideology। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি সোভিয়েত সমাজ তৈরি ছিল না? সমাজতান্ত্রিক সমাজে অনুসৃত সামাজিক সাম্যের অভ্যন্তরে যে সংকট দেখা দেয় তাহল এক অন্তর্লীন অসাম্য, যাকে আধুনিক ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলা হয় Cognititive dissonance অর্থাৎ মানুষের অন্তরে সুপ্ত থাকা আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তার ফলে জমা অসন্তোষের উদগীরণ হল গ্লাসনস্তের পশ্চিমা খোলা হাওয়ায়, যার অন্তিম সমাপ্তি ঘটল সমাজতন্ত্রের পতনে।

"পার্সোনালিটি কাল্ট-এর উদগাতা বলে যে স্তালিনকে খুনি, শয়তান ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে পেরেস্ত্রৈকা বাজারে এল, সেই পেরেস্ত্রৈকাই কিনা আরেকটি পার্সোনালিটি কাল্ট-এর জন্ম দিল। কলকাতায় পার্কসার্কাস মোড়ের কাছে গির্জার দেয়ালে লেখা দেখেছিলাম, 'প্রভু যিশু আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে যাবেন-এ ঢেউ যে মস্কোর লাইনে গিয়ে আছড়ে পড়বে, তা আমি ভাবিনি। ক্রমেই একটা 'মিথ'-এ পরিণত হলেন মিখাই গর্বাচভ.... আবিষ্কার করলাম পেরেস্ত্রৈকা.... উপলব্ধি করলাম গ্লাসনস্ত। অনুভব করলাম। এই নতুন দুটি শব্দ আসলে 'স্তালিনিজমের' বিপরীতার্থক শব্দ.... দেখলাম এক নেতা (গর্বাচভ) কিভাবে 'ভগবান' হয়ে উঠলেন। জর্জিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে একদল আন্দোলন শুরু করল পেরেস্ত্রৈকার প্রভাবে, গর্বাচভের মিলিটারি বাহিনী তাঁদের ওপর গুলি চালিয়ে বহু জনকে হত্যা করল। এই সংবাদ খবরের কাগজ এবং টেলিভিশনে নিপুণভাবে প্রচারিত হল গ্লাসনস্তের

---

৩৬১. Patricia Adams and Lorence Solomon, *In the May of Progress : The Underside of Foreign Aid*, ibid, p22

প্রভাবে, ইয়ং কমিউনিস্টও 'ধর্মীয়'ক্রুশ গলায় তুলল প্রকাশ্যে পেরেস্ত্রৈকার খোলা হাওয়ার মদদে। সবই পেরেস্ত্রৈকার জন্য।[৩৬২]

এ যেন টকটকে লাল থোকা থোকা গোলাপ ফুল; শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জোতদারেরও ভালো লাগে আবার এক ভূমিহীন কৃষকেরও ভালো লাগে। Cognititive Dissonance শব্দগুচ্ছটির এর চেয়ে ভালো আর সস্তায় পুষ্টিকর উদাহরণ হয় না। এমতাবস্থায় সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রোনিক মিগরানিয়ান তাঁর gorbachev's leadership: A soviet View বইতে বলেছেন যে, "Unleashing freedom of communication in the glasnost era before making headway social movements and the ethnic and nationality confrontations which scarred the former Union and Eastern Europe thereafter. The point is important: in the U.S.A., especially, there is a powerful longstanding cultural optimism about the instantancous benefits of free speech."[363] অর্থাৎ হঠাৎ গ্লাসনস্তের হাওয়ায় গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার যাবতীয় তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে যাওয়ার উদগ্রীব বাসনায় সামাজিক ঘটমান ইস্যুগুলো মূল্য না পেয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জাতিগত বিদ্বেষ দাঙ্গা বিবাদ প্রাধান্য পেল। তিনি এও বলেছেন যে, পশ্চিমাদেশে বিশেষত আমেরিকার সমাজে যে বাকস্বাধীনতা এবং তার সাফল্যের প্রচার চালু ছিল তার দিকে সোভিয়েতভুক্ত জাতিগুলো হামলে পড়ল। যদিও এই মতের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক খোলাবাজারের সুফল আহরণের আশায় সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তায় বেঁচে থাকা মানুষগুলোর ঝাঁপিয়ে পড়া এবং অর্থনীতির ভাষায় অসম ঝুঁকি নিতে শুরু করার ঘটনাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজ ভাঙনের এক দশক বাদে আমেরিকার ঢালাও আর্থিক সাহায্যে রাশিয়ার গ্রোথ-রেট বা সামগ্রিক উন্নতির হার সামান্য বৃদ্ধি পেলেও সমাজের ভেঙ্গে যাওয়া সুষমগঠন আজও হয়নি। কেন হয়নি তার ব্যাখ্যা এখানে দেবার নয়, কিন্তু কোনো মতের বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সোভিয়েতের মানুষ অপেক্ষা করে ছিল? কোনো পুঁজিবাদী সমাজে বা খোদ আমেরিকাতেই কবে সাধারণ মানুষের মতামত গৃহীত হয়েছে? সিয়াটেলে বিপুল বিক্ষোভের পরও বিশ্বায়নের সার্বিকতার দিকে গণমাধ্যমে dominant ideology তৈরি হয়নি? পক্ষপাতশুণ্য দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বর্তমানে পুঁজিবাদী

---

362 সেলিনা জাহান, ami g‡¯'', কলিকাতাঃ ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ.২৭

363 Andronic Migraniyan, *Gorbachev's Leadership: A soviet View*,

দেশগুলোতেও গণযোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে একমুখী। গ্রহীতা বা audience বা জনগণের মতামত জানানোর কিছু অনুষ্ঠানভিত্তিক প্রতীকী সুযোগ ছাড়া পশ্চিমা সমাজ আর কোনো সুযোগ গণমাধ্যমকে দিয়েছে কি না, বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আমেরিকার সীমা পেরিয়ে বিশ্বের দখল নিতে অগ্রসর হয়েছে পশ্চিমা 'স্বাধীন' সমাজ, যেখানে সমাজে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও শ্রেণিবিচার নেই, অর্থনৈতিক সংকট এবং প্রভূত বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও তেমন আন্দোলন নেই, পরিবর্তে আছে নিরাপত্তাহীনতা, অসহিষ্ণুতা এবং খুনোখুনি ও সন্ত্রাস। তাহলে কিসের তাগিদে ভেঙ্গে পড়ল সোভিয়েতের অখণ্ড সমাজব্যবস্থা? অসোভিয়েতের স্বাধীন দেশগুলো কি তা অনুভব করছে?

সামাজিক আন্দোলন বলতে আমরা কি বুঝি বা আন্দোলন কাকে বলে? Andrew Arato এবং Jean Cohen তাঁদের 'সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিওরি' বইতে বলেছেন, সামাজিক আন্দোলন সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে বদলেছে। সামগ্রিকভাবে এই পর্যায়গুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ভাবে আন্দোলন বলতে বিরাট সংখ্যক জনগণের একত্রে সমাবেশ বোঝায়। দ্বিতীয়ত প্রচলিত গণমাধ্যমের সাহায্যে সমাজে প্রভাব বিস্তারের জন্য সম্ভাব্য পন্থা অবলম্বন করা। আর তৃতীয় পর্যায়টি হল সাম্প্রতিকতম।

এই পর্যায়ে " The collective identity of the participants and ....to establish what the factors are which lead people to define themselves as, and to continue to participate as, members of a given social movement.... contemporary social movements are conceptualized as an ongoing almost cyclical phenomenon and as an expression of sectoral, pragmatic discontent, by contrast ith what are defined as earlier movements."[364]

অবশ্য এখানে একটি বিষয় সংযোজন করা যায়। সমাজ এবং গণযোগাযোগের প্রযুক্তির বিবর্তনের ধারা একে অপরকে প্রভাবিত করতে করতে যে কোনো পর্যায়ে এক একটি উন্নয়ন পর্বের মুখোমুখি হয় যার পুরোভাগে থাকে সেই পর্বেরে dominant ideology। সেই উন্নয়নপর্বের সফল ব্যবহার এবং সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়াকেই সামগ্রিক অর্থে আন্দোলন বা movement বলা হয়।

---

[364] Andrew Arato and Jean Cohen, Civil Society and Political Theory

সমাজবিজ্ঞানী হেবারমাস আন্দোলনের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, "continuing dimension of the contemporary scene."

অর্থাৎ বিবর্তনের পথে সমকালীন দৃশ্যপটে বিবর্তনের মাত্রাকেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন বলা হয়। যদিও হেবারমাস এখানেই শেষ করেননি। তিনি বলেছেন, বিবর্তনের এই মাত্রাগুলো আমাদের জীবনে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সদা সর্বদা challenge জানাতে থাকে। যেমন একদিকে বিশ্বজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জের প্রথম বলি হয়েছে কার্লোস গিলানি। এও তো সমাজের বিবর্তন ক্রিয়ার ফলাফল বা পর্যায় যাকে সামগ্রিকভাবে ভিত্তি করে প্রতিটি সমাজ সমকালীন আধুনিকতার স্তরে উন্নীত হয়।[৩৬৫]

এই পর্যায়ে জ্ঞাপনের মূল হাতিয়ার হল সভ্যতার বিকাশ এবং সংস্কৃতির বুনিয়াদ যা সমাজের সমকাল এবং অতীত থেকে সম্পৃক্ত হবেই। সাম্প্রতিক বিশ্বের পশ্চিমী ইউরোপীয় আন্দোলনগুলোতে সমাজে শান্তি, পরিবেশের ভারসাম্য, পরমাণু বিরোধী এবং নারী আন্দোলনের বিষয়গুলো দারুণভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। এছাড়া বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলন আজও বিশ্বের মাটিতে ক্রমান্বয়ে সংঘঠিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলনগুলোতে কমিউনিকেশন বা গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া সমাজের সংস্কৃতির বৈচিত্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক subcultural exploration অথবা সংস্কৃতির বৈচিত্রের বিভিন্ন উপাদানস্বরূপ বিভিন্ন প্রথা, বিভিন্ন রীতি, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতি বৈচিত্র্যের এক সার্বিক অনুসন্ধান চালাতে থাকে। এই অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্যই হল সব উপসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সামগ্রিক collective awareness বা গণজাগরণের পর্যায়ে উন্নীত করা। ফ্রান্সিসকো আলবেরনী তাঁর 'মুভমেন্ট অ্যাণ্ড ইনস্টিটিউশন' বইতে বলেছেন যে, জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিবর্তনের ফলে প্রতিটি পর্যায়ে একটি মানুষ আর একটি মানুষকে চেনার নতুন পথ খুঁজে পায়।[৩৬৬]

অধ্যাপক ডাউনিং এই প্রসঙ্গটি খুব সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন "He coins the term the nascent state to denote the transitional condition in which individuals

---

৩৬৫. Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture,* Global Aproch Polity Press:2001, p. 5

[366] Fransisco Alberni, *Movement and Institution*, Menila: 2008, p.321

redefine themselves as members of a social movement, and discusses the importance both of the rediscovery of reviously hidden, denied history for social movements, and of the over powering experience that a new beginning is possible where truth is predominant rather that falsehood."[৩৬৭]

বাংলা তথা ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশের পথে সংস্কৃতির আন্দোলন এই সত্যের প্রক্রিয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির নবজাগরণের পথে যে সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে তাতে যাবতীয় ভারতীয় সংস্কৃতির সমষ্টির অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত এই subcultural exploration বা শাখাসাংস্কৃতিক অনুসন্ধান চলেছে যা সমাজের ভিত শক্ত করে চলছে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় বিশতকের শেষ দশকের পূর্ব পর্যন্ত এই ঘটনা অব্যাহত ছিল। এই পর্যায়ে উঠে এসেছে একের পর এক আদিবাসী সম্প্রদায়, যুক্ত হয়েছে সমাজের মূলস্রোতে এবং শত শত বছরের পরাধীনতা এবং অত্যাচারকে পেছনে ফেলে। ভারতবর্ষের সংবিধানে দেশের সব ভাষা, জাতি, ধর্ম, অনুশাসনে বৈচিত্র্য স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং অভিষিক্ত হয়েছে। তবুও এই আন্দোলন চলেছে অন্তহীন প্রক্রিয়ায়, কারণ সংবিধানের স্বীকৃতির বাইরেও আঞ্চলিক কর্তৃত্ব এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংঘর্ষ এখনও অব্যাহত।

ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনও ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতিগত উচ্চাসনের লক্ষ্যে সংঘর্ষ, ধারাবাহিক শ্রেণিসংগ্রাম, রাজনৈতিক আধিপত্যের সংঘর্ষ, রাজনীতি ও ধর্মের অসম সমন্বয়জনিত সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বেকারত্বের লড়াই এবং মানবিক অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম করার জন্য বারবার সমাজে আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আদর্শ হিসেবে প্রমাণ করানোর চেষ্টা চলেছে এবং পাশাপাশি প্রায় সহজাত প্রক্রিয়া হিসেবে চলেছে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের সংগ্রামও। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিবর্তনের সাথে সাথে এই আন্দোলনের চরিত্রের বদল ঘটলেও জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার শর্তে সমাজের উন্নয়নের বিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজে উদ্ভূত dominant ideology, hegemony এবং power দখলের লড়াই আজও অব্যাহত। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রশ্নে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জনমত গঠনে যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে সেই প্রসঙ্গে ফ্রান্সিসকো আল-বেরুনীর বিশ্লেষণে খুবই গ্রহণযোগ্য। তিনি এই প্রক্রিয়াকে Paradox of

367. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.35

incommunicability বলেছেন। যেখানে যোগাযোগকারীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে না, যে দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের স্বার্থ সম্বলিত। ফলে অসংঙ্গত উন্মাদনা যা সমাজের বাস্তবিক ক্ষতিসাধন করে। মাইকেল হ্যানচার্ড তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ব্রাজিলীয় সমাজজীবনে জাতিগত সমস্যাই মূল সমস্যা নয় বরং রাজনৈতিক এবং সভ্যতার সংগ্রামই সেখানে মূল কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সামগ্রিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকরণে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপাদানই মূল যাচ্ছে যে সামগ্রিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকরণে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপাদান মূল আলোচ্য হলেও গণমাধ্যমের বহিঃআধিপত্যের সুযোগে যেখানে জাতি সমস্যাকে মুখ্য করে দেখানো হচ্ছে অথচ সামাজিক উন্নয়নে যেখানে ব্রাজিলীয় জনগণের বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক পথ হাঁটার বাকি আছে।

ফলে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিবর্তন এবং জ্ঞাপন গবেষণার বিবর্তন যাবতীয় সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হয়ে আছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যে বিবর্তনের চিত্র এখানে অঙ্কিত হল তার সামাজিক উপাদানসমূহের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হব। একদিকে বিশ্বায়নের সামগ্রিকতার প্রভাব অন্যদিকে স্বাভাবিক এবং চিরাচরিত প্রথাভিত্তিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধিতা গোটা বিশ্বের সাম্প্রতিক সমাজগুলোতে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তার একটা প্রাথমিক বিশ্লেষণ এখানে করার চেষ্টা করা হল।

সমাজতত্ত্ববিদ রাওল্যান্ড লোরিমার অত্যন্ত সরলভাবে বুঝিয়েছেন, সমকালীন বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তথ্য বা বার্তার মুক্ত প্রবাহের তত্ত্ব কীভাবে বাজারিকরণের পথে ক্রমাগত নিজের রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। এই বাজারিকরণ আসলে কোনো স্বাভাবিক বিবর্তন নয় বরং একদিকে শিল্পোন্নত বিশ্বের কৌলিন্য-সংকটের খবর তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশে প্রযুক্তিবাহিত হওয়ার প্রশ্নে মর্যাদাহানিকর আশকা, অন্যদিকে সারা বিশ্বব্যাপী তথ্যচক্রের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করে সোজা কথায় ব্যবসা করা। এইদুই বাজার-কুটনৈতিক তত্ত্বধারার মাঝখানে শুধু তথ্যপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণই নয় বরং তথ্যবিষয়ের নিয়ন্ত্রণও ক্ষমতাশালী বিশ্ব পূর্ণমাত্রায় করে চলেছে। এই প্রক্রিয়াকরণের বিপরীতে অনেকেই মার্কিন গণতন্ত্রের উদাহরণে সংবিধানের প্রথম সংশোধনকালে মুক্ত সংবাদজগত কায়েমের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করার চেষ্টা করেন। অথচ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এখনও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নামেও ব্যবসা চলে। আবার তৃতীয় বিশ্বের দ্বারে শিল্পোন্নত যে কোনো খবরের প্রবাহই বড় একমুখী। যেমন তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ সমাজবিবর্তনের দিকে নজর রাখলে সংবাদজগতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে অথবা সংবাদজগতের মুক্ত কতগুলো উপাদান নেহাতই অভিন্ন। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক এবং আইনগত নিয়মকানুন বা আন্তর্জাতিক

বিধিনিষেধের অনুশাসন ছেড়ে দিলেও আরও কতগুলো সমাজিক প্রথানিয়মে এতদিন থাকতে হয়েছে সংবাদজগতকে, তা সে আদর্শের কারণেই হোক, কি ব্যবসার কারণেই হোক। এই নিয়ম প্রথাগুলোকে সমাজ মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খানিকটা সঠিক বিশ্লেষণ করা যায়। মনে রাখতে হবে এটি প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বের বিষয়।[৩৬৮]

(১) খবরের বস্তুনিষ্ঠতা (objectiveity) এবং সত্যতার মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজনটি অনেকসময় গুলিয়ে ফেলা হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সত্য পরিবেশনের আবেগে সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে খবরটির গুরুত্বহানি ঘটে। আবার প্রতিবেদকের বিশ্লেষণাত্মক মানসিকতার অগভীরতার কারণে সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি ও খবর পরিবেশনের যৌক্তিকতা নষ্ট হয়। তবে প্রকৃত সমাজনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে খবরকে সতর্ক বর্ণনারও অনেক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) সংবাদজগতের নিরপেক্ষতা আর দেশপ্রেমের মধ্যে যতটুকু জায়গা আবেগ আর যতটুকু জায়গা ব্যবসা অধিকার করে রেখেছে, তার একটা সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ জরিপ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে প্রত্যেকটি সামজিক ঘটনার তীব্রতার বা মাত্রার উপরে একদিকে যেমন তার ভবিষ্যত নির্ভরশীল তেমনি অন্যদিকে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থও নিহিত থাকে।

যেমন এ অীভযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে 'কাশ্মীর' সমস্যার ক্ষেত্রে ভারতের সংবাদ জগতের খবর এবং পাক সংবাদমাধ্যমের প্রেরিত এবং উপস্থাপিত খবর পরস্পরের দেশীয় স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ। এর ফলে কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত চিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও ভারত দখলভুক্ত এবং পাক দখলীকৃত কাশ্মীরের জনগণের ভারতীয়ত্ব এবং পাকমনস্কতার প্রকৃত চিত্র বোধ হয় দুটি দেশের জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে Fourth estate হিসেবে সংবাদজগতের একটি প্রকৃত অবস্থান নির্ণীত হওয়া স্বাভাববিকভাবে জরুরি।

(৩) সংবাদজগতের সামজিক অবস্থান ও তার ব্যবসায়িক আদর্শ-এই দুইয়ের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কিছু অতিরিক্ত মানবিক কর্তব্য পালন অথবা না পালনের প্রশ্ন থেকে যায়।

শিল্পোন্নত বিশ্বে সামাজিক অবস্থান ও ব্যবসায়িক আদর্শ একেবারে সমার্থক শব্দগুচ্ছ হওয়ার ফলে এসব ঝামেলাই নেই, কারণ সেখানে জীবনের সবকটি সামাজিক উপাদান বা উৎপাদকের প্রতিটি অনুক্ষেত্রও

---

[368] Rawland Lorimar, *Mass Communication*, Manchashter University Press: 1998, p.10

এখানে পণ্যায়িত এবং স্বভাবতই বিক্রয় বা ক্রয়লব্ধ বস্তু হয়ে গেছে। এখানে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের মাটিতে এই প্রক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় শুরু হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। যেমন প্রস্তাবিত বা নির্মীয়মাণ পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতিষ্ঠানিক পত্তন হয়ে গেলেও এর প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হবে, অর্থাৎ কার্যত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্ররা এই কেন্দ্রের, বেকারত্বসহ সামাজিক সমস্যাবলির খবর পরিবেশিত হয়, তবে তারও আঞ্চলিক ভিত্তি হিসেবে আঞ্চলিক বাজারে বিক্রয়যোগ্য থাকার ফলে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর সেদিকে নজর দেয়ার কারণও আছে। আর সেটা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। তবে এর পরেও দেশিও সমাজবিবর্তন প্রক্রিয়ার গতির অভিমুখে দাঁড়িয়ে সংবাদজগতে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নিতান্তই সমাজহিতকর। পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকটি সমাজের এই বিশ্লেষণের সাহচর্য প্রয়োজন। অহেতুক পৃষ্ঠপোষণ বা সমালোচনা নয়, আবার অন্তত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই নিজ দেশীয় ভিত্তি থাকাটা অন্যায় নয়, আর তাকে অন্ধ দেশ প্রেমের আবেগের মাপকাঠিতে বিচার করাও নেহাতও অযৌক্তিক।

(৪) সংবাদজগতে প্রযুক্তির বিস্ফোরণে বহুক্ষেত্রে তার গণযোগাযোগ তত্ত্বেরও নতুন আঙ্গিকে পুনর্বিন্যাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্প্রসারণের ভিত্তিতে যে কোনো ঘটনা-খবরকে নতুন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতির নিরিখে তাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা দানের কাজটি বর্তমানে গণমাধ্যম ও সংবাদজগতের কাছে নিতান্তই সহজ কাজ। যে কথা রাওল্যান্ড লোরিমার বলেছেন যে, মার্কিন গণতন্ত্রই সংবাদজগতকে চূড়ান্ত স্বাধীনতাদানের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে পথিকৃৎ। কিন্তু এই গণতন্ত্রের নমুনাতেও কালির দাগ লেগেই চলেছে।[৩৬৯]

জর্জ ডব্লিউ বুশের নির্বাচনের সময় এক ফ্লোরিডা শহরের নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিত করতেই প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে অচলাবস্থা বিদ্যমান থাকে। এর পাশাপাশি মনিকা লিউইনস্কি কেলেঙ্কারিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের স্বীকারোক্তি এবং স্ত্রীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ইত্যাদি ঘটনা পেরিয়ে ইরাক আক্রমণের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মার্কিন গণমাধ্যম এসং সংবাদজগত কোন জাদুকাঠিতে এতটা দেশভক্ত আচরণ করতে পারল? এই কি স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের নমুনা? আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ঘটনা সামাজিক দায়বদ্ধতার বা দেশের সীমানা এবং অভ্যন্তরীণ সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের নিরিখে বিচার করা হত। যদিও গত বারো-তেরো বছর ধরে এর পরিবর্তন ঘটেছে। খোদ ভারতবর্ষে যতগুলো সরকারি স্তরে

---

369 Ayubur Rahaman Bhuiyan, 'Globalization and its impact on growth, Trade and Industrial Policies in Bangladesh' *Social Science Review,* Dhaka University, vol. 15, No. 3, 1998, p.45

কেলেঙ্কারি বা সরাসরি চুরি, জালিয়াতির ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিণতিতে এইকাজে লিপ্ত কোনো জনপ্রতিনিধিকেও আদালত বা অন্য কোথাও কোনো অসুবিধার মুখে পড়তে হয়নি। যাহোক প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে তৃতীয় বিশ্বে সংবাদ মাধ্যমে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার বিশ্লেষণের আঙ্গিকে বদলে দিয়েছে। পরিবর্তন করেছে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা এবং দৃশ্যায়নও। গুজরাটে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক গণহত্যার প্রকৃত খবর প্রেরণ সরকারি বা দলীয় স্তরে নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও যতটুকু ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে তারপরেও পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এবং সরকারি স্তর থেকেও প্রযুক্তির পাল্টা ব্যবহার পরিস্থিতিকে অনেকটাই জলবৎ করে দেয়া সম্ভব হয়েছে। গোটা ভারতের সংবাদ মাধ্যমের একাংশের ঢালাও সম্প্রচারের কাধে ভর করে নরেন্দ্র মোদী একচ্ছত্র ক্ষমতার নিদর্শন দেখিয়ে নির্বাচনটিও জিতে গেল। প্রযুক্তির বিস্ফোরণে আমাদের পৃথিবীবাসীকে উপসাগরীয় যুদ্ধ সরাসরি সংবাদমাধ্যমে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। এ মাধ্যম তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক-আর্থিক সমস্যাবলি সম্পর্কে শুধু অবহিতই করছে না, প্রথম এবং শিল্পোন্নত বিশ্বের সামাজিক সুযোগসুবিধার সঙ্গে তুলনা করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তফাৎটা কোথায়। আর 'কোথায়'-এর খোঁজ করতে গিয়ে আমাদের যে কর্মকাণ্ড তার প্রচার কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে কম। এ কোনো তত্ত্ববিশ্লেষরে সমস্যা নয়, এর মধ্যেকার ব্যবসায়িক স্বার্থের বাইরেও তৃতীয় বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য দিতেই হবে। নয়ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একে সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিন্তু কিছু বলা যাবে না।[৩৭০]

(৫) সংবাদমাধ্যমে সতর্ক প্রহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনার সময় বোধহয় হয়েছে। বিশ্বায়নপর্বে সংবাদমাধ্যমের বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই গেট কিপিং-এর শাস্তি কিন্তু ভয়ানক হতেই পারে। লোরিমারের বক্তব্যে তার প্রমাণ মিলতে পারে "More recent examples of similar distortions of reality can be identified in the western press: the reporting on Saddam Hussain and Iraq prior to and following the Gulf War, which transformed Husssin from a friend to a enemy"[371] তবু শিল্পোন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব খবরের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট কি তৃতীয় বিশ্বে পাওয়া যায়?

---

370 আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ও আকাশ ও বিহঙ্গ, ঢাকা: ডাইজেস্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃ.২৯

371 Rawland Lorimar, *Mass Communication*, ibid, p.107

(৬) প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সংবাদের চিরাচরিত নৈকট্য সম্বন্ধীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ধরনের খবরই একদিকে যেমন সহজলভ্য তেমনি মূল্য অনেক চড়া। তবে দেশীয় ক্ষেত্রে সংবাদের নৈকট্যের চিরাচরিত ধারণা এখনও তেমন বদলায়নি। গোটা বিশ্বজুড়েই বিশেষত দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেভাবে সংবাদপ্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশগনগুলোর প্রভাব বাড়ছে তাতে অর্থনৈতিক কেন্দ্র বিশেষত অদূর ভবিষ্যতে নতুন করে বিবেচিত হবে।

(৭) সংবাদ জগতে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন এবং বিশ্বপ্রভূদের ক্রমবর্ধমান মালিকানা এর স্বাধীনতায় নতুন মাত্রা এনেছে। যেমন কেনিচি ওমে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বায়নপর্বে অর্থনৈতিক মানচিত্র আঁকার সময় স্বভাবতই প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস, নদীপথ, সমুদ্রপথ, রেলপথ এবং জাতীয় সীমানা অঙ্কিত হয়। কিন্তু আজকের মহাজাতিক শিল্পায়ন পর্বে সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম ক্ষমতার উপর এবং সেখানে যেখানে উপগ্রহের নেটওয়ার্ক পৌঁছেছে সেই অনুযায়ী সীমানা অঙ্কিত হবে। তিনি বলেছেন, "Information has replaced both propinquity and politics as the factor most likely to shape the flows of economic activity. Physical terrain and political boundaries still matter, of course, neither--and especially not political boundaries--matters as much as what people know or want or value."[372]

সারা পৃথিবীকেই অথবা পৃথিবীর যে অংশে তারা 'capitalist industrial centre' বা পুঁজিবাদী কেন্দ্র তৈরি করেছে তার ভিত্তিতে সংবাদ জগতে খবরের পরিসীমা নির্ধারিত হবে। ফলত গোটা পৃথিবীতে এই রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক convergence বা কেন্দ্রবর্তিকা এবং মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর সংবাদজগত, সংবাদমাধ্যম এমনকি বেশকিছু ক্ষেত্রে সংবাদ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এমন পর্যায়ে আমরা এখনই লক্ষ করছি যে, তার মধ্যে থেকে কতটা স্বাধীন অস্তিত্বের মাত্রা নিরূপণ করা যাবে তা সঠিক বলা যাচ্ছে না কিছুতেই। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রযুক্তিক্ষেত্রে তথা তথ্যপ্রযুক্তিক্ষেত্রে সিলিকন থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত পুরো শিল্পচক্রই শিল্পবাহিনী অধিকার করে রেখেছে তাই নয়, গোটা বিশ্ববাজারও

---

[372] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.41

দখল করে ফেলেছে। যেমন ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যেকার যাবতীয় তথ্যসরবরাহের নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম হল মার্কিন সার্ভার।

গবেষক এভারেট এম. রজার্স এবং অরবিন্দ সিঙ্ঘল প্রণীত 'India's Communication Revolution' রচনায় তাঁরা বলছেন, "The U.S. hegemony of the Internet is complete, as it owns most of the networking and bandwidth infrastructure, controls most of the interntet's R & D initiatives, and directs site content. Will this dominance be challenged as sometime in the future?"[373]

নতুন গণমাধ্যমের উৎপত্তি ও বিকাশের সবকটি পথই দখল করে রেখেছে মার্কিন মুলুকের মহাজাতিক শিল্প-কর্পোরেশনগুলো। তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বজুড়ে সংবাদ জগতে এক নয়া আধিপত্যবাদের প্রকাশ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ঘটেছে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও এর বহুমাত্রিক প্রভাব লক্ষিত হচ্ছে।

(৮) সংবাদজগতের স্বাধীনতার জন্য যত প্রয়াশ আজ পর্যন্ত ঘটেছে তার মধ্যে উন্নতিশীল বিশ্বের উদ্যোগে 'ম্যাকব্রাইড' কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বজুড়ে গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যে আধিপত্যবাদ ইতোমধ্যেই কায়েম হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই UNESCO-এর নেতৃত্বে এই কমিশন ১৯৭৮ সালে ৩১২ পাতার এক রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৭৬ সালে কোস্টারিকায় এই সম্মেলন প্রথমবার হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়।[৩৭৪]

মূলত দুটি প্রধান মডেলের উপর দাঁড়িয়ে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) জাতীয় বাস্তবতা, চিন্তা চেতনার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকারের সংরক্ষণের ভিত্তিতে যোগাযোগনীতি নির্ধারিত হবে।

(খ) সামাজিক সংহতির প্রশ্নে জাতীয় সমষ্টি-সত্তা সামাজিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া পালনে, যতদূর পর্যন্ত বার্তার বহুমুখী প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় (গণমাধ্যম থেকে জনগণ এবং জনগণ থেকে গণমাধ্যম)। রাওল্যান্ড লোরিমার বলছেন, "The apparent

---

373 Arabinda Singhal, *India's Communication Revolution,* Delho: Gupta Publications, 2008, p.201

৩৭৪. 'O Sulivan, Key Concept of Mass Communication, Manchashter University Press: 1998, p.77

reasonableness of the .... principles has been pitted against the interest of dominant nations and information producers."[375] তৎকালীন যুগে এই জাতীয় স্বার্থরক্ষার নীতি মার্কিন তথা প্রথমবিশ্বের আধিপত্যের সীমানা নির্দেশ করে দেবার এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আতঙ্কিত তথ্য নির্মাতারা প্রথম থেকেই তীব্র আপত্তি জানাতে থাকেন। মূলত উন্নতিশীল তৃতীয় বিশ্বে চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনও জাতীয় এবং সামাজিক সংহতির আদর্শের পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবু শিল্পোন্নত তথ্যব্যবস্থা তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসা মার খাওয়ার আশংকায় তারা প্রথম থেকেই এর বিরোধিতায় নেমে পড়েছিল।

এছাড়া ১৯৮১ সালে উন্নতিশীল বিশ্বের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, তাদেরও নিজেদের জাতীয় উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে নিজেদের মুদ্রণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাদি তৈরি করার অনুমতি দেয়া উচিত। অ্যান্টানি স্মিথ অবশ্য তাঁর "The Geopolitics of Information" গ্রন্থে বলেন তৃতীয় বিশ্বের এ দাবির বৈধতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এই মন্তব্যের প্রবল বিরোধিতা হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। শুধু তাই নয়, এর আপাদমস্তক বিরোধিতা মার্কিন দেশে একেবারে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান পেল।[৩৭৬] লোরিমারের বক্তব্য এখানে লিপিব্ধ হল ঃ "The publication of the MacBride Report, with its challenge to Western information ideology, provided a focus in the extreme disenchantment of the U.S.A fairly sustained attack against attempts to introduce state control and curtail the free flow of information was mounted by the U.S Government and the journalistic community, led by the New York Times. In the mid-1980s Ronald Reagon took thye eUS out of UNESCO, persuading the UK and Singapore to come alongt. This reduced UNESCO's budget by one third and the departure of Amadou Mathar M'Bow, its Director General, signalled a change of direction."[377]

---

[375] Rawland Lorimar, *Mass Communication*, ibid, p.103

[376] Antony Smith, *The Geopolitics of Information*, Oxford University Press: 2002, p.99

[377] Rawland Lorimar, *Mass Communication*, ibid, p.107

ফলে তৃতীয় বিশ্বের যোগাযোগতন্ত্রের বিকাশে এই কমিশনের বিফলতা এককথায় গোটা তৃতীয় বিশ্বকে কার্যত সর্বকালীন উপনিবেশে পরিণত করেছিল। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সংবাদজগতের স্বাধীনতার বিষয়টি শিল্পোন্নত বিশ্বের কাছে বাঁধা পড়েছিল। মনে রাখতে হবে এই আধিপত্যবাদের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল ঠাণ্ডা লড়াই পর্বেই। এই পর্বেই গণমাধ্যমের আধিপত্যবাদ জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক সীমা অতিক্রম করে প্রযুক্তির বিস্ফোরণকে হাতিয়ার করে বিশ্বপর্যায়ে নয়া মেরুকরণের সূচনা ঘটায়।

জেমস ইয়েল বলেছেন, "The msot common concern is that western powers, spearheaded by American-owned transnational corprations, have monopolized world communicaitons to such a degree that the economic well-being and cultural identity of less powerful nations have been mightilty damaged. The hierarchical internaitonal economic order national international informaiton order are thought to be coactive and complictious."[378]

এই একচেটিয়া গণমাধ্যমের নয়া আধিপত্যবাদ শুধু সমকালীন আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞায়ন ঘটাল তাই নয় বরং সমগ্র সংবাদজগতে এক নয়া প্রাতিষ্ঠানকিতার সূচনা করল যেখানে তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যোগাযোগতন্ত্রের স্বগোত্রীয়তা নয়, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও একমেরুকরনের সূচনা হল, অবদমিত হল তৃতীয় বিশ্বের চিরায়ত দেশীয় সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। সূচনা হল এক সার্বিক নয়া সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়, যেখানে সংবাদজগতের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রসঙ্গই অর্থহীন হয়ে পড়ল।

এই পর্যায়ে একই সময়ে হু হু করে বাজার দখল করতে লাগল শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রভাবশালী সংস্কৃতি 'পপুলার কালচার' বা পপ কালচার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে। এই পপ সংস্কৃতি অত্যন্ত দ্রুততায় বিশ্বব্যাপী বিরাট শিল্পক্ষেত্র বা ইণ্ডাস্ট্রিতে পরিণত হল আমেরিকাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের নাটকীয়তা, প্রযুক্তির চমক এবং গ্ল্যামারকে কাজে লাগিয়ে টিভি ইতিহাসের অন্যতম সেরা জনপ্রিয় action-advanture ধারাবাহিকের প্রযোজক কেবল-টিভি নেটওয়ার্কের (CNN) কর্ণধার টেড টার্নার 'টাইম' ম্যাগাজিনের 'বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব' হিসেবে পুরস্কৃত হলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের

---

[378] Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture*, ibid, p.121

স্বীকারোক্তিও শোনা গেল যে, তিনি নাকি উপসাগরীয় যুদ্ধে সি.এন.এন. -এর তদন্তমূলক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তাঁর রণকৌশল প্রণয়ন করেছেন।

যাহোক তৃতীয় বিশ্বের তথ্যসম্ভার উন্নতিশীল দেশগুলোর শিল্প কর্পোরেশনগুলোর নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিমা বিশ্বের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত উত্তরণ সেখানে তো বটেই, এমনকি তৃতীয় বিশ্বেও নয়া-সংস্কৃতির পরিসীমা এবং মাত্রার বৈচিত্র্যকরণ ঘটিয়েছে ভালোভাবেই। এই বৈচিত্র্যকরণ প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের চিরায়ত সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক ভয়াবহ ভাঙ্গন এবং সার্বিক পরিবর্তনের হাওয়া এনেছে। এই অবস্থানকেই আক্ষরিক অর্থে সংস্কৃতির উত্তর আধুনিকতা বলা যায়।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগতাত্ত্বিক জেমস লালেরর মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, "Post-modern theory is elitist. Most of the world is not yet modern, much less post modern. Post Modernist discussions typically agonize over the plight of societies, or social groups withing societies who can afford to luxuriate in modern problems."[379]

এই পর্যায়ে সংবাদজগতের স্বাধীন সত্তার প্রকৃত বিশ্লেষণে সারা বিশ্বজুড়ে যে আধিপত্যবাদের নয়া প্রকাশ আমরা প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে প্রত্যক্ষ করলাম, মূলত তার হাত ধরেই সোভিয়েত বিশ্বের পতন এবং ইতিহাসের তথাকথিত সমাপ্তি। এই ইতিহাসের উত্তর পর্বের প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিশেষ করে সংবাদজগতে সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক আক্রমণ ঘটেছে। শিল্পোন্নত বিশ্বে আজ corporatization of media প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলত বিশ্বের শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলো নিঃসন্দেহে বিশ্বজোড়া গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির নির্ণায়ক হিসেবে সফল আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এক নয়া বিশ্ব-সংস্কৃতির রূপ যার সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর হাতে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিশ্ব বা বাণিজ্যিকরণের প্রয়াসের মাধ্যমে যে Uniformity or homogeneity বা একীভবন বা সমীভবন ঘটানো হচ্ছে তাকেও গবেষকগণ বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করেছেন। এই সংস্কৃতির স্বাভাবকি বৈচিত্র্যের প্রকাশকে অবদমন করে প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিঃসন্দেহে মার্কিন কর্পোরেট সংস্কৃতির এহেন সমীভবন প্রয়াসকে আমরা নির্দ্বিধায় সাম্রাজ্যবাদ বলেছি এবং প্রতিষ্ঠাও করেছি এই গ্রন্থে। জেমস ইয়েল তাঁর ব্যাখ্যায়ও এটি নির্দেশ করেছেন। বলেছেনঃ "If by culture is menat a collective mode

[379] Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture*, ibid, p.127

of life, or a repertoire of beliefs, styles, values and symbols, then we can only speak of cultures never just culutre, for a collective mode of life, or a repertoire of beliefs etc., presuppose different modes and repertoires in a universe of modes and repertoires. Hence the idea of a global culture is a practical impossibility."[380]

সংস্কৃতি তাই প্রতিনিয়ত চিরায়তধর্মের এবং সদাপরিবর্তনশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক অস্তিত্বে বিচরণ করে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ কি পূর্বে, কি পশ্চিমে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সমাজের ভবিষ্যত রচনায় এই বৈচিত্র্যের এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অনুশীলন করেছে।

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী অর্জুন আপ্পাদুরাই এই সভ্যতা, সংস্কৃতির সমীভবনের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিপরীতে সমকালীন সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের নিরিখে যুক্ত করেছেন পাঁচটি মাত্রা বা space-যা এই বৈচিত্র্যের গতিময়তার উপাদান। তিনি এই পাঁচটি মাত্রার বা space-এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাংস্কৃতিক এই সমীভবন এবং আধিপত্যবাদ এককথায় অবাস্তব। বিশ্বসংস্কৃতির এই মাত্রাগুলো হল মানবজাতি, প্রযুক্তি, অর্থ, গণমাধ্যম এবং আদর্শ। এর প্রত্যেকটি তত্ত্বমাত্রাই এক একটি আন্দোলনকে সূচিত করে।[৩৮১] মানবজাতি মাত্রা বলতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে মানুষের স্থায়ী বা যাযাবর গমন। এদের মধ্যে স্থায়ী, শরণার্থী, পর্যটক, নির্বাসিত, অস্থায়ীকর্মী প্রভৃতি পঙক্তি বা শ্রেণিবিন্যাস ঘটতে পারে। প্রযুক্তিমাত্রা বলতে দেশীয় জাতীয় সীমার বাইরে শিল্পপ্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিশিল্প দুইয়েরই রপ্তানীকে বুঝায়। যেমন আমেরিকা সারা পৃথিবীতেই সফটওয়ার তথ্য প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। অর্থমাত্রা বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও অর্থের প্রবাহমাত্রা সূচিত করছে। বিশ্বের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ারগুলোর স্বার্থে বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই পুঁজিপ্রবাহ ঘটিয়ে পুঁজির বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে।

আপ্পাদুরাই বলেছেন, এই পাঁচটি মাত্রার মধ্যেকার পরস্পরিক সম্পর্ক খুব গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন এবং দারুনভাবে অনিশ্চিত কারণ এই প্রত্যেকটি মাত্রার নিজস্ব বাধা বা পরিমিতি আছে যা পরস্পরের বিরুদ্ধে সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বহুবিধ বাধা তৈরি করে এবং আন্দোলনের শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। গণমাধ্যম মাত্রা

---

[380] Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture*, ibid, p.130

[381] অর্জুন আপ্পাদুরাই, উদ্বৃতিঃ হায়দার আকবর খান রনো, c‖Re¦‡' i gZ¨NÈ¦, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪

বলতে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম প্রযুক্তির সরবরাহ এবং সঙ্গে বিশ্ব সংস্কৃতির নামে সংস্কৃতিভুদের উৎপাদনও অন্তর্ভুক্ত। আর এই উৎপাদনের নামে বিশ্বসংস্কৃতির যে প্রতিচ্ছবি তারা সরবরাহ করছে তার মাধ্যমে অন্যসংস্কৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা। অর্থাৎ গণমাধ্যম যে প্রতীকি উপায় বলে দেবে তার ভিত্তিতেই আমাকে কোনো দেশ বা মহাদেশের প্রকৃত সংস্কৃতি এবং পরিচয় সম্পর্কে জানতে হবে। আদর্শমাত্রার মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং আদর্শগত সীমার অতিক্রম পর্যায়ে প্রসূত হয়েছে। জেমস্ ইয়েল তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আদর্শমাত্রা বলতে ক্ষমতার লড়াইয়ে পক্ষভুক্ত অবস্থান বুঝায়। এটি ক্ষমতার লড়াইয়ে পক্ষভুক্ত অবস্থান এবং দেশের সম্পদের বন্টন প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। বিশ্বব্যাপী আদর্শের প্রবাহ একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী আদর্শের কথা বলবে তেমনি অন্যদিকে আদর্শের নির্ণায়ক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করবে, যেমন স্বাধিকার, স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সাম্য, নিয়মনিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রভৃতি।

উপরের এই পাঁচটি প্রবাহমাত্রার প্রশ্নে আপ্পাদুরাই দাবি করেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই পাঁচটি প্রবাহমাত্রা কখনো আধিপত্যের শর্তে বা বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্তি বা বাহুল্য এবং সমীভবনের মাধ্যমে সংস্কৃতির উপর প্রভাববিস্তার করতে পারে না বরং তাদের পারস্পরিক বিভিন্নতা, বৈপরীত্য এবং প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যোগাযোগ প্রযুক্তি হল এর মূল ভিত্তি। গণমাধ্যম খুব স্বাভাবিক আচরণেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রসারণ ঘটায়, কখনও কোনো ক্ষেত্রে বিধিনির্ধারণ করে না। বাস্তবিক সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জেমস ইয়েল বলেছেন, “Globalizaton is best considered a complex set if interracting and often countervailing human, material and symbolic flows that lead to diverse, hetegoeneous cultural positionings and practives which persistently and variously modify established vectors of social, political and cultural power.”[382]

আপ্পাদুরাই এবং জেমস লালের এহেন গবেষণার ফল অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে তথা তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ মানবজাত, সামাজিক, বস্তুগত এবং প্রতীকি বৈচিত্র্যও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, একে পৃথিবীর শিকড় থেকে ছিঁড়ে ফেলা যাবে না কোনোভাবেই। কিন্তু এর পরেও এই বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমীভবন ঘটিয়ে বিশ্বায়ন ঘটাতে গেলে একটাই পডথ অবলম্বন করতে হবে শিল্পোন্নত

[382] Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture*, ibid, p.132

বিশ্বকে, তা হল সার্বিক নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ। আর এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ আজ সারা পৃথিবীর মানুষকে নিজের সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে নতুন করে সমীভবন ঘটাচ্ছে যে সমীভবন আসলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দেশজ সংস্কৃতির মূলে দারুণ ভাঙন ঘটাচ্ছে। এই সামগ্রিক ক্ষেত্রবিচ্ছিন্নতা বর্তমানে একটা ভয়ঙ্কর চেহারায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশীয় স্তরে, নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর সীমানার বাইরে সাধারণ মানুষগুলোকে সাংস্কৃতিক প্রান্তবর্তিতায় নিক্ষেপ করেছে। এও বিশ্ব সংস্কৃতির এক নয়া স্থায়ী অভিপ্রয়াণ।

সামাজতাত্ত্বিক র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "A particular way of life shaped by values, traditions, beliefs, material objects and territory. Culture is a complex and dynamic ecology of people, things, world views, activities and settings and fundamentally endures but is alos changed in routine communicaiton and social interaction."[383]

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্পোন্নত বিশ্ব তার মহাজাতিক সংস্কৃতির আক্রমণে সামাজিক ক্ষেত্রে সমষ্টিগত এবং পরম্পরাগত চিরায়ত সংস্কৃতির অস্তিত্বকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক জোনাথন ফ্রিডম্যান বলেছেন, "It had become pretty clear to many of these same people that there was indeed a crisis in the west, although some might still deny that it had anything to do with global systematic process.... but in tghe midst of the crisis, a great deal of the current enlightened literature on globalization has adamently avoided the social issues, councetrating instead on the sometimes spectacular products of globalization process themeselves.[384]

একদিকে শিল্পোন্নত বিশ্বের পুঁজি সংকট অন্যদিকে এই সংকটমোচনে হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বসংস্কৃতির নামে সমাজ ধ্বংসকারী এই মহাজতিক সংস্কৃতির আক্রমণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজারগুলোকে কেন্দ্র করে যে নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র, তার পরিধির অনেক বাইরে সভ্যতার যাবতীয়

---

[383] র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড, র‍্যালফ মিলিব্যান্ড, উদ্বৃতিঃ হায়দার আকবর খান রনো, c‚ıRev‡' i gZ¨NÈv, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

[384] Jonathon Freedman, *Globalization : New World Conception,* ibid, p.32

পশ্চাৎপদতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যেও একপ্রকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রবিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ছে। আজ এই ক্ষেত্রবিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব জেমস ইয়েল বিশ্লেশিত অনুন্নত দেশে থেকে উন্নত দেশে মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ী অভিপ্রয়াণের তত্ত্বকে অতিক্রম করে দেশীয় ক্ষেত্রেও দারুণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, বিশেষত ভারবর্ষের মতো বড় দেশে।

সমাজতাত্ত্বিক জোনাথন ফ্রিডম্যান এই পর্যায়কে এক সার্বিক গোলযোগের সময় বলে বর্ণনা করেছেন। আসলে এই গোলযোগ বিশ্বব্যাপী এবং এর কুফল আজ প্রতিটি মানুষের জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে গণমাধ্যম তথা প্রভাবশালী গণমাধ্যমসূহ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে সার্বিক পণ্যভবনের নিরিখে। ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক কার্যকলাপ, হিংসাত্মক ভাবনা বা কল্পনা, সদা বিপর্যয়ের আশংকা, ভয়ঙ্কর রোগ মহামারী, এইডস আতঙ্ক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুনি, মাফিয়ার রাজত্ব, আকাশচুম্বী বেকারত্ব, সার্বিক দেউলিয়া দশা এবং সম্পত্তির হানি প্রভৃতির বহুমাত্রিক নেতিবাচক উপাদান সামাজিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও এর ফলে ভয়াবহ দারিদ্র এবং নয়া ধনতানিন্ত্রক কেন্দ্রগুলোর নিঃশব্দ প্রতিষ্ঠা এক একটি দ্বীপের মতো যাবতীয় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বেঁচে থাকার পাশাপাশি বাকি দেশটার অন্ধকারকেও পরোক্ষভাবে প্রকট করে তুলেছে। ফলে এই প্রান্তবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রের গ্লোবাল সংস্কৃতির চাপে ক্রমাগত ক্ষেত্রবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। আর তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেও সর্বগ্রাসী আক্রমণে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে মহাজাতিক সংস্কৃতির প্রবল ঢেউ। তৈরি করেছে এক সার্বিক শ্রেণিশূণ্যতা, দো-আঁশলা সাংস্কৃতিক শংকর পর্যায়, প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিচ্ছিন্নতা, কৃষিশিল্পে ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি নানা সমাজ-অবক্ষয়ী ঘটনাসমূহ। একদিকে শ্রেণি অবস্থানের বা বিভাজনের নব আঙ্গিকসমূহের নিরিখে এক আপাত শ্রেণিশূণ্য পর্যায়ের অভূতপূর্ব সূচনা ঘটেছে যার তলস্পর্শ করাটা তেমন কঠিন না হলেও প্রকৃত অবয়ব নির্মাণ নিতান্তই কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। আমরা স্বচ্ছন্দে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র-বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক প্রান্তবর্তিতার সামাজিক ক্ষেত্রে সমতুল প্রতিফলন হিসেবে নিশ্চিতভাবেই এই শ্রেণিশূণ্যতাকে বিবেচনা করতে পারি।[৩৮৫]

সমাজপটে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমীভবনের উল্লিখিত বিশ্বায়ন অনিবার্যভাবে বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক মৌলবাদী এবং সুবিধাবাদী ধারার প্রবর্তন ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছে যা আসলে

---

[385] Muhammad Habibur Rahman, '*Emerging Global Economic Order snd Develoing Countries'* Inaugural address by the Guest of honor of International Conference on Emerging Global Economic Order and Developimg Countries- Organized bu BEA

শ্রেনিবিভাজন বিন্যাসের আঙ্গিক বদলাতে তৈরি একটি ভিন্নতর আর্থ–সামাজিক শ্রেণি বিশেষ। বিভাজন এবং তার অবশ্যম্ভাবী অনুবর্তী শ্রেণি সংগ্রাম ক্রমাগত হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রাথমিকভাবে নগরগুলোতে পরিচালন আধিকারিকের নামে গড়ে উঠেছে কিছু শেতাঙ্গ কর্মীবৃন্দ, যারা না উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, না প্রকৃত পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। অভাবনীয় বেকার সমস্যার আপাত সমাধান হিসেবে এই ঘটনা আসলে সামাজিক ক্ষেত্রে এক অদ্ভূত শ্রেণিশূণ্যতার সৃষ্টি করছে। মানুষ তার শ্রেণিগত অবস্থান হারিয়ে ফেললে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপর্যয় অনিবার্য এবং পুঁজিকেন্দ্রিক স্থানে এই অস্থিরতার ক্রমাগত বৃদ্ধি বর্তমানে সহজেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিশ্বজোড়া এই নয়া মহাজাতিক সংস্কৃতি তৃতীয় বিশ্বে এক সংস্কৃতির শংকর বা মিশ্র পর্যায় তৈরি করেছে। এই শংকর সংস্কৃতি মূলত শিল্পোন্নত বিশ্বের তৃতীয়-শ্রেণির সংস্কৃতির দ্বারা নির্মিত, যা চিরায়ত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই গার্সিয়া সানক্লিনির মতে মহাজাতিক এই নয়া সংস্কৃতি চিরায়ত সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করার প্রয়াসে নেমে পড়েছে।[৩৮৬] আধুনিক যোগাযোগপ্রযুক্তি এর সৃষ্টি পদ্ধতি সরবরাহ করেছে।

যাইহোক এই শঙ্কর প্রজাতির সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ বোঝার পার্থক্যও আছে। শংকর সংস্কৃতির মূল কথাই হল দুটি সংস্কৃতির আঙ্গিকের মিলন, দুটি আঙ্গিকের মূল গুনাগুণ বর্তমান রেখে, সংশ্লিষ্ট সভ্যতার গতির অভিমুখের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয় সমাজের মজ্জায় সম্পৃক্ত হবে, না হয় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে হারিয়ে যাবে। সংস্কৃতির প্রাজ্ঞজনেরা ভালো বলতে পারবেন বিশ্বায়নের যুগে গত চৌদ্দ-পনের বছর ধরে যে সংস্কৃতির উপাদান প্রভৃতি গণমাধ্যম বাহিত হযে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির ধারায় কোন স্তর পর্যন্ত সম্পৃক্ত হয়েছে, আর কতটা শংকর-সংস্কৃতির ধর্ম রক্ষা করেছে? সংস্কৃতির উপাদান বা উপকরণের বাজারের এদেশে তেমন চল ছিল না, কারণ প্রকৃতি সে স্থান পূরণ করত, আর যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সেই কমতি মানুষের জীবন সংগ্রামের জীবনবোধের আদর্শে ঢাকা পড়ত। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতার লড়াইয়ে মাঠে-ময়দানে গান্ধিজির একডাকে শত্রুর সামনে অস্ত্র ফেলে দিয়ে অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারে, সে ডাক সফল হবে না জেনেও, অথবা সারা দেশের এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থানেও বুক সোজা করে সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় প্রদান করতে পারে। সেই দেশে কী

386 Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid, p.37

তীব্রতায় সাংস্কৃতিক সাম্রজ্যবাদ তার আক্রমণ চালিয়েছে প্রতিনিয়ত, ইতোমধ্যেই ক্ষতি করে দিয়েছে কিশোর, যুবসমাজের, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির; সমাজের বুকে নতুন আঙ্গিক তৈরি করার প্রয়াসে চিরায়ত সংস্কৃতিকে একেবারে আস্তাঁকুড়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছে। রি-মিক্স থেকে বাঙলা ব্যান্ড এই শংকর সংস্কৃতির ছোঁয়াচ দিচ্ছে একটি তত্ত্বকেই মূলমন্ত্র করে "ক্ষতি কি?" আর তাই দেশীয় বাজারে বিক্রিযোগ্যতা হারাচ্ছে চিরায়ত সংস্কৃতির ধারা। তবে পাল্টা স্রোত এখনও আছে তাই লড়াইও আছে। জেমস্ লালের অভিজ্ঞতা এখানে লক্ষণীয়, "Although transculturaion, hybridization and indigenization may indeed bring about 'the mutual transformaiton of cultures, the transformaitons often entail unequal economic powr relations between the interacting cultures."[387]

শংকর সংস্কৃতির অভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তিপর্ব হল এই অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রভাবে মহাজাতিক সংস্কৃতির আক্রমণ এবং সহজেই বাজার দখল। এটা কোনো নিরাশাবাদীর সমালোচনা নয়, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের এটাই আসল চেহারা।[৩৮৮]

সমাজতান্ত্রিক জেমস ইয়েল অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে একতরফা পর্যায়ের কথা বলেছেন তা ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করা হলেও এখানে অত্যন্ত স্বল্পাকারে ব্যাখ্যা দাবি করছে। বিশ্বজোড়া উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতির নামে সমাজ এবং যাবতীয় সামাজিকতার ঊর্ধ্বে আত্ম-কেন্দ্রিকতার স্তরে নামিয়ে আনার যে চক্রান্ত শিল্পোন্নত বিশ্বের তরফে সর্বতোভাবে সার্বিক আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সাধন করার প্রয়াস চলেছে তাতে নিশ্চিতভাবে দেশীয় বাজার দখলের মাধ্যমে নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র তৈরি করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে এক সার্বিক ভাঙনের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর দ্বারা বাহিত সংস্কৃতির ঢেউ একাজে বিশেষত এই অনুন্নত দেশগুলোতে একেবারে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলনস্বরূপ যে অস্থিরতা, অসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপট ছাড়াই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে তাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বন্ধন অনেকাংশে শিথিল হয়ে এসেছে। এটা আজ ভারতের মাটিতে ভালই প্রত্যক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাস ঘটিয়ে

---

[387] Professor Jems Yall, *Media, Communication and Culture,* ibid, p.139

৩৮৮. Andrenic Migraniyan, *Gorbachevs Leadership : A Soviet View,* Heuweet & Winston: 2009, p.460-464

সামাজিক স্তরভেদে এক অস্বাভাবিক আধিপত্যবাদের সূচনা ঘটেছে ইতোমধ্যেই, আর তাকে কাজে লগিয়ে শিল্পোন্নত বিশ্ব ধারাবাহিকভাবে বিশ্বায়ন কর্মসূচি সমাধা করে চলেছে অত্যন্ত সুচারুভাবে।[৩৮৯]

এখানেই তৃতীয় বিশ্বের সতর্ক হওয়ার পালা এবং সার্বিকভাবে সংবাদজগতের স্বাধীনতার প্রশ্নেও এই বাধাগুলোকে বয়ে বেড়াতে হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। সমাজতাত্ত্বিক জেমস ইয়েল এবং অর্জুন আপ্পাদুরাই তাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র-বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে যে ethhnoscape বা মানবজাতিমাত্রার উল্লেখ করেছেন তার পুনর্বিশ্লেষণ এখানে নিতান্তই জরুরি। তাঁরা মূলত উন্নতশীল দেশ থেকে মানুষর উন্নত দেশে অভিগমনের প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ টেনেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলোতে আজকের এই সংস্কৃতির ভাঙন, নতুন ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাস এবং সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে প্রতিনিয়ত এই যে আধিপত্যবাদের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ethnoscape-এর এই ব্যাখ্যা আর চলনসই হচ্ছে না।[৩৯০]

খেয়াল করতে হবে, একদিকে সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরস্পরিক অনুবর্তী ভাঙনের সাযুজ্য যেমন নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রের সূচনা ঘটিয়েছে তেমনি প্রান্তবর্তী এলাকাগুলোতে মানুষ একটু কাজের তাড়নায় সংস্কৃতির শিকড় ভুলে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে অন্তত হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নূন্যতম জীবন ধারণের সামগ্রী অন্বেষণে। সেটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা নয়? কেউ কেউ হয়ত একে বলবেন delocalizaton; কিন্তু সমাজ এবং জীবনবোধের নিরিখে ঐ খেটে খাওয়া মানুষটির কাছে এটা কখনই delocalization নয়, বরং এক সম্পূর্ণ detrritorialization of culture. একটি শিক্ষিত বেকার যুবককে কাজের তাগিদে যখন দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয় এমনকি কাজের টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্র পূরণের উদ্দেশ্যে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চব্বিশটি ঘন্টা দৌড়াতে হয় তখন তার শিকড়ের সংস্কৃতির কিইবা অবশিষ্ট থাকে? বরং তাঁর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ তাঁর কাজের অনুকূলে এক নতুন সংস্কৃতি গড়তে সাহায্য করে, সমাজের মুলস্রোতের সঙ্গে তার মিল থাক আর নাই থাক। এও তো এক ধরনের সংস্কৃতি ক্ষেত্রবিচ্ছিন্নতা বা deterritorialization in the guise of alienation. এই তো প্রযুক্তিযুগে বিশ্বায়নের প্রতিফলন,

---

৩৮৯. ‘O Sulivan, *Key Concept of Mass Communication,* ibid, p.25-27

390.Zurgen Hebarmas, The Stractural Transformetion of the Public Reaction, Downing: Becon Press, 2002, p.65-73

যার মূলমন্ত্রই হল ‘accumulation of self’ বা এককথায় আত্মসংর্বস্বতা। এই আত্মসর্বস্বতাই গোটা তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক ভিত্তি একেবাবে শিকড় থেকে বিষিয়ে তুলেছে। আর এই সার্বিক পরিস্থিতিই বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র এবং গোষ্ঠী নির্মাণের প্রধান কারণ।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই যে সাংস্কৃতিক সংকট, তা কি নিতান্তই অপ্রতিরোধ? ইরাকের উপরে মার্কিন আগ্রাসন কিন্তু এই আশংকাকে আরও উসকে দিচ্ছে। অথবা কিউবার উপরে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক অবরোধ প্রভৃতি ঘটনাবলি গোটা তৃতীয় বিশ্বকে একটা অন্ধকারের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে।[৩৯১]

তবু বিশ্বজুড়ে এর প্রতিরোধ চলবে। বাঁচার লড়াই। সমাজতাত্ত্বিক সামির আমিনের গলাতেও সেই প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে ঃ “We arrogance of the globalized neo-liberal discourse has had a bad licking. During the second half of 1990s, events like Seattle and Porto Alegre caused the discourse to lose much of its credibility. Peopel n olonger believe in its virtures claimed by the dominant discourse, nor in the incluctable character of the practices that it imposes. There is no alternaitve proclaimed Mrs. Thatcher There are plenty of alternatives!>>is what we say today:alternatives are plural.”[392] তাই শুধু তৃতীয় বিশ্বই নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ এই বিকল্পের সন্ধানে সংগ্রামরত।

---

391. Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.5-6

[392] Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, ibid, p.25

সপ্তম অধ্যায়: বিশ্বায়ন সমাজ ও শ্রেণিপ্রসঙ্গ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে যে বাণিজ্যিক সংস্থার জন্ম হয়েছিল, সেই WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হাত ধরে আমরা অবশেষে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করলাম প্রায় সম্পূর্ণ মানবসত্তাকেই তার পায়ে সঁপে দিয়ে। এই সংস্থাটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গোটা বিশ্বকে বাজারনৈতিকতার শিখরে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এতদিনে প্রায় চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। মজার কথা হলো সমস্ত নৈতিকতা নিরিখে এই প্রচেষ্টা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাখ্যার একমাত্র পরিণতি হল বিশ্বের আভূমি বাজারিকরণ এবং অনুন্নত দেশগুলোতে অসংগঠিত বাজারের অস্তিত্বের লড়াই। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অথচ বড় অনুন্নত বাজারগুলোকে গোগ্রাসে গলধঃকরণ করে উন্নত বাজারের নিত্যনতুন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত নীতি এবং আদর্শ কায়েম করার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কতগুলো শর্ত রচনা করেছে। আর সেগুলো মেনে চলতে বিশ্বের দেশগুলোকে চাপ দেয়ার জন্যে প্রয়োজনে সামরিক অভিযানের রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতা একে দেয়া হয়েছে।

নবকলেবরের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জন্ম যার গর্ভ থেকে অর্থাৎ গ্যাট এবং তার উরুগুয়ে রাউণ্ড আলোচনাচক্র পর্যায়ে প্রায় একই ধাঁচের খোলাবাজারি অর্থনীতির নিয়মাবলি তৈরি হলেও সেগুলো তৃতীয় বিশ্বের মাথায় চাপিয়ে দেয়ার বা আরোপ করার মতো কোনো বিশেষ সামরিক ক্ষমতা পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছিল যদিও ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশ গ্যাট চুক্তিতে আর্থার ডাঙ্কেলের প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করে উদারিকরণের মাধ্যমে খোলা বাজারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম কছে, সেও উন্নত দেশসমূহের প্রত্যক্ষ হুমকির সামনে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিপত্রের সাফল্য সম্পর্কে কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি ধনতন্ত্রের বর্তমান প্রবক্তারা।

ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নয়া সংস্কার কর্মসূচির রূপায়নের প্রারম্ভেই দেখা গেল তথাকথিত উন্নত, অনুন্নত বা উন্নতিশীল যে কোনো সমাজেরই খোল–নলচে বদলে যাচ্ছে। কীভাবে? প্রথমে অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমাগত পরদ্রব্যনির্ভর হয়ে পড়ার ফলে দেশীয় পণ্যদ্রব্য হয় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে, না হয় দেশীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই শিথিল হয়ে পড়ছে। ফলে চিরাচরিত প্রথাভিত্তিক এই বাজারগুলোর হঠাৎ পরনির্ভরতার সঙ্গে সাধারণ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা এবং চাহিদার চরিত্র তথা জীবনাদর্শের মূলে আঘাত পড়েছে। নতুন করে বাজারের চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধা হচ্ছেন

তৃতীয় তথা অনুন্নত বিশ্বের মানুষ, ফলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ঐতিহ্য হয়ে পড়ছে বিপন্ন। এখন তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলের যাবতীয় কর্মসূচির যৌক্তিকতা, তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয়ে যত আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে বা ভবিষ্যতেও হবে তার পরিণতিও কিন্তু একমুখী। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সম্পূর্ণ উদারিকরণ, দেশীয় বাজার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের দৃষ্টিগোচরে আনা, সমাজের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের অবসান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টা ত্যাগ করা, শিল্প বাণিজ্য সংস্কৃতির উন্নয়নে সৃষ্টিশীল মননকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত মুক্ত বাণিজ্যের যাবতীয় শর্তের পায়ে আত্মসমর্পণ করা।

ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে যে এর অন্যথা হলে হয় সামরিক আক্রমণ না হয় কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি এমন বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডকেই বিশ্বায়ন বলেছেন। কারণ এই প্রয়াসের দ্বারাই গোটা ধরাধামে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব একীকরণ বা সাধারণীকরণ প্রক্রিয়া চলেছে, যেখানে উৎপাদন বা সৃষ্টির অধিকার, সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে আধুনিকতার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার একে একে চলে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলোর বৃহৎ বাণিজ্যিক পকেটে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হাজার বছরের সংগ্রামে অর্জিত নেশন স্টেট বা জাতিরাষ্ট্রগুলো। মার্কিন বৃহৎ পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিনসের প্রাক্তন সিনিয়র অংশীদার কেনিচি ওমে বলেছেন, বিশ্বায়নের আশু পদক্ষেপই হবে রাষ্ট্রভিত্তিক অর্থনীতির কাঠামোকে ভেঙে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বা zone তৈরি করা। এভাবেই রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমার উর্ধ্বে মানুষের চাহিদা আর প্রয়োজন মেটানো হবে কিছু আর্ন্তজাতিক বা মহাজতিক বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে, যাদের সঙ্গে সরাসরি সেই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বা সমাজের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। নোয়াম চমস্কির বিশ্লেষণই এখানে স্মরণীয় "In reality, the quasi-mercantilist system of transnationla corporatc capitalism is rife with the kinds of conspiracies of the masters against the public of which Adam Smith famously warned, not to speak of traditional reliance on state powr and public subsidy. The vast majority of the world's population, who are subjected to market discipline and regaled with odes to its wonders, are

not supposed to hear such words."[393] ঠিক এমনই ভাষায় সমাজতত্ত্ববিদ সামির আমিন পুঁজিবাদী কেন্দ্রের উৎপত্তির নয়া সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এই নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রের সীমানার বাইরে গোটা পৃথিবী জুড়ে যে প্রান্তিক মানুষ যাদের দিকে একবিংশ সভ্যতার অভিজাতকেন্দ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ছোঁয়া পৌঁছায়নি।

এই প্রায় বাজারিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাজাতিক শিল্পকর্পোরেশনগুলো জন-মানসে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, চমস্কি একে এক গভীর চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন। একদিকে তাই যেমন উৎপাদনক্ষেত্রের বিশ্বায়ন ঘটে চলেছে, ঢালাও বেসরকারি কঠোরতার মধ্যে দিয়ে অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ লগ্নীপুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার (যা বহুকাল আগেই রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের সময়েই IMF-এর ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা পতনের পরেই ঘটেছিল) করা হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিব্যবস্থার যে লাগামছাড়া অবস্থার সূচনা ঘটেছিল তার মধ্যে বর্তমানে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হাত পড়ল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর পক্ষে রপ্তানি বাড়িয়ে তার থেকে বিদেশি মুদ্রার আয়ের মাধ্যমে ডলারের সঙ্গে নিজস্ব কারেন্সির প্রতিস্থাপন যোগ্যতা আদায় করা আর সম্ভব হলো না। ফলে একদিকে মহাজাতিক শিল্পকর্পোরেশনগুলোর দ্বারা উৎপাদন ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবস্থা কায়েম, অন্যদিকে পুঁজির নেতিবাচক সঞ্চয় এবং সর্বোপরি ডলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সরাসরি স্থায়ী পরাজয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে একেবারে পঙ্গু করে দিল। এই প্রতিবন্ধকতার ভয়ংকর প্রভাব পড়ল দেশগুলোর সমাজে, সভ্যতায়, ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়।

নোয়াম চমস্কির বিশ্লেষণে "The history of business and political economy yields many example of the subordination of narrow gain to the broader interest of the opulent minority, which is unusually class conscious in a business run society like U.S."[394]

---

[393] Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* New York: Pantheon, 1980, p.22

[394] Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid, p.24

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রয়োজনে পেন্টাগনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে জনকল্যাণের নতুন বার্তা পৌঁছে দিয়ে চলেছে। শুধু মুষ্টিমেয়র প্রয়োজন মেটানোই হবে রাষ্ট্রের তথা মহাজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলোর মহান কর্তব্য। কাজেই এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনের তাগিদে গোটা পৃথিবীতে জাতিগত নয়, রাজনৈতিক আদর্শগত নয় বরং চাহিদা, পছন্দ প্রভৃতির ভিত্তিতে তৈরি হবে নতুন সমাজ, চিরাচরিত সমাজকাঠামোর ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে। মার্কিন শিবির আজ উল্লসিত যে, বর্তমান বিশ্বায়ন তত্ত্বের প্রয়োগের সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসনের এবং সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের কারণে, কারণ সোভিয়েতের পতনে গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে।

কেনিচি ওমের লেখনীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, গোটা পৃথিবী এখন ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যাবতীয় 'Ism' বা তত্ত্বের কায়েম করে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে কোনো মতবাদের অস্তিত্ব কায়েমের পথে এবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে যাতে অবাধ বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় কেউ বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে। ফলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলো আজ কতটা সংকটের সম্মুখীন। উপরন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে যে কোনে ভাষা, ধর্ম, জাতি তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সমাজগুলো এক অদ্ভূত সংহতিপূর্ণ বসবাসের বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার বুকে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সেই সংহতি আজ সর্বৈব বিপন্ন। ফলে একদিকে অর্থনৈতিক আঙ্গিনায় বিশ্বায়ন কায়েমের লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে যে আঘাত ইতোমধ্যেই পড়েছে তার প্রতিরোধে কী কর্মসূচি গ্রহণ করবে তৃতীয় বিশ্বের পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত সমাজগুলো, তার উপর নির্ভর করবে তথাকতিথত সমাজভিত্তিক অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ, নচেৎ একটাই বিকল্প তাহল নয়া-সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব।[৩৯৫]

উপরের এই অবতারণাটির বিশ্লেষণে প্রশ্নের তেমন কোনো অবকাশ না থাকলেও যে বিষয়টি এখানে বিবেচনা করতে হবে তা হল চিরাচরিত সমাকলীনতাভিত্তিক আধুনিক সমাজ এবং অপরদিকে চাহিদার ভিত্তিতে, বাণিজ্যিক স্বার্থে বহুজাতিক সীমানার ঊর্ধ্বে গড়ে ওঠা নয়া-সামাজিক কাঠামো, এই দুইয়ের মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত, উন্নতিশীল বা অনুন্নত সমাজে বা দেশের অভ্যন্তরে মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিন্নতার প্রতিফলনস্বরূপ শ্রেণি অবস্থান কী রকম দাঁড়াবে। যে কোনো পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোয় মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণিবিভাজন এবং ফলত শ্রেণি

---

395 Stuart Hall, *The Loca land the hlobal : Globalization and Ethnicity*, London: Macmillan, 1991, p.67

সংগ্রামের মাধ্যমে শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনের যে ইতিহাস, তার অবসান হয়ে যেতে বসেছে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায়। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মদদে যে শোষণ মানুষের উপর চালানো হয় তার মূল লক্ষ্য হল পুঁজির সঞ্চয় এবং পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষা। এখন গোটা পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থার ঊর্ধ্বে বৃহৎ পকেটগুলোতে যে পরিমাণ পুঁজির সঞ্চয় ঘটেছে তা ব্যবহারের নতুন পথ না থাকায় উন্নত দেশগুলো ভয়ানক অর্থসংকটে পড়েছে।

কেনিচি ওমের বক্তব্যের সূত্র ধরে শ্রেণি অবস্থানের বর্তমান সংকট আমরা বিশ্লেষণ করব। সেখানে কেন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সীমা, সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি ও যাবতীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই সমাজ শ্রেণি অবস্থানের সংকটের আসল চেহারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। তবে প্রাথমিক বিচারে এই তথ্য একেবারেই সুস্পষ্ট যে, মূলত বৃহৎ একতরফা বিশ্ববাণিজ্যের লক্ষ্যেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যাবতীয় তত্ত্ব তৈরি এবং প্রয়োগ চলছে। কেনিচি ওমে উদ্ভূত বিশ্বায়নের গরিমা বর্ণনা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থারই অপ্রয়োজনীয়তা সূচক বক্তব্যের পাশাপাশি একটি তথ্যও উদঘাটন করেছেন। তা হল, দেশগুলোতে ক্যাপিটাল মার্কেট বা পুঁজির বাজারে অভাবনীয় পরিমাণ অর্থ অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে যা খরচ করার উন্নয়নমূলক পথ দূরে থাক, কোনো রাস্তাই তারা খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন জাপানে গত পাঁচ বছরে জমে থাকা অর্থের পরিমাণ ১০ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলার!

তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের হাল খারাপের দিকে গেলেও মূলত বীমা, শেয়ার বাজার সূত্রে প্রাপ্ত সেই অর্থ তারা খরচ করতে পারছে না। ফলে বিভিন্ন বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা, কর্পোরেট সংস্থা এবং সরকার নিজে এই সম্পদ অন্যদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে আয়ের ভিত্তিতে দেশে বণ্টন করতে চাইছে।

কেনিচি'র ভাষায় "The problem is that suitable and suitably large investment opportunities are not often available in the same geographies where money sits. As a result, the capital market have developed a wide variety of mechanisms to transfer it accross the nationaly borders. Today, nearly 10%

of U.S. fund is invested in Asia. ten years ago, that degree of participation in Asian markets would have been unthinkable."[396]

একথা একেবারেই স্পষ্ট যে, কেন রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে প্রতিটি দেশের জন্য বিশ্বায়নতত্ত্ব তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত উন্নততর বিশ্বসমাজ গঠনের স্লোগান নিয়ে-শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো উপায়ে, যে কোনো তত্ত্বে এই সংকট, শোষণ থাকা সত্ত্বেও শ্রেণিসংগ্রামের প্রকাশের পথও ক্রমাগত অস্পষ্ট হচ্ছে। এইজন্যেই বিশ্বব্যাপী অনুকূল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বায়ন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা এবং সর্বোপরি যৌক্তিকতা প্রমাণে এমনভাবে উদ্যোগী হয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রথমে সংস্কৃতি রপ্তানির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে মানবতা এবং সংস্কৃতির তত্ত্ববৈচিত্র্যের সাবেকিয়ানা ভেঙ্গে এক অদ্ভূত সাধারণীকারণ বা Generalization করতে উদ্যোগী হয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত উন্নত দেশগুলো এবং তার জন্য যাবতীয় গণযোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির দখলের দ্বারা সারা পৃথিবীতে একমাত্রিক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যাকে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে আর বুঝি কোনো পথ খোলা থাকছে না।[৩৯৭]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সংকট, যাকে অতিক্রম করার জন্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকার সমাজগুলোতে প্রবেশ করে চূড়ান্ত ভাঙন তৈরি করা হয়েছে। আসলে এখানকার বাজারগুলোতে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে মানুষকে তথাকথিত বিদেশি পণ্যের ঔজ্জ্বল্যের দিকে আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। এই কাজে প্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হল পণ্যভোগীর রুচি, চাহিদা প্রভৃতির সাবেকিয়ানাকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়া। সেই জন্যেই উত্তরআধুনিক যুগের গা-জোয়ারি প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে আমরা বিশ্বায়নের এই নাগপাশ সঠিক অনুধাবন করতে না পেরে মার্কিন সংস্কৃতির নগ্নতাকে স্বাধীনতা বলে আঁকড়ে ধরার জন্য ছুটছি। অথচ ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সেই কারণে তৃতীয় বিশ্ব তথা প্রাচ্যের

[396] Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy*, ibid, p.39

397. John B. Thomson, *The Media and Modernity – A Global Theory of Media*, London: Polity Press, 2000, p.27

সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এই তিন ক্ষেত্রে অদ্ভূত বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে যা এককথায় অচিন্তনীয় এবং অভূতপূর্ব।[৩৯৮]

এখানে বলা হচ্ছে যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আধুনিকীকরণের প্রশ্নে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেই নকল করতে হবে আবার যা নিজস্ব তার স্থবিরতার বিপণনযোগ্যতাও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজারে ছড়ানো হচ্ছে এবং তা অচিরেই তার বিপণনযোগ্যতাও বাড়িয়ে তুলতে হবে যা এককথায় অবাস্তব।

এ জন্য লোকসংস্কৃতি CD-Rom আর ইন্টরনেটের মাধ্যমে বাজারে ছড়ানো হচ্ছে এবং তা অচিরেই তার বিপণন যোগ্যতা হারাচ্ছে এবং বিলুপ্তির পথে যাদুঘরে স্থান পাচ্ছে। অথচ তৃতীয় বিশ্বে গ্রামজীবন অব্যাহত আছে প্রায় একদশক আগের অবস্থাতেই। বছর কয়েক আগে একজন প্রবাসী বাঙ্গালী এবং মার্কিন দেশের অন্যতম বড় কনসালটট্যান্ট বাংলার যাত্রাশিল্পকে নিয়ে এমন একটি পরিকল্পনার পরামর্শ দেন এবং তাঁর বক্তব্য ছিল এর ফলে নাকি দেশের আয় যথেষ্ট বাড়বে।

মজার কথা হল, আমেরিকা বা ইউরোপের বর্ণাঢ্য দেশগুলো প্রতিযোগিতার মুখ দাঁড় করায় না, কারণ তারা জানে যে বেশিদিন এভাবে লোকশিল্পকে টেকানো তো যাবেই না বরং তা সমূলে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যায়। তাই তারা পপ--সংস্কৃতির বিপণনকেই বাজারমুখী করেছে এবং বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে মর্যাদা দিয়েছি। তারা জানে যে Pop-cultrue-এর পরীক্ষিত ব্যাপক ক্ষমতাকে মাথায় রেখে বাজারে ছড়ালে তার অনুবর্তী হয়ে অর্থের লেনদের যেমন বাড়বে তেমনি বিশ্বব্যাপী খোলা বাণিজ্যও সম্ভব হবে। তাই উন্নতশীল বাজারগুলোতে প্রভূত মুনাফা অর্জন করার সাথে সাথে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে তৃতীয় বিশ্বের সমাজে ঢুকছে এবং চিরাচরিত লোক আঙ্গিকগুলো প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ইতমধ্যেই ধুঁকছে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় বাজারেই অপাঙতেয় প্রমাণিত হবে। আর উন্নতিশীল বাজারের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের দলের উপর বিশ্বায়ন সহজেই দখলদারি কায়েম করা সম্ভব হবে। নজরুল, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ, আল-মাহমুদ থেকে যাবেন শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীর মননে। এটাই তো স্বদেশ ভোলানো বিশ্বায়ন!

এই পরিস্থিতিতে গরিব বা উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে অভ্যন্তরীণ শ্রেণি সংগ্রাম উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত ধোঁয়াশা ও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি পরিবর্তন ঘটার ফলে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেনিবৈষম্য সাংঘাতিকভাবে বজায় থেকেও বিশ্বায়নের

৩৯৮. Rawland Lorimar, *Mass Communication*,ibid, p.17-18

প্রভাবে মানুষের শ্রেণিঅস্তিত্ব আজ সত্যিই বিপন্ন। একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণির প্রবল শক্তি সঞ্চয়ের ফলে দেশীয় ক্ষেত্রে শ্রেণিশোষণের তীব্রতা বহুগণ বৃদ্ধি যার ফলে অধোশ্রেণির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন এবং অন্যদিকে নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রের জন্ম হয়েছে লগ্নি পুঁজির নেতিবাচক সঞ্চয়ের ফলে যেখানে সাধারণ মানুষের কোনো ঠাঁই হয়নি।

নোয়াম চমস্কি তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহৃত 'শ্রেণিযুদ্ধ' এবং 'অর্থনৈতিক শ্রেণি' এই দুটি শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "These are the terms that are unusable in the U.S., but now they are using them. It is extemely interesting to see how they are putting it. They said that there is a class war developing between ordinary working class blocs that's on the one side and they are an economic class-- they said that and then the elites who are oppressing them, who happen to be the liberals. The elites who are oppressing them are the elitist liberals with their crazy countercultural values. Who stands up for the ordinary working-class blocs? The socalled conservatines, who are infact doing everything they can to destory them. That's the class war."[399]

নয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও একই পর্যয়ের অত্যাচার কায়েক করেছে স্থানীয় অর্থপ্রভু শ্রেণি। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্রের সূচনায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত এবং ক্ষেত্রবিচ্ছিন্ন প্রান্তবর্তী শ্রেণি এই অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, বিতাড়িত হচ্ছে যেখানে সভ্যতার উত্তর আধুনিক ঔজ্জ্বল্যের লেশমাত্র পড়ে না। আর একই সঙ্গে এই সার্বিক বৈষম্য অর্থনৈতিক দুর্বল শ্রেণির চিরায়ত সংস্কৃতির আঙিনাতেও থাবা বসিয়েছে এবং সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করে আরও বিপথগামী করে তুলেছে। মূলত আজকের সমাজে অস্থিরতা, হিংসা প্রভৃতি এই বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত হতাশারই বহিঃপ্রকাশ।

চমস্কি বলেছেন, কিছু অল্পসংখ্যক মানুষের জন্য অপর্যাপ্ত সম্পদ, সুযোগ এবং অন্তহীন সরকারি নিরাপত্তা খুবই প্রয়োজন, তারা মুখে খোলা বাজারের দাবিতে সোচ্চার হলেও নিজেদের জন্য সরকারি রক্ষাকবচটির

---

399 Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid, p.25

দাবিও সর্বাগ্রে করে। তারা মোটেই নিজের ক্ষেত্রে মুক্তবাজারতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে চায় না। তিনি বলেছেন: "They want a powerful welfare state, directing resources and protectio to them. So on the one hand you have a powrful welfare state for a small sector of population. For the rest those who you need to do the dirty work, you pay them a pittance and if they won't do it, get somebody else. A large part of them are just superfluous. Yu don't need them at all. In the third world, may by you send out death squads. But in the U.S. you lock them into urban slums... if that won't work just throw them into jail."[400]

প্রতিযশা সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গ্যারি ডে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ মন্দা চলার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের অধিকার দুইই বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং উৎপানশীল শিল্প-সংস্থাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অতি সহজলভ্য দ্রব্যের প্রয়োজনেও এখন বিদেশি দ্রব্যের কথা ভাবতে হচ্ছে। পাশাপাশি পরিসেবাভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অনন্যোপায় উন্নতি ঘটছে, যা যে কোনো সমাজের চিরাচরিত শ্রেণি অবস্থানকে পাল্টে দিয়ে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জন্ম দিচ্ছে Neo-Hegemony বা নয়া কর্তৃত্ববাদের যা বিশ্বায়নের নামে তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকট মেটানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে এই প্রসঙ্গটির কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুরি।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যেভাবে খোলা বাজার অর্থনীতির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ঘটাচ্ছে তার ফলে দেশের আমদানি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদারিকরণের নীতি গৃহীত হওয়ায় দেশীয় বাজারগুলোতে নিজস্ব উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো একটা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে তাদের বেশিরভাগের অকালমৃত্যু ইতোমধ্যেই ঘটছে। উপরন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে ঢালাও বেসরকারিগণের WTO প্রস্তাব প্রয়োগের ফলে লাভজনক সংস্থাগুলোর কর্মীসংখ্যাও কমানো থেকে শুরু করে একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দেশীয় উৎপাদনশীলতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেই শূণ্যস্থান পূরণে ধেয়ে আসছে বিদেশি সংস্থাগুলো। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষের স্বাভাবিক গড় ক্রয়ক্ষমতা কমছে তেমনি চাহিদার

---

[400] Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980*,ibid, p.29

মাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণে কমছে। উৎপাদনশীলতার ক্রমহ্রাসের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে পরিসেবাভিত্তিক প্রচুর সংস্থা জন্ম নিচ্ছে যা দেশি এবং মূলত বিদেশি উৎপাদনের সপক্ষে প্রচার এবং সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতদিনকার প্রায় জন্মগত রাষ্ট্রীয় পরিসেবাগুলো বেসরকারিভাবে সরবরাহ করছে। এর দ্বারা সমাজের একেবারে উচ্চশিক্ষিত অংশে কিছু চাকরির সুযোগ বাড়ছে যারা শুধু পরিসেবা বিতরণের কাজটির তত্ত্বাবধান করছে অর্থাৎ অন্যান্য ধনবান দেশগুলো এই আপাত অতিরিক্ত মেধা তৃতীয় বিশ্ব থেকে আমদানি করছে।[৪০১]

এই ব্যবস্থা কায়েমের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চলছে এক নয়া-প্রভুত্ববাদ বা কর্তৃত্ববাদ যার মাধ্যমে আসলে পশ্চিমা রাষ্ট্রীয় প্রভূত্ববাদ উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াই চলছে বিশ্বজুড়ে। গত দশকের প্রারম্ভে সোভিয়েতের পতনের কালে রক্তক্ষয়ী উপসাগরীয় যুদ্ধ এই প্রভুত্ববাদেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। সেইসময় থেকে আজ পর্যন্ত এই নয়া প্রভূত্বাবদ উন্নতিশীল সমাজগুলোর অভ্যন্তরীণ শ্রেণি-সংগ্রামের সত্যতাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। পক্ষান্তরে সমাজগুলোও ক্রমাগত অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা হারানোর ফলে এবং উৎপাদনের লাভ থেকে সুফল পাওয়ার প্রশ্নে ক্রমাগত বঞ্চিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন বেকারত্ব বেড়েছে ভয়াবহভাবে তেমনি পরিসেবা ক্ষেত্রে এই নয়া চাকরিজীবী মানুষের সমাজে শ্রেনিগত অস্তিত্ব এক অভূতপূর্ণ সংজ্ঞাহীনতায় ভুগছে এবং কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়ছে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব এবং মর্যাদাও। এই পরিস্থিতি নিতান্ত দেশীয় নয় বরং সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক। তাই যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপের নেপথ্যে প্রভূত অর্থযোগান পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছে। ভারতবর্ষীয় বামপন্থীরা অন্তত আজ থেকে পনের বছর আগে এই নয়া প্রভূত্ববাদী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। আজ কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটাই আয়ত্তের বাইরে।

অধ্যাপক গ্যারি ডে'সহ অনেকেরই বক্তব্যের সারকথা হল, যে পথে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া সাম্প্রতিক বিশ্বে সংঘটিত হচ্ছে তার দ্বারা বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক নির্ভরতা, আদানপ্রদানের নামে যে নয়াসাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার দ্বারা কোনো দেশেরই অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবৈষম্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটছে না বরং একে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে এবং তার ফলে শ্রেণি বিভাজনের

৪০১. Professor Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, *Communication for Development in the Third World*, London: Sage Publications, 1998, p.29-32

চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তন ঘটছে এবং আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণিহীনতা বা Class-less অবস্থা তৈরি হচ্ছে। এইভাবে মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে মূল্যহীন করার একটা চক্রান্ত সারা বিশ্বজুড়ে।

মার্কিন প্রেক্ষাপটে শ্রেণি অবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে নোয়াম চমস্কি বলেছেনঃ "The civil society has been basically destroyed. Family structure has been devastated. There is a powerful money state, but it is a welfare for the rich. That's an unusal system. And it comes from having a highly class-conscious business class and not mauch in the way of organized oposition."[402]

গোটা পৃথিবীতেই এলিট শ্রেণি উজ্জ্বল। গণমাধ্যমে তাদের উপস্থিতির মাত্রা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, নয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রান্তিক সমাজ অবস্থানের অস্তিত্বটাই মুছে গেছে। কাজেই এক অভূতপূর্ব আপাত শ্রেণিশূণ্যতা তৈরি হচ্ছে।

অধ্যাপক গ্যারি ডে বলেছেন, However, the development the consumer society dissolved the traditional links between class and culture by appropriating elements associated with differnet groups and combining them in a commodified form."[403]

এই পণ্যায়নই বিশ্বে মানুষের মধ্যে চিরাচরিত শ্রেণি অবস্থাগুলোকে অতিরিক্ত করে দিচ্ছে, ফলে সমাজের এলিট সংস্কৃতিটাই সবার সংস্কৃতি বলে ঢালাও প্রচারিত হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যেন, 'শ্রেণিহীন' একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে।

এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণে আমেরিকার নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘের জন্ম হলেও তার কর্মকাণ্ড এককথায় স্তিমিতই ছিল দুটি সুপার পাওয়ারের পরস্পরের চোখরাঙানিতে। কিন্তু ১৯৮৪ সালে একদিকে গর্বাচভের গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকা ঘোষণা আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে মুক্তবাণিজ্যের লক্ষ্যে উরুগুয়ে রাউন্ড

---

[402] Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid, p.32

[403] Garry Day, Quted in Eric Thor becke, *The Tendency Towards Regionalization in International Trade,* 1928-1956 (The Hague : Martinus Nijhoff, 1960), p.206

আলোচনাচক্র গোটা বিশ্বে প্রথম বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ভ্রুণ তৈরি করল। এই পর্যয়েরও অবসান ঘটল সোভিয়েতের পতন এবং পশ্চিমা অধিকতর মুক্ত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে 'গ্যাট' চুক্তির মাধ্যমে। এর মাঝে আরও একটি প্রস্তাব বাধ্যতামূলকভাবে এসেছিল তা হল CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) যাতে স্বাক্ষর করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে প্রভূত চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ফলে একদিকে চাই খোলা মুক্ত বাণিজ্যাঞ্চল অন্যদিকে সামরিক প্রভুত্ব এই দুই দাবিতে পশ্চিমা বিশ্ব খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এই উদ্দেশ্যে শুরু হল অনুন্নত দেশগুলোর উপরে ঢালাও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ঢালাও কর্মসূচি। ভারতবর্ষে প্রবেশ করল MTV-র মতো মিউজিক চানেলগুলো। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সংস্কৃতির এহেন মুক্তায়নের লক্ষ্যে সমাজের ধনাঢ্য অংশ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। ফলে এখানে কেনিচি ওমের বক্তব্যের মর্মার্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। আসলে আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম মূল উপজীব্যই ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত প্রাচীন দেশগুলোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির সরাসরি রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্বায়নের জলুস প্রতিষ্ঠা করা। তবে যে পটভূমিতে বিশ্বায়নের একদিকে যেমন অর্থনৈতিক অসাম্য, ভয়াবহ বেকারত্ব, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সামাজিক শিথিলতা প্রভৃতি বিষিয়গুলো বিদ্যমান, তেমনি অন্যদিকে পরিসেবাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় তথাকথিত সাদা কালোর আধিকারিকবৃন্দের অতি-আধিক্য সমাজে তথাকথিত শ্রেণি অস্তিত্বই মুছে দিচ্ছে। গোটা মানবসমাজকে সমাজের অভ্যন্তরের যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে বিশ্বায়নের জলুসকে গণমাধ্যমের দ্বারা পৌঁছা দেয়া হচ্ছে।

এজন্য সমাজবিজ্ঞানী জোনাথন ফ্রিডম্যান তাঁর "কালচারাল আইডেনটিটি অ্যান্ড গ্লোবাল প্রসেস" গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন, "With the distegration of Eastern Bloc and the violent fragmentation occuring in the former Soviet Empire, as well as the crisis in the west, a global sysematic understanding of the contemporary world may have becoming something of a necessity. But in the midst of the crisis, a great deal of current enlightened literature on globalization has adamently

avoided social issues, concentrating instead on the sometimes spectacular products of globalization process themselves."[404]

জোর করে মানব সমাজকে সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় সমাজে অভ্যন্তরীণ শ্রেণিসংগ্রাম চলতে থাকা সত্ত্বেও মানুষের মনকে অন্যপথে সরিয়ে বিশ্বায়নের চোখধাঁধানো মুষ্টিমেয়র দাপট দিয়ে অবদমিত করে রাখার প্রক্রিয়া দারুণভাবে অব্যাহত আছে। এই বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট নয় বরং সামাজিক ক্ষেত্রে উত্থিত যাবতীয় প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ। অধ্যাপক ডে যদিও আশা প্রকাশ করেছেন যে এতৎসত্ত্বেও শ্রেণিসংগ্রাম এবং এর প্রকাশকে দমিয়ে রাখা যাবে না, কারণ তৃতীয় বিশ্বে স্বাভাবিক গতিতেই শ্রেণিবৈষম্য উত্তরোত্তর বাড়ছে। শুধুমাত্র গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানে এর জায়গা হচ্ছে না। কারণ সেই জায়গায় বিশ্বায়নের চাকচিক্যের সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক উত্থান, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ফলাও করে দেখানো হচ্ছে। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন যে এর ফলে তথাকথিত শ্রেণিবিচারের সূচকগুলো হয় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে না হয় ক্লিশে করে দেয়ার একটা নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত আছে।

অধ্যাপক ডে বলেছেন, "During the course of the century, class was incresingly perceived in culture rather than economci terms. The main reason for this shift of emphsis was the decline of manufacturing industry and the growth of service economy, which blurred the old class boundary between manual and non manual labour. The measurement of class according to occupation, therefore, becomes more of a problem."[405]

একদিকে পরিসেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সাথে সাথে কায়িক-অকায়িক শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নত বিশ্বেও শ্রমের মূল্যায়নের চিরাচরিত প্রথাগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়া হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়নের দাপটে অকেজো হতে শুরু করেছে। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, এর ফলে সৃষ্টি হওয়া white collar employee-দের অস্তিত্ব সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের সামগ্রিক চিত্রটাই ফিকে করে দিয়েছে। তাই

---

404 Jonathon Freedman, *Cultural Identity and Global Prosess*, Manila: Milinium Books, 2009, p.236

405 Garry Day, Quted in Eric Thor becke, ibid, p.207

অধ্যাপক ডে বলেছেন, শ্রেণি অবস্থান নিরূপনের সূচকগুলোই ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। তাহলে কি গোটা পৃথিবীর মানবসমাজ শ্রমের অধিকারের দাবিতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে সরে আসবে? এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক অবস্থানের বদলে সমাজের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের অধিকারেও বিশ্বায়ন আঘাত হেনেছে, কায়েম করেছে নতুন কর্তৃত্ববাদের। গোটা বিশ্বকে সংস্কৃতির নিরিখে একটি গ্রামে পরিণত করতে চাইছে। উদ্দেশ্যটা আসলে কি তা আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কায়েম করা হচ্ছে সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমীভবন সেখানে সর্বশ্রেণির মানুষ একই মেরুতে অবস্থান করতে বাধ্য হবে। ফলে তৈরি হচ্ছে এক আপাত শ্রেণিশূণ্যতা যার নেপথ্যে মানুষের দুঃখদুর্দশা সীমাহীন আকার ধারণ করেছে।[৪০৬]

তবে একথাও বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে পারে না, যেমন অভাবের তাড়নায় আর্জেন্টিনায় যে গৃহযুদ্ধ চলছে তা যে এককথায় এই বিশ্বায়নের ফল এতে কোনো সন্দেহ নেই। একদিকে যেমন প্রভাবশালী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি কায়েম করার চেষ্টা করে চলেছে তেমনি বৃহত্তম নিপীড়িত শ্রেণি তার অস্তিত্বের সংগ্রামে কিন্তু গোটা পৃথিবী জুড়ে নেমে পড়েছে। অধ্যাপক ডে বলেছেন যে, এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে ধনতন্ত্রের নয়া শোষণ প্রক্রিয়া শ্রমজীবী শ্রেণিকে বিভক্ত করে অবদমিত করতে চাইছে। সমাজবিজ্ঞানী র‍্যালফ মিলিব্যান্ড বলেছেন "The working class not only exists, but the the term should be expanded to include al lwhite-collar employees, since they too produce the surplus value for the capitalist."[407]

এ কারণেই শ্রমজীবি শ্রেণিকে ধ্বংস করে ফেলা যাবে না বরং সমস্ত শেতাঙ্গ পরিসেবাজীবীদেরও শ্রমিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কারণ তাঁরা পরোক্ষভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজে শোষিত হচ্ছে। অধ্যাপক গ্যারি ডের ভাষায়, "The evidence seems to suggest that there exist as dominant class with the capacity to create and maintain conditions under which it is able to appropriate surplus labour from a subordiante class. It is

---

406. K. Stade, *Maneging Development : State, Society and International Context,* New Bari Park: Sege, 2000, p.21-27

৪০৭ র‍্যালফ মিলিব্যান্ড, উদ্বৃতিঃ হায়দার আকবর খান রনো, c‖Re\`‡' i gZ¨NÈ\, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১ পৃ.১৮৬

this relation which in Marxist terms, is the source of poverty and inequality.”[408]

একথা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সাবেক প্রভাবশালী শ্রেণি সমাজ থেকে বিশ্বায়নের অব্যবহিত পর্যায়ে নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র পর্যন্ত এই শ্রেণিশোষণ চূড়ান্তভাবে অব্যাহত রয়েছে। এইরকম একটি অদ্ভূত অবস্থায় যেটি সবচেয়ে বেশি একমাত্র গণমাধ্যম দ্বারা ঢালাওভাবে প্রচারিত হয় তা হল দরিদ্র, দুর্বল, শ্রেণিভূক্ত সমাজে অনুবর্তী সংস্কৃতি বা subculture হিসেবে খুন, জখম, মাদক, দেহব্যবসা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি। এইভাবে গোটা অর্থনৈতিক, সাস্কৃতিক দুর্বল শ্রেণির থেকেই আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণিভুক্ত সমাজের সার্বিক পৃথকীকরণ চলছে। এটাইতো নয়া পুঁজিবাদী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়। আর ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা, অভাব মূলত শহরকেন্দ্রীক এই শ্রেনির মধ্যে তীব্র অসহিষ্ণুতা তৈরি করছে। পৃথিবীর যে কোনো শহরের এই ব্যস্তজীবন এইভাবেই তৈরি হয়েছে, ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে বা করে দেয়া হচ্ছে মূলস্রোত থেকে। এর মাধ্যমে এক সার্বিক সংস্কৃতির বিপণন উত্তর-আধুনিকতার সংজ্ঞায় আত্মবিপণনযোগ্যতা এবং ব্যক্তিস্বার্থবাদের সূচনা ঘটেছে। শেষ করে দেয়ার চক্রান্ত চলছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস এবং ভবিষ্যত।

অধ্যাপক গ্যারি ডে বলছেনঃ “The culture industry can thus be said to take the value of individualism from the middle class and the value of the group from the working class, abolishing tension between them so that each becomes a mirror of the other.”[409]

যেহেতু সংস্কৃতির বিপণনযোগ্যতার প্রাণভোমরা হল এলিট এবং উচ্চবিত্তরা, ফলে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবি শ্রেণির সংস্কৃতিকে একই স্তরে টেনে নামানো হয়েছে।

তাই অধ্যাপক ডে বলছেনঃ “Culture industry represents the triumph of the bourgeoiside, buit it is a hollow triumph since for them, too, personality

[408] Garry Day, Quted in Eric Thor becke, ibid, 208

[409] Garry Day, Quted in Eric Thor becke, ibid, 2010

scarcely signifies anything more than shining white teeth and freedom of the body odour and emotions."[410]

তবে এই বুর্জোয়া সংস্কৃতিতন্ত্রের গভীরতাও অতি অল্প। ফলে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রামকে জিইয়ে রাখতে হবে। শ্রমজীবীকে নিরন্তর শ্রেণি-সংগ্রামে সামিল করতে হবে আরও বেশি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুস্থ সমাজগঠনের দাবিতে। তথাকথিত আপাত পুঁজিবাদী শ্রেণিশূন্যতা কখনই সমাজের সামগ্রিক উত্তরণের পথ হতে পারে না। শ্রেণিবৈষম্য এবং তৎভিত্তিক অবিচার এবং বঞ্চনা প্রভৃতি পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিক পরিণতি। ফলে সমাজে শ্রেণিগত সংগ্রাম কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত। সারা পৃথিবী জুড়ে যে ভাঙন মানবসমাজে নেমে আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মানবশৃঙ্খলকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে শ্রমের মর্যাদার দাবিতে এবং এই পথেই তথাকথিত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও তীব্রতর করতে হবে। নিক ডেভিস তাঁর 'ডার্ক হার্ট' গ্রন্থে বলেচেন যে, মার্গারেট থ্যাচার এবং তাঁর পরবর্তী দুই দশকে ক্রমান্বয়ে উদীয়মান ব্রিটিশ যুবসমাজকে সম্পূর্ণ বেকারত্ব ও অভাবের রাস্তায় ঠেলে দেয়া হয়েছে এবং এমনকি বেকার-ভাতা পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ব্রিটেনের সরকার প্রায় ১২ বিলিয়ন পাউণ্ড সঞ্চয় করতে পেরেছে। যার অধিকাংশ অর্থ অভিজাত শ্রেণির কর-ছাড়ের দরুণ উদ্ভূত ঘাটতি মেটাতে ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও সারা দেশজুড়ে ভয়ঙ্কর বেসরকারিকরণে প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে মার্গারেট থ্যাচারের সরকার পানিকে পর্যন্ত বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছিল। পানির বেসরকারি মালিকরা এই পরিসেবা তথা পণ্যটিকে সাধারণ ছড়িয়ে ছিটেয়ে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়াকে মোটেই লাভজনক মনে করল না। তারা শহরের মাঝে কোনো একটি পাম্প থেকে বালতিতে জল নিয়ে যাওয়াকে অনেকবেশি কার্যকর বলে ঘোষণা করল এবং এতে সম্পদের বন্টন ব্যবস্থার সুফল পাওয়ায় জাতীয় নেট উৎপাদন হার উন্নতও হল।[৪১১] এরই নাম বেসরকারিকরণ। শুধু ব্রিটেনই নয় আমাদের ভারতবর্ষেও অনুরূপ পরিস্থিতির সাথে সাথে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চাপে সরকারি মোষণের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[410] Garry Day, Quted in Eric Thor becke, ibid, 215

[411] Nick Device, Dark Heart, উদ্ধৃতিঃ দেবাশিষ চক্রবর্তী, ivóieÁvb ZË I ciZôvb, কলিকাতাঃ নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সী (প্রা) লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪

বিশ্বায়নের নামে, খোলা বাজারের নামে আন্তদের্শীয় নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বিদেশী শক্তিধর দেশগুলোর হাতে তুলে দেয়ার ফলে বাজারে শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এর উপর বর্তমান সরকার যেভাবে WTO-এর চাপে ঢালাও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ব লাভজনক শিল্পগুলোর উপরেও তাতে শ্রমের প্রকৃত মূল্য দূরে থাক, ভবিষ্যতে পানি, এমনকি অক্সিজেনের বেসরকারিকরণও ঘটতে পারে। মূলত মানুষের তথাকথিত শ্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিগত অবস্থান এবং দুর্দশা চরমে উঠেছে। পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লিখিত পরিসেবা ক্ষেত্রের চাহিদা কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ উৎপাদনের অধিকার এবং তার থেকে আয় সুনিশ্চিত হলে তবেই কোনো সমাজ পরিসেবা শিল্পের সুফল অর্জন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রটি হঠাৎই অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে পরিসেবা ক্ষেত্র উৎপাদন শিল্পের বিকল্প হতে পারে না। ফলে এদেশে মানুষের দুর্দশা বাড়ছে বই কমছে না, কিন্তু অন্যদিকে মানুষের শ্রমভিত্তিক শ্রেণি অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। তৈরি হচ্চে একের পর এক নতুন নতুন শ্রমগোষ্ঠী, যেখানে মানুষের নূন্যতম মানবিক শ্রমসত্তার কোনো সুস্পষ্ট অস্তিত্ব নেই।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক প্যাট বার্কার রচিত ‘Liza’s England’-এর লাইনগুলো অবশ্য-স্মরণীয় যেখানে বৃদ্ধ লিজা বলেছেন, “We had a way of life a way of treating people, you didn’t just go to church one day a week and jabber on about loving your neighbour. You got stuck in seven days a week and bloody did it, because you know if you didn’t you wouldn’t survive.”[412]

যখন প্রশ্নটা অস্তিত্বের বিলুপ্তির, তখন একে প্রতিরোধ করার লড়াই চলবে, একজন কার্লো শহিদ হবে এবং হয়ত আরও অনেকে। কিন্তু গোটা বিশ্বের নিপীড়িতকে বুঝে নিতে হবে যে, এই লড়াই সত্যিই বাঁচার লড়াই।

[412] Nick Device, Dark Heart, উদ্বৃতিঃ দেবাশিষ চক্রবর্তী, i√ó‖eÁ√b ZË I c‖Zô√b, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০

অষ্টম অধ্যায়: বিশ্বায়নের সংকট ও সম্ভাবনা

৮.১. বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বায়নের প্রবর্তকরা শান্তি, পরিবেশ-প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক মুক্তিকে বিশ্বের প্রধান সমস্যা হিসেবে গণ্য করে এ সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা ও নীতি প্রবর্তন করেছেন। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলো সর্বপ্রথম এ সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে উত্থাপন করে এবং গর্বাচভের 'নব্যচিন্তাধারার' পরে পুঁজিবাদী এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়ন একটি বিশ্বশক্তির বা বিশ্ব-সিস্টেমের মাধ্যমে মনে করে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাহায্যে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রত্যেক দেশের বর্তমান অবস্থার উপরই বাস্তবায়িত করা উচিত, এমনটিই মনে করে বিশ্বায়ন। এখন কথা হলো, বিশ্বসম্পর্ক কীভাবে তৈরি হতে পারে? পুঁজিবাদী দেশগুলো-যেমন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ও জাপান মনে করে বিশ্বায়ন মানুষের বর্তমান জীবনব্যবস্থায় একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তৈরি করতে সক্ষম; যেখানে উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও সহমর্মিতা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবন ও পণ্য উৎপাদনের শর্তকে মানবিক করবে। কারণ এ দেশগুলো মনে করে 'বিশ্বায়ন' বিশ্বশক্তির ক্ষমতা দখলের অভিযানে ও লড়াই শুধু নয়।[৪১৩]

অন্যদিকে, একথাও সত্য যে, বিশ্বায়ন বর্বর আদর্শগুলোর বিপরীতে কোনো সভ্যসম্পর্ক তৈরি করে না। কারণ মানুষের জীবন যে বিপদসংকুল, সে ব্যাপারে বিশ্বায়ন একমত। বিশ্বায়ন 'নব্যচিন্তাধারার' মতো কোনো আদর্শগত সম্পর্ক তৈরির প্রস্তাব করে না। বিশ্বায়ন স্বীকার করে না যে নিজের 'উর্ধ্বতন' মানুষের একটি মৌলিক অধিকার এবং উত্তরণের জন্যই ব্যষ্টি, সমষ্টি, জাতি ও রাষ্ট্র বেঁচে থাকে। এই নিজের 'উর্ধ্বতনে'র বেঁচে থাকার পেছনে পুঁজিবাদী আগ্রহ ও উদ্দেশ্যই কাজ করে, যা বিশ্বায়নের অন্যতম গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনে প্রত্যাশা তৈরি করে। বিশ্বায়ন প্রত্যাশিত সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক বিশ্বসম্পর্ককে সাদর মোবারকবাদ জানায়।

এখানে একটি ভিন্ন প্রশ্ন তোলা যায়। এই অস্থির পৃথিবীতে বিশ্বায়ন কী ভূমিকা পালন করতে পারে? অমানবিকতা মানবাধিকারের বিপরীত; যা অতীতে ছিল, এখনও আছে। ইতিহাস তাই বলে,

---

[413] M Arjan Svetlic, *Challenges of Globalization and Regionalism in world economy, Global Society,* vol.10 No.2 London: Macmillan, 1991, p.108

মানবজাতিকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। মানুষ শোষিত হয়েছে। মানুষ আজকে শোষণকে তাই নিশ্চিত অস্ত্র আর মনে করে না। মানুষ এখন বিশ্বায়নে মেতে উঠেছে। এই চিন্তাধারা অনুসারে মানুষ নিজের উর্ধ্বতনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তৈরি হবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর আপেক্ষিক অর্থনৈতিক শক্তির উপর।

বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানকে বাধ্যতামূলক মনে করে না, যা কোনো সীমারেখার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়ন মনে করে যে মানুষের নিজের উন্নয়ন নিশ্চিত নয়। আর তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্কের কথা বলা হয় তার জন্যে নতুন নিয়ম-নীতিরও প্রয়োজন নেই। বিশ্বায়ন একটি শিল্পবিপ্লব-উত্তর অর্থনৈতিক রাজনীতি, যা চৌকষ বুদ্ধির চাতুর্যে ধাপে ধাপে তৈরি হয়, যেমন ১৯২১ সালে তৈরি হয়েছিল 'নব্য-অর্থনৈতিক রাজনীতির' পরবর্তী ধাপ। ঐ সময়ে তৈরি হওয়া ব্রেটন উড প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক বিশ্বসম্পর্কের একটি নতুন গঠনকাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছে। এই নীতিতে অনেক ক্ষেত্রে আমুল অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর আলোকেই বিশ্বায়ন বলতে তাই আমরা বুঝি পুঁজিবাদের আদর্শে এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন। এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে বিলীন বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া দুটো বিশ্বশক্তির মতবিরোধমূলক আদর্শের সংশ্লেষে। মতবিরোধমূলক এই সম্পর্কের আবার রয়েছে নামামাত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৪১৪]

৮.২. পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন বিশ্বসমস্যা সমাধানের একটি নতুন চিন্তাধারা। বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ শান্তি চায়। পুঁজিবাদের এই ভূমিকার অর্থ হলো, পুঁজিবাদ নতুন চিন্তাভাবনায় শান্তি সম্পর্কে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। পুঁজিবাদ তার পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমেই মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে বলে মানুষ বিশ্বাস করবে। এককথায় মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পুঁজিবাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। তবে অন্যদিকে

---

414. Paul Hirst and Grahame Thomson, *Globalization in Question. The Internaitonal Economy and the Possibilities of Governance,* Cambridge/Malden: Polity Press, 1998, p.1.

অনেকেই মনে করেন যে সমাজতন্ত্র এখনও দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে আর পুঁজিবাদ এ মুহূর্তে বিশ্বসমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। আর তাই বর্তমান সময়টি পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ অনুকূলে নয়।[৪১৫]

অনেকের বিশ্বাস বিশ্বায়ন 'সাবেকি' চিন্তাধারার একটি পরিবর্তিত রূপ মাত্র। কিন্তু এ থেকে শান্তি, প্রকৃতি-পরিবেশ ও প্রগতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে মানবীয় উন্নয়নশীল উৎপাদন সমাজতন্ত্রের বা সমাজতান্ত্রিক অবস্থার আলোকেই সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বায়নে যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে তা সাবেকি চিন্তাধারার আলোকে ঘটছে না, বরং শান্তি, প্রকৃতি-পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কথা বলা ভুল হবে না যে, বিশ্বায়ন সমকালীন একটি চিন্তাধারা হিসেবে প্রকৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে মানুষকে রক্ষা করছে। বিশেষ করে এটি অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিকে রক্ষা করতে সাহায্য করছে এবং তা রক্ষিত হচ্ছে স্বজাত্যবোধের সাহায্যে। তবে বিশ্বায়ন 'নব্যচিন্তাধারার' মতো সাবেকি সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শান্তির প্রতীক, শান্তির ফসল, শান্তির প্রত্যাশা এবং মানসিক তৃপ্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। এ প্রত্যাশা প্রকৃতি-পরিবেশ ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করে না এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিকীকরণ বা ব্যষ্টির সামাজিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে না। এককথায়, পাশ্চাত্যের সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান বিশ্বায়ন প্রদান করে না।

বিশ্বায়ন আসলে এমন কোনো চিন্তাধারা নয় যা সমষ্টির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টি বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের নীতি হতে পারে না, এমনকি তা জার্মানির রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য নয়। তবে কোনো রাজনৈতিক দল দেশে বা বিদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবে বিশ্বায়ন সম্বন্ধে তাদের পার্টি কমিশনে উল্লেখ করতে পারে, যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তা করেছে।

আজকের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদী চিন্তাধারায় শান্তি, প্রকৃতি-পরিবেশ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় আপন স্বার্থের বাইরে কখনই প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে পরিবর্তন বলতে বোঝায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। কিন্তু বিশ্বায়ন মানবতা ধ্বংসের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখে না। এতে ছোট-বড় জাতি ও প্রজাতি সত্তাকে সুস্পষ্টভাবে পুর্নগঠিত করা হয় না।

৪১৫. তুলনীয়: মিখাইল এস, গর্বাচভ, †c‡i‡¯¿qKv: ¶ØZ¿q i¤k ¶ecøe, মিউনিখ: ডিটিভি, ১৯৮৭, পৃ.১২-১৭; জগলুল আলম, পেরেস্ত্রোয়িকা, ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ.৭৭

মানবিকতা ধ্বংস হচ্ছে, বিশ্বায়ন তা স্বীকার করে না। বিশ্বায়ন পরিবর্তন বিমুখ নয়, তবে বিশ্বসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা সময়োপযোগী মনে করে না। এ সম্পর্ককে যদিও মূল্য প্রদান করে। এতে পুঁজিবাদকে উন্নয়ন মডেল হিসেবে বাতিল করা হয় না। এভাবেই বিশ্বসম্পর্কের মূল বক্তব্য ও শর্তকে পুঁজিবাদী আদর্শে গ্রহণ করা হয়। পুঁজিবাদ তার পরিচিতি ও প্রভাব অক্ষুন্ন রাখে।[৪১৬]

বিশ্বায়ন একদিকে যেমন একধরনের বিশ্বসম্পর্ক, অন্যদিকে তেমনি তা অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাহায্যে বিশ্ববাজারে পণ্যসম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করে এবং উৎপাদনকে আবশ্যক বলে মনে করে। এ প্রচেষ্টায় বিশ্বসম্পর্ক পারস্পরিকভাবে আরো জোরদার হয়, পণ্য-উৎপাদক পণ্যের মালিক হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং তার জন্য স্বাধীনভাবে চুক্তি, শর্ত, নিয়ম, বিধান, বৈধতা ইত্যাদি প্রণয়ন করে। এতে পণ্য ও পণ্য-উৎপাদকের বৈধ নিয়মাবলিকে সময়োপযোগী করে তোলা হয় ঠিকই, তবে এই নিয়মগুলো কোনো পরিবর্তনশীল উন্নয়ন নয়, বরং ঋণগ্রহণ নির্ভরশীলতার নির্দিষ্ট অবস্থাকে বোঝায় মাত্র। ফলে পণ্যসম্পর্ককে তা আধিপত্যমুক্ত করতে পারে না। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বায়নকে একটি 'নব্য-উপনিবেশবাদ-উত্তর চিন্তাধারা' বলে মনে করে। অনেকে মনে করেন, এই চিন্তাধারা পাশ্চাত্যে অবস্থান তৈরি করার ব্যাপারে সম্ভবত আরো উপেক্ষিত ও অবহেলিত হবে। কারণ পাশ্চাত্যে সবকিছুই বহু আগে থেকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে উৎপাদন ও গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাইতে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি সমাদৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন ও গণতন্ত্রকে পুনর্গঠিত করা। কিন্তু পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, এই বিশ্বসমস্যার মোকাবিলায় বিশ্বায়ন কোনো অনুকূল ও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। আবার এদের কেউ কেউ মনে করেন মানুষ বিশ্বসমস্যাকে কেন্দ্র করে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং তাদের মুক্ত করা উচিত।

কার্যকর ও কাম্য বিশ্বায়ন সম্পন্ন করার জন্য মানবিকতার সঙ্গে এর একাত্মতা ও সংহতি তৈরি করা উচিত। তাহলে এই অবহেলিত মানুষগুলো শতভাগ নিশ্চিত সমস্যাহীন জীবন-যাপন করতে পারবে। অবহেলিত, উপেক্ষিত ও পরাধীন মানুষগুলো তাদের প্রাপ্যের স্বীকৃতি কতটুকু পাবেন এ নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অবশ্য সন্দিহান। তাদের কাছে বিশ্বায়ন হলো ইতিহাস-উত্তর পুঁজিবাদী চিন্তাধারা। মেসিয়ানিক ঐতিহাসিক চিন্তাধারার মতো পাশ্চাত্য মনে করে যে মানুষ একদিন সময়ের মরুভূমিতে

---

416. James Foreman-Peck, *Historical Foundations of Globalization,* UK/USA: Edward Dlgar Publishing Limited, 1998, p. xxiv.

নিঃশেষ হয়ে যাবে। মেসিয়েস বিচ্ছিন্নতা যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করবে এবং জগতকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্তমান পৃথিবী কোনো ক্ষেত্রেই সমতা তৈরি করতে পারবে না।[৪১৭]

পাশ্চাত্যের আরো কিছু পণ্ডিত মনে করেন, বিশ্বায়ন অর্থহীন। কারণ বিশ্বায়ন বিশ্বরাজনীতির একটি সংস্কার মাত্র। এখানে লড়াই ও যুদ্ধের শর্তকে সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু আদতে কোনো সংস্কার হয়নি। যদি সংস্কারই হতো তাহলে এটি 'বৃহৎ পুঁজির শক্তিকে সংকুচিত করতো।' কিন্তু তা হয়নি। আমরা জানি, পুঁজির শক্তি হ্রাস করা হয় গণ আন্দোলনের মাধ্যমে। সংস্কার-রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো গণ আন্দোলনের বিকাশ এবং এই আন্দোলনই সবসময় সম্পদ ও শক্তিকে আক্রমণ করে। পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই রাষ্ট্রীয় বাজেট বৃদ্ধির প্রশংসা করে। তারা তাদের নিজের নিজের রাষ্ট্রকে স্বপ্নের মতো তৈরি করতে চান। এই স্বপ্নের মতো সাজানো পরিকল্পনায় তারা সংস্কার-রাজনীতিকে চালু দেখতে চান, যার সাহায্যে তারা সামাজিক গণতান্ত্রিক ও সংস্কার-রাজনৈতিক সংরক্ষণশীলতাকে অর্থপূর্ণ জীবনীশক্তি বলে মনে করেন। অন্যদিকে সমালোচকরা মনে করেন, নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা শুধুমাত্র বালির উপর ক্ষণস্থায়ীভাবে তৈরি কিছু। রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত রাজস্বের উপরই নির্ভর করে উন্নয়নের জন্যে এবং এই রাজস্ব এত গুরুত্বপূর্ণ যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সুইডিশ মডেল উন্নয়নের কথা, যা পরবর্তীকালে ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গেছে। সুইডিশ মডেল অনুসারে রাষ্ট্র উঁচু হারে কর ব্যবস্থা চালু করে যেখানে রাজস্বের উৎস হারিয়ে যায়, যদিও কর ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাজস্ব তৈরি হয়। শুধুমাত্র বালির উপর ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত পরিবর্তন গ্রহণক্ষমতা সইতে পারে না। আর তাই তা মানুষকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে নতুন 'চিফ আইডিওলজিগুলো' কেবল অর্থহীন শব্দাবলি মাত্র।

এর বিপরীতে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের কাছে বিশ্বায়ন ভ্রান্ত প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তবুও তাঁদের কাছে সবসময় এটি একটি উদ্যোগ। একটি নেতৃত্ব, যেমনটি মনে করেন। এ কথার অর্থ হলো, আজকের বিশ্বায়ন মানুষের কাছে গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে। মানুষ এটিকে অনুমোদন করে। এটি যেমন একদিকে জয় ও সম্মান, তেমনি অন্যদিকে মানুষ একে অভিনন্দন জানায় উন্নয়ন ধারার পরিপূর্ণ রূপ প্রদানের জন্য। বিশ্বায়ন বলতে তাই কোনো নতুন আদর্শকে বোঝায় না, এটি কোনো মতাদর্শ নয়।

---

[417] G. Rees and Smith, *Economic Development*, London: Macmillan Press Ltd 1998, p.149

৮.৩. বিশ্বায়ন: নব্য-পুঁজিবাদ-উত্তর চিন্তাধারা

বিশ্বায়ন 'গৃহকাতরতা' নয়। বৃটেনের রোলান্ড রবার্টসন সাম্প্রতিক বিশ্বায়নকে সমালোচনা করে বলেন যে, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উদ্ভূত এই বিশ্বায়ন গৃহকাতর প্রবণতাকে বিক্ষিপ্ত করেছে।[৪১৮]

বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনশীল সময়ের চারটি প্রসঙ্গ লক্ষণীয় হয়ে উঠছে, যা বিশ্বায়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে:

১। আপন সমাজ যা দেশীয় বিভিন্ন সমস্যাকে বর্ণনা করে; পাশাপাশি দেশীয় ও বাইরের বিশ্বের চাপের মুখে তাদের সম্মিলিত পরিচিত বহুমাত্রিকতার সঙ্গে পুনর্গঠিত করে।

২। ব্যষ্টি মানবজাতি, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদান হিসেবে নিজের পরিসরের বিস্তৃতি ঘটায়।

৩। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো দিন দিন সহজ ও বহুদেশীয় হচ্ছে।

৪। প্রজাতিসত্তা হিসেবে মানবিকতার ধারণা বারংবার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। ব্যাপারিটি এমন দাঁড়াচ্ছে যে, সার্বিকভাবে বিশ্বাযন টিকবে না, কারণ মানবিক বিবর্তনের গুণগত বিভিন্ন পর্যায়ে আছে যা বিশ্বায়নকে গ্রহণ করে না। ইতোমধ্যে নানাভাবে বিশ্বায়ন প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজতাত্তিকদের মতে, মানুষের বিশ্বসম্পর্ক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে যদি তা গৃহকাতরতার বিপরীতে বিশ্লেষণধর্মী ও বিচারধর্মী হয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নস্টালজিক জ্বরকাতরতা সম্পর্কের পরিবর্তে বিশ্বসম্পর্ককে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। এই দেশগুলো তাদের বিদেশ-কূটনীতিতে সাহায্য-সহযোগিতা, সম্পর্ক, প্রায়োগিক মতবিনিময়, উৎপাদন-ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা ও নিয়ম-নীতিকে 'বিশ্বায়ন' উপযোগী করার চেষ্টা করছে। মানুষ এখানে আর আগের মতো সরাসরি প্রশ্ন করে না; কে সহযোগিতা করবে আর কতটুকু করবে? বিশ্বসম্পর্কের প্রয়োজনে সহযোগিতা কাজ করবে, কাউকে অযাচিতভাবে ডেকে আনবার দরকার নেই। এই বিশ্বব্যবস্থায় সহযোগিতার বিষয় হলো 'দেয়া-নেয়ার' উদ্দেশ্যকে সমন্বয় করা এবং পণ্য-বিনিময়ের কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করা। বিশ্বায়নের বিশ্ববাজারে পণ্য বিনিময়ের একটি প্রত্যক্ষ্য বা সরাসরি ব্যবস্থা আছে। এ কথার অর্থ হলো, বিশ্ববাজার যেমন গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রবাহকে গ্রহণ করে,

418. Roland Robertson, 'After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization,' in Bryan S. Turner (ed), Theories of modernity and Postmodernity, London/ thousand Oaks/New Delhi s: SAGE Publications, p. 57.

তেমনি স্বচ্ছ, পবিত্র ও চিরন্তন নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটায়। বিশ্বায়ন কোনো বৈধতা ও আদর্শের পুজারী নয়। সহজ কথায় একে তীব্র ভোগবাদী ও আগ্রাসী বলে উল্লেখ করা যায়।[৪১৯]

বিশ্ববাজারে যা লক্ষণীয় তা হলো, মানুষ তার বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে চায় এবং প্রতিযোগী হিসেবে টিকে থাকতে চায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাহায্যে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে পণ্য-সম্পর্কের চুক্তি পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করে। এখানে সম্প্রসারণ ও সঞ্চয়নীতি একসঙ্গে কাজ করে। সম্পর্ক ও সমঝোতার মাধ্যমে এটা কার্যকর হয়। আসলে এই ব্যবস্থা বিশ্ববাজারে একটি ব্যবসায়িক প্রগতিশীলতা তৈরি করছে। এই প্রগতিশীল সম্পর্ক বা ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তৈরি করে এক ধরনের কার্যকর দমননীতি, যা সবসময় ব্যাপক ও অন্ধভাবে অনুসৃত নীতিতে ভ্রান্ত চেতনার জন্ম দেয়। বস্তুগত, প্রকৃতিজাত, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জিনিসের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। এই জিনিসগুলো পৃথিবীতে এখনো অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। উৎপাদন ক্ষমতার অটোমেশন এবং অনির্ভরশীল উন্নয়নের ধারায় পণ্য উৎপাদিত হয় দমননীতির সাহায্যে। এক্ষেত্রে বাজারের চাহিদানুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হয়। এই পণ্য উৎপাদনে যেমন পুঁজিবাদ, তেমনি সমাজতন্ত্রের বাজারের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। দুটো বিশ্ববাজারই এই অভিন্ন উন্নয়নের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। সমালোচকরা বলেন, আজকের বিশ্ববাজার, যা গর্বাচভের 'নব্য-চিন্তাধারার' পাশাপাশি একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছে, তা আধুনিকতার মতই অমানবিক, ইতিহাস-বিরুদ্ধ ও নিপীড়নধর্মী। এখানে উত্তর-আধুনিকতার মতো মানবিকতাকে গ্রহণ করা হয় না, ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করা হয় না, লোকাচরের জন্য আধুনিকতাকে বাতিল করে না, আর আপন স্বার্থের পরিবর্তে পরের জন্য কাজ করে না।[৪২০]

গত শতাব্দীতে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এবং পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের পরও মানুষের ভেতর একটি প্রশ্ন জাগে-বিশ্বায়নের ঘোষণা ও উদ্দেশ্য সত্য কিনা। আর তাই মানুষ তখনও একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ বামচিন্তাধারাকে সমর্থন করছিল, যা অর্থনৈতিক প্রযুক্তি ছাড়াই সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনকে বাস্তায়িত করবে। এই ধরনের একটি সমাজতান্ত্রিক উত্তরণে সমাজ বা রাষ্ট্র উন্নয়ন থেকে একটি সামাজিক

419. Der Spiegel, 231/1990, p.161; F. Deppe, alter and neuer Internationalisums, in: F Deppe & J. Huffschmid/K.P. Weiner, 1992, Projeckt Europa, Koelnm 1989.

420. Antonio Gramsci, *Selections from Political Witngs* (1921-1926), ed By Quintin Hoare, London, 1978.

সংস্কারধর্মী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ করে জার্মানিতে ক্ষুদ্র কর্মজীবি মানুষের মধ্যে এটি বহুলভাবে আলোচিত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদ প্রচার করে যে ইতিহাসের 'সুফল পরাজয়' ছাড়া আর সবকিছুই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। এটাও বলা অসঙ্গত নয় যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একটি 'আকস্মিক দুর্ঘটনার পরিণতি'। এই দেশগুলোতে সবসময় 'ব্লাডি ফরডিজম' লক্ষ্যনীয়। বিকল্প সমাজিক ব্যবস্থার নবরূপ এখনও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার মাধ্যমে সঠিক নব্যধারণার বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব। এ কথা সত্যি যে, ভোগ্যব্যবস্থার বিনিময় এখানে সমান ক্রয়ক্ষমতায় অনুষ্ঠিত হয় -এরকম পরিবেশ-পরিস্থিতি আজও তৈরি হয়নি। শুধু তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে সামান্য পরিমাণে তা প্রতিবেদনে ঘোষণা করা হয় যে মানবজন্মের বিস্ফোরণে, পৌরকর, দারিদ্র্যবিমোচন, প্রকৃতি-পরিবেশ ইত্যাদি সমস্যা, যে-সব কারণে বেশিরভাগ মানুষ দক্ষিণ মেরুতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা-সংকুল অবস্থায় বসবাস করে, তা আজকের কলকাতার বস্তিবাসী থেকে সাও-পাওলো পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪২১]

গত শতাব্দীর ইউরোপের পূর্বাঞ্চলীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেখানে আজ উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির জোয়ার নেমেছে, তা নতুন ফোর্ডবাদী উন্নয়নের ধারা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে আধুনিকতাকে আরো আধুনিক করা হচ্ছে, কিন্তু ফরডিজম-পরবর্তী কালে উত্তরণের কিছুই ঘটেনি। এ থেকে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক লক্ষ্য কোনোক্রমেই সামাজিক আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেছে-বোঝায় না। বরং এটি সামাজিক আদর্শকে পেছন ছুঁড়ে ফেলেছে। উত্তর-দক্ষিণ মেরুকরণ সংকট এবং এ থেকে উদ্ভূত নির্ধারিত সমস্যাগুলো বর্তমান শতাব্দীতেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়ন আজকে নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদের শ্লোগান গাইছে, যা আসলে একটি রাজনৈতিক চাল মাত্র। এ চালের কেন্দ্রবিন্দুতে যে যুদ্ধ বিজয়ের কথা বলা হচ্ছে তাই 'বিশ্বায়ন'। কিন্তু তা কী সত্যিই কোনো নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে? [৪২২]

---

[421] Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid p.40

422. Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* ibid, p.42

গত একশো বছরের ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র গত পঞ্চাশ বছর মধ্যস্থতাকারীর বিশ্ব রাজনীতি করে আসছে এবং পরোয়া করেনি। সারা বিশ্বে যেখানে যখন খুশি অর্থনৈতিক চাপ, ধ্বংসলীলা ও সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতে। এতে গত একশো বছর ধরে বিশ্ব আর্থ-ব্যবস্থায় ধনী ও গরীব দুটো দলে বিভাজিত শ্রেণির তৈরি হয়েছে, যাদের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি।[৪২৩]

পুজিঁবাদের মতোই বিশ্বায়ন শান্তির বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে প্রান্তিক এবং রাজনেতিক নিদর্শনস্বরূপ সমরাস্ত্র রপ্তানি ও সমরাস্ত্র উৎপাদনকেই বোঝায়-যা একবার ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষে পুঁজিবাদের ব্যবস্থাপকগণ হিসাব করেছে, তাদের যুদ্ধ ব্যবসায় মুনাফা কত হয়েছে। ব্যবহারিক মূল্যের পুঁজির বিচ্ছিন্নতায় লভ্যাংশ তৈরি হয়, যা উৎপাদনের একটি শর্ত। আজকের বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কেন্দ্র করে এ লভ্যাংশই তৈরি করে। যারা এ উৎপাদন ভোগ করে তাদেরকে ভোক্তা বলা হয় এবং তারা স্বীকার করেন যে, তাদের কাছে যুদ্ধসরঞ্জামের ব্যবহারিক মূল্য আছে। এইভাবে বিশ্বায়ন প্রভাবিত উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে ব্যবহারিক মূল্যের চাপ তৈরি করছে এবং ভোক্তারা তা সাদরে গ্রহণ করছে। এ কথার অর্থ হলো পুঁজিবাদ যেমন পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি বিশ্বায়নও একই কাজ করে চলেছে। তবে 'শান্তি-গবেষণার বিষয়টি' যদি কিছুটা নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে সংকটের সমাধান সম্ভব। সম্ভব যদি জনগণের মধ্যে সহাবস্থান, ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক সম্পর্ক তৈরি হয়। বলা হচ্ছে, মানবিক সম্পর্ক এখনও পৃথিবীতে তৈরি হয়নি, কারণ এখনও পৃথিবীতে চলছে সংগঠিত শোষণ ও যুদ্ধ। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আজকে তাই দরকার নির্ধারিত উৎপাদন ব্যবস্থার বিক্রয়-মূল্যনির্ধারণ করা, যাতে পুঁজিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শ্রেণির জন্য উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করতে না হয়; যা কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। শান্তির জন্যে এখন মানুষের উচিত উত্তর-দক্ষিণ মেরুকরণ বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, আবহাওয়া ও খাবার-বাসস্থান সম্বন্ধে গবেষণা করে নতুন পথ তৈরি করা। হেরে যাওয়া কৃচ্ছতাবাদের পরিবর্তে জ্ঞানব্যাপ্তির মাধ্যমে প্রজ্ঞাকে প্রয়োগ করা। তা না হলে পৃথিবীর অবস্থা যেভাবে আছে সেভাবেই চলবে। আমরা শুধু টেবিলে বসবো, সমস্যা নিয়ে ভাববো আর লিখবো, আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। সাম্প্রতিক দর্শন, যা

---

423. Ernest Block, Das Prinzip Hoffunug, *Collected Works Kapitel 33-42*, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1985; Jerald Hage/Charles H. Powers, *Post-Industrial London*, London: SAGE Publications, 1992, p. 9.

উত্তর-আধুনিকতা, প্রকরণবাদ, অবিনির্মাণবাদ, সমীক্ষণবাদ, সমীক্ষণতত্ত্ব ইত্যাদি বিশ্বায়ন-প্রভাবিত পরিবর্তন বা রূপান্তরে বিশ্বাস করে না, যদিও শিল্প-উত্তর যুগের বইপত্রের রচনায় বিষয়গুলোকে এর থেকে ভিন্নতর মনে হয়।[৪২৪]

অনেকে মনে করেন, বিশ্বায়ন বিশ্ব উন্নয়নের দমন ছাড়া কিছুই করছে না। সমাজতন্ত্র এই দমননীতি ছাড়াই পুঁজিবাদ-পূর্ব উন্নয়নকে রূপদানের জন্য শ্রেণিহীন সমাজ উন্নয়নকে ফলপ্রসু করবার চেষ্টা করেছে, যদিও গত ৭০ বছরে সমাজতন্ত্রের সময়কালে এ উন্নয়ন ফলপ্রসু হয়নি। সমাজতন্ত্র-উত্তর সময়কালে তা ভিন্নভাবে সম্ভব হচ্ছে।[৪২৫]

সমাজতন্ত্র-উত্তরকালে 'নব্যচিন্তাধারার' আবির্ভাব হয়, যা পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে এবং আজও অব্যাহত আছে। বিশ্বায়ন ও 'নব্যচিন্তাধারার' সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। যেমন নব্যচিন্তাধারায় পণ্য উৎপাদনের উন্নয়নকে প্রধান শিকল-বন্ধন বলা হয়। এই শিকল-বন্ধন সবকিছুকেই সন্নিবেশিত করে। 'পেরেস্ত্রোয়িকা' ও 'গ্লাসনস্ত' যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের রূপান্তর ঘটায়, তেমনি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূ করে। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলোও বলতে গলে এক রকমই। এখানে বিশ্বায়ন ও নব্যচিন্তাধারার উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার উত্তরণ ঘটে এবং উন্নয়নের অধিকতর ক্রমবিকাশ কার্যকর ও ত্বরান্বিত হয়।[৪২৬]

বিশ্বায়নবাদীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বদ্ধপরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো আন্তঃরাষ্ট্রীয় যৌথ-সহযোগিতায় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, যাতে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। এই যৌথ উদ্যোগের আরো অর্থ হলো, কর্মজীবী মানুষকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা। এই সেবা প্রদান সম্ভব যদি একটি দেশ তার উৎপাদন হার লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্জিত হয় মুনাফা বা লাভ। বিনিয়োগও

---

424. Andrew A. Michta, *The Government and Politics of Postcommunist Europe,* London: Praeger, 1994, p. 6.

425. Gordon B. Smith, *Soviet Politics: Struggling with change,* New York. St. Martin's Press, 1992. P. 185

426. Ray Maghroori, *Introduction: Major Debates in International Relations,* Ray Maghroori and Bennett Ramberg (ed). Clobalism Versus Realism, Colorado, Westview Press, 1982. 16.

সেরকমই হওয়া উচিত, যাতে বার বার অনেক মুনাফা করা যায়। এটি হচ্ছে আসলে এক ব্যাপক পূর্বপরিকল্পনা অথবা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কিছু বিষয়ের সামঞ্জস্যতা বিধান, যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মজীবী মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে।[৪২৭]

অনেক প্রবক্তা বিশ্বায়নকে ট্রান্স্যাশালিজম নামেও আখ্যায়িত করেছেন। এই নীতিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য 'অধীনতা-নীতি' বলে উল্লেখ করা যায়। কারণ এই নীতি শুধু কর্মজীবী মানুষের জন্যেই নয়, বরং প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার জন্যেও মঙ্গলকর নয়। এই নীতির সাহায্যে মাটি, পানি, বাতাস, পৃথিবীর স্বাভাবিক শান্তি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব নয়। অনেকে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সাহায্যে পুঁজির প্রবৃদ্ধি সরাসরি অর্জন সম্ভব। এখানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপৎপাদন শক্তির ভেতর একটি সমন্বয় তৈরি করা দরকার যেখানে পরিবেশ অনুযায়ী জীবন-ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ধারা চালু রাখা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তা করা সম্ভব হয় না।[৪২৮]

বিশ্বায়নের মতো 'নব্যচিন্তাধারাও' এই নীতি অনুযায়ী অটোমেশন ও নির্ভরশীল উন্নয়নকে ফলপ্রসু মনে করে। তবে কথা হলো, এ ব্যবস্থা বহু আগেই পৃথিবীতে চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবচনের কথা উল্লেখ করিঃ 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'। মানুষের বুদ্ধি যদি সবসময় কাজে-কর্মে অর্থলোভ-প্রণোদিত হয় তাহলে মানুষ বিপদে পড়ে, যেমন আলেকজান্ডার আক্রমণ করে বিপদে পড়েছিলেন। এটি বাস্তব সত্য যে, পুঁজি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ জড়িত থাকে। এই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্যমূলক এবং তা ফলপ্রসূ হয় আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে। শিল্পায়নের দিক থেকে অনুন্নত দেশের মানুষের ক্ষেত্রে এই স্বার্থ কাজ করে পণ্যমূল্য বা ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার উপর। অনুন্নত দেশগুলোতে শিল্প-কলকারখানা একেবারেই নেই বলে সেখান থেকে বিদেশি বিনিয়োগাকারীরা প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করে নেয়। তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে অনুন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করে, যার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের অবকাঠামো তৈরি করা হয়। বিদেশি বিনিয়োগের কতগুলো শর্ত থাকে, যেমন

427. M. confirius, *Angst vor dem nuem Denker?* Rote Blaetter, No. 10/88, Frankfurt. M., p.13.

428. Michael Sullivan, *The Realities of the Present System*, In Ray Maghroori and Bennett Rambere (ed.) op. cit., p. 196

শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি করা হয় বা করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক খরচ কমানো হয়; বিশেষ করে শ্রমিকের মজুরি কেটে কমিয়ে আনা হয়। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন ততটুকু করা হয় যতটুকু বিনিয়োগকারী প্রয়োজন মনে করে। তবে তাদের দমননীতি থাকে অদৃশ্য বা ভিন্নজাতীয়। বিনিয়োগকারীরা চেষ্টা করেন অনুন্নত দেশে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতে এবং তা করা হয় তাদের চাহিদানুযায়ী। এ ব্যবস্থায় এখন কৃষককেও যান্ত্রিক করা হয়।

৮.৪. উন্নয়ন পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্বসমস্যার সমাধান

বিশ্বায়ন ও নব্যচিন্তাধারা দুই বিশ্বশক্তির দুটো মতাদর্শ পণ্য-ব্যবস্থার নতুন শর্তারোপের মাধ্যমে অভিন্নতা তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয়েছে তাহলো, গোষ্ঠী দুটোর ভেতর বিচ্ছেদ দূর করতে হয়েছে এবং মানুষকে ভয়ভীতির হাত থেকে রক্ষা করতে হয়েছে। মানুষের জীবনটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে-কোনো বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হয়েছে। বিষয়টি একটি কূটাভাসের মত মনে হয়। কিন্তু এরপরও বিশ্বসম্পর্ক অনেক গভীরে পৌছে গেছে, যা থেকে মানুষের নিস্তার নেই। এতে বিশ্বসমস্যা পুনরায় তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা তৈরি হচ্ছে পণ্য বিনিময়ের উচ্চ পর্যায়ে উন্নয়ন পরিচালনার জন্য,যদিও এর কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি।

এ প্রসঙ্গে পল ক্যামাক, ডেভিড পুল ও উইলিয়াম টোরডরফ বলেনঃ A state’s international abargaining posi8tion depends on its strategic importance, the character of the regime in control of the state, the personality and internationa standing of the leader, its economic resources and the extent of external control over them, and the alliances which the state makes its neighbours and within the intergovernmental organistaions to which it belongs. Virtually all Third World regimes haveclose links with the indu;strial West, conservative and traditional regimes by choice and revolutionary regimes which might in the past have gravitated towares the Soviet Union [now Russian Federatin] and Western-dominated institutions such the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have the resources to assist in a way that the Soviet Union [now Federation], with its shortage of foreign

exchnage, was never able to match ; this was important for rulers who wished to survive-the state is the source of their own power and must be maintained. It is all the more improtant when no alternative global source of support is to be found.[৪২৯]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পণ্য-উৎপাদনকে উন্নয়নের মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেই লক্ষ্যে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সেই লক্ষ্যে যৌথভাবে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলো ধনী ও গরীব দেশগুলোতে বহমান বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট মেরুকরণ তৈরি করে। এই মেরুকরণ তৈরির পেছনে যে কারণগুলো কাজ করে তাহলো: পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য-বিনিময়ের জন্যে গড় উৎপাদন ক্ষমতা (প্রতি ঘন্টায় উৎপাদনের পরিমাণঃ বিশ্ববাজার নির্ধারণ করে, যে-সব দেশে এই উৎপাদন ক্ষমতা গড় অনুপাতের নিচে, সেই দেশগুলোতে উৎপাদন বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও এই দেশগুলো পণ্য-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় পেছেনে পড়ে থাকছে অথবা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোর দারিদ্র্য বিদ্রুপ বা পরিহাসের বিষয়, কোনো গরিমা হিসেবে গণ্য হয় না যা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারে।

সাধারণত একটি শিল্পকারখানাসমৃদ্ধ দেশের তিন ভাগের দুভাগই শিল্পে ভরপুর থাকে। ঐ সমস্ত দেশের শিল্পকলকারখানায় খানা বা সংকট তৈরি হয়, যেমন বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি এগুলো ঘটে অপরিকল্পিত ও স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ধারায় পণ্য উৎপাদিত হয় না বলে। লভ্যাংশ লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত না পৌঁছলে মূল্য পরিশোধের সময় অসামঞ্চস্য তৈরি হয়, বিশেষ করে আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে ব্যবসায় মন্দা আসে। এই জট থেকে উদ্ধারের জন্যে কেইনসের চাহিদা সম্পর্কিত তত্ত্বের কথা বলা যায়। রাষ্ট্র কর্তৃক টাকা-পয়সা ও কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে কেইনস যে মতবাদ উপস্থাপন করেন তাকেই কেইনসীয় মতবাদ বলা হয়। এতে পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই পণ্যমূল্যের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অন্যকিছু করতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জিতে লক্ষণীয়, বহু আগে থেকেই মানুষ মানবতাবিরোধী মতাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। আমরা লক্ষ করি, অসংখ্য

429. Paul Cammack, David Pool and William Todorffl. *Third World Politics: A Comparative Introduction,* London: MacMillan Press, 1993, p. 248.

জনপ্রিয় রাজনেতিক নেতা অনেক জঘন্য কাজ করেছেন এবং করছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ধ্রুপদী অর্থনীতি বিশ্বায়ন গ্রহণ করে না।[৪৩০]

ভবিষ্যতে যদি কখনও পুঁজি বিনিয়োগের সংকট দেখা দেয় এবং কোনো রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সাহায্যের পর পুঁজি সংকটের কারণে ঘাটতি পূরণ করতে না পারে, তাহলে বলা যাবে পৃথিবী সম্পূর্ণভাবেই পুঁজি-বিনিয়োগে ছেয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, যদি এ অবস্থা তৈরি হয় তাহলে তা থেকে রক্ষার উপায় কি? উত্তরে বলা যায়, মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে অনবরত চেষ্টা করছে, বিশেষ করে পণ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রয়মুল্য পরিশোধের ক্ষমতার ভেতর সামঞ্জস্য তৈরি করতে পারে, শ্রমিকের পারিশ্রমিককে রাষ্ট্রীয় ও রাজনেতিকভাবে সমশ্রেণিভুক্ত করতে এবং স্বল্প-পারিশ্রমিককে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে চাইছে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। তাছাড়া অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও সবসময় যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে, যুদ্ধভীতির জন্য মানুষ আর কিছুই বলে না। অর্থনৈতিক আগ্রাসন রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে সম্প্রসারিত হয় এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়-যতদিন পর্যন্ত না অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সামরিক বিষয়ে দুই বিশ্বশক্তি আগ্রাসী সম্প্রসারণের জন্যে তৈরি, যা আমরা সবসময় লক্ষ করি। অন্যদিকে অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ জমাট বাঁধছে এবং একটি অবস্থা তৈরি হচ্ছে যা ১৯১৪ সালের পূর্বে বিরাজমান ছিল। সেটা সত্যিই অনেক বড় ধরনের সংকট ছিল, যা জেমস ফরম্যান-পেকের ভাষায় 'আয়ের অসমতা'র কারণে তীব্র সংকট ঘটিয়ে তোলেঃ In the world before 1914 there was no supra-national authority ot keep trade barriwers down, yet trade was nothing like as impeded as it was to become in the 1930s. Even more surprising, in comparison with present day restrictions, is that there was so little restraint on immigration. The relative freedom of trade and migration, as the readings show, was a major contributor to convergence. Why then did globalization reverse in the 1930s and how was it maintained in the 19th century? Perpaps globalizati

430. Karl Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie,* Europaeische Verlasanstalt, Frankfurt/Europa Verlag, Vienna, 1941, p. 156

on contained the seeds of its own destructions by exacerbating income inequality in richer countries.[৪৩১]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ এমন হয়ে উঠছে যে, মানুষ তার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার রীতিনীতি বা ভিত্তি হারিয়ে ফেলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নে মাটি, পানি, বাতাস তাই নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদি উৎপাদনের জোয়ার এমনিভাবে চলতে থাকে। এরপর শুধু বাকি থাকবে সীমারেখাহীন প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয়িত রূপ। উদাহরণস্বরূপ চেরনোবিল, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে-প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয় ডেকে এনেছে।

৮.৪. বিশ্বায়নঃ জঁটিলতার অবগুণ্ঠন

বিশ্বায়ন পণ্যসমাজ ও উন্নয়নের চাপের বিরুদ্ধে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আমাদের আজকের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। নতুন শতাব্দী তৈরি হচ্ছে, যাকে ডানিয়েল বেল 'শ্রমশিল্প-উত্তর সময়কাল' বলে উল্লেখ রেছেন। অন্য অনেকেই অবশ্য আজকের এই সময়কালকে 'উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সময়কাল' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের একটি স্বাধীন উন্নতির পথ তৈরি আছে বলা হয়, যা সবার স্বাধীন উন্নতিকেই বোঝায়। কিন্তু এই চিন্তাটি এমন কিছু নতুন নয় যে, পুরনো মতবাদকে ক্ষতিকর হিসেবে সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে। আসলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থাকে জটিল করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন বলা যায়, মুল্যসংরক্ষণবাদ ও পাশ্চাত্যের পণ্য-উৎপাদনের নীতিমালা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। জেরাল্ড হেইজ ও চার্লস এইচ. পাওয়ার এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেনঃ Our conviction is that another new epoch is in the making. We refer to this, as others have, as the `post-industrial', for example the movement form a society based on heavy industry to the age of information and high technology has been mentioned by Bell.[৪৩২]

---

431. Karl Marx, *Das Kapital*, MEW (Marx/Engels Collected Works in German Language), vol. 23, Dietz Verlag, Berlin: 1988, p. 189.

432. Toffler 1981; Roseneu, James, The Complexities and Contradictions of Globalization, *Current History*, November 1997, p.20

আসলে বিশ্বায়নের অর্থব্যঞ্জনায় একটি বিশ্বসম্পর্কের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যা মূলত নির্ভর করে পণ্য-উৎপদিত সমাজ সম্প্রসারণের উপর। অনেকে আবার একে সাধারণ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিরূপ মনে করেন। সাধারণ সমাজ মানবিকতাকে মূল্য প্রদান করে। কিন্তু পণ্য-উৎপাদিত সমাজ মানবিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করে না। পার্থক্য এখানেই। সাধারণ সমাজ প্রজাতিসত্তার পরিবর্তে জাতিসত্তাকে অস্তিত্বশলি মনে করে। বিশ্বায়নও তদ্রুপ মনে করে। এই নতুন ধারায় ব্যক্তিমানুষের আপন ইচ্ছা-আগ্রহকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। এতে সাধারণত জাতিসত্তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক করা হয় যা পুঁজিবাদী বিশ্ব করে থাকে পার্থক্য যেটুকু লক্ষণীয় তা হলো, পুঁজিবাদী সমাজ জীবনযাত্রাকে যান্ত্রিক করে তোলে। বিশ্বায়নও যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র উৎপাদনের খাতিরেই ব্যবহার করে। সব ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের মতই জাতিত্তাকে প্রজাতিসত্তায় রূপান্তরিত করে যাতে প্রত্যেক পণ্য-বিনিময় একক মালিকানায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। দর্শনের ভাষায় একক মালিকানা বা নিজস্বার্থ তৈরি করা সাধারণ মানুষের জন্য একটি বিমূর্ত ধারণা মাত্র। বেশিরভাগ মানুষ সমাজে এই বিমূর্ত ধারণা নিয়েই বসবাস করে। সবার বিমূর্ত ধারণা একটি অভিন্নসত্তা হিসেবে সমাজে অস্তিত্বশীল থাকে। বিশ্বায়ন বিমূর্ত বিষয়কে মূর্তরূপ প্রদান করে না, আর তাই এটি সবার কাছে প্রিয় নয়।[৪৩৩]

দ্বিতীয়ত, যে কোনো সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিশ্বসমস্যার সমাধান করে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈষয়িকভাবে একটি অভিন্নতা তৈরি করে। কিন্তু বিশ্বায়নের এ ধরনের কোনো বাস্তব সত্তারূপ নেই। ফলে অনেকে এটিকে মিথ্যাচার বা অপপ্রচার মনে করেন। এটি চেতনা বা সত্তার অনৈক্যও তৈরি করে। দেখা গেছে এটি প্রথমে মানবজাতির উন্নয়নের ভেতর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল। আসলে এটি একদিকে একটি বাস্তবসত্তা এবং অন্যদিকে একটি ভ্রান্ত চেতনাও বটে। এটি বিশ্বসমস্যার সমাধান করে বটে, তবে তা জাতিসত্তার পরিবর্তনের জন্যে কোনো ভূমিকা রাখে না।

তৃতীয়ত, যদি পণ্য সম্প্রসারণের বিষয়টি জটিল সংকটের কারণে পুনরুত্থাপিত হয়, তাহলে বিশ্বায়ন আসলেই ভুল ও এক উল্টোভাবনা হয়ে ওঠে বৈকি। ফলে তা কোনো আদর্শ হতে পারে না যদি না তা মানুষ ও বস্তুর সম্পর্ককে বোঝায়। বিশ্বায়ন মানুষ ও বস্তুসম্পর্কের আলোকে মানবিকতার উৎপাদনকে বিষয়নির্ভর মনে করে না; অথচ পণ্য উৎপাদন কিন্তু ঐ রকম হওয়া উচিত নয়।

---

[433] M.Waters Globalization: world of difference, London, Routledge, 1996, p.3

চতুর্থত, অনেকের কাছে বিশ্বায়ন এক প্রশ্নবোধক ব্যাপার বলে মনে হয়। কারণ এখানে স্বাধীনতা ও সমতা চক্রবৃত্তিক। একথার অর্থ হলো, বিশ্বায়ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কিছু নয় যার পরিণতি বা সম্পূর্ণতা আছে। বিশ্বায়নে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা একই শ্রেণিসম্পর্কের নীতিমালাকে অনুসরণ করেন। এতে সব জিনিসের বিনিময় সমতুল্য না হয়ে চক্রাবৃত্তিক হয়ে থাকে, যার কোনো বিবর্তন বা উন্নয়ন নেই। আসলে বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় সমতার পরিবর্তে মানুষের ভেতর স্বভাবজাত বৈষম্যের ধারণাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। আর তাই মানুষের চক্রবৃত্তিক স্বভাব মানবিক অধিকার হিসেবে একটি সত্যিকার স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয় না। স্বাধীনতা ও সমতা যখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক স্থাপন বা সমন্বয়কে বোঝায়, তখন তা ব্যক্তিমানুষের উন্নয়ন সাধন করতে পারে, অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সমতা উৎপাদনের উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য।

কীভাবে বিশ্বায়নের দিকগুলো পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্বায়ন কোনো আদর্শ নয়, যা ইতিবাচক, সদর্থক।[৪৩৪] আদর্শের অর্থ কী, তা এখানে বলার দরকার নেই। যদি আদর্শ কোনো গোষ্ঠীকে, বংশপতি আবদুল মোবারককে, গির্জার প্রধান জুলিয়ানিস অথবা আর্চবিশপ কিরিলকে বোঝায়, তাহলে সেই আদর্শের অর্থ হলো প্রার্থনা। আর 'প্রার্থনা হলো (জীবনে) কৃতকার্য হওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ডাকা। আদর্শের কথা মানুষ ধীরে ধীরে বলে। অনেকে আদর্শকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন মানুষ প্রশ্ন করে, মানুষ কী মানবিক সম্পর্কের মাঝে বেঁচে আছে, জীবনযাপন করছে! আদর্শের বুলি যারা আওড়ায়, তারা বিজ্ঞের ভাবভঙ্গি দেখায় অথবা তারস্বরে চিৎকার করে সাপ্তাহিক ঘটনার করুন চিত্রের বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা যখন পল্টন ময়দানে তারস্বরে চিৎকার করে, মনে হয় তারা বুঝি সালমান রুশদির মাথাটা অরফিউসের মতো কেটে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেবে। অর্থাৎ মানবাধিকার ও স্বাধীনতা বলে যেন কিছু নেই। সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, ধর্মান্ধতার সুযোগে অথবা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ-নীতির মাধ্যমে এগুলো করা হয়। এই শক্তি ও নীতি আজকে সততায় বিশ্বাসী ও আদর্শের প্রতি নিবেদিত মানুষের কাছে জঘন্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। আজকের মানুষ ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে যে, আগের দিনের মানুষ জ্ঞানব্যাপ্তির চর্চা করতো। আদর্শ যদি জঘন্য না হয়ে আদর্শই থাকতো, তাহলে স্মরণীয় উন্নতির সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতো। কিন্তু তা আর সম্ভব হচ্ছে না।

---

[434] Mittleman, 'Rethinking the Regionalism in the Contex of Globalization,' *Global Governance*, No. 2, 1996. Pp.190

৮.৫. বিশ্বায়ন: উন্নয়ন পদ্ধতি

বিশ্বায়ন নিয়ে একটি পাশ্চাত্যের প্রবাদ হলো, কোনো পূর্ব-সংবাদ ছাড়া বিশ্বায়ন মৃত কুকুরেরও সন্ধান করে না। 'বিশ্বায়ন' পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে না। পণ্য-উৎপাদনের জন্যে একটি অভিন্ন সমতার কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে না। এছাড়া এই নীতি সুস্পষ্টভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতার কথা বলে না, যেখানে শ্রমিকের বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে মানবিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা; বিশেষ করে উৎপাদকের (শ্রমিকের) নিজের জীবন ও কর্মব্যবস্থার একটি পুরোপুরি পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার রূপরেখা এতে প্রণয়ন করা হয় না। শ্রমিকশ্রেণির বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি বিশ্বায়নে একেবারেই আলোচিত হয় না। আসলে এটি মানবজীবন ও অর্থনীতির সমন্বয়ের বাস্তব রূপ নয়। আজকে বিশ্বজুড়ে পণ্য-উৎপাদনের কথা নানাভাবে বলা হচ্ছে। পণ্য উন্নয়নের অনির্ভরশীলযোগ্য ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া যেন বর্তমান বিশ্বজুড়ে আনন্দ-উল্লাস করছে; সব ব্যাপারে উন্নয়ন-ধারার পরিবর্তনসহ সংস্কার ও বিকল্পের কথা আলোচিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, মানুষ যেন কোনো মাকড়সার জালে আটকা পড়ে গেছে। বিশ্বায়ন এখন পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সমস্ত জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রক হয়ে গেছে।

আমরা আরো জানি যে, আজকের উৎপাদনের উন্নয়ন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া একেবারেই বিশুদ্ধ বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। নিশ্চিতভাবে তাই বলা যায় আজকের উৎপাদন ব্যবস্থায় কিছু জিনিস তৈরি হয়েছে যা মানুষের অনুকূলে নয় বা মানুষের জন্যে কল্যাণকর নয়। আমরা আরো বলবো, বিশ্বায়ন যৌক্তিক ও যান্ত্রিক-প্রায়োগিক এবং মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই নীতি মানুষের সংকট মোচনের জন্যে আন্দোলন করে না, উৎপাদক বা শ্রমিকের নিজের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় না, সম্ভাব্য কোনো সমাধানের কথা উল্লেখ করা না। উন্নয়ন, বিচ্ছিন্নতা, আদর্শের সমালোচনা, আপন সিদ্ধান্ত বা মতামত, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র ইত্যাদি বিশ্বায়নের আলোচনা বিষয়।

কৌতুক করে বলা যায়, বিশ্বায়ন অসময়ে কম দামে অলংকার বিক্রি করার কথা বলে। এরপর এই নীতি যথারীতি ও সুস্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর আলোকে অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়গুলোসহ কাজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে না। এর একটি পরিষ্কার উদাহারণ হলো-ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ তেলকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। আন্তর্জাতিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতা থেকে আমরা জানি যে, সব রাষ্ট্রেরই সীমাবদ্ধতা আছে, যা পৃথিবীব্যাপী গৃহীত একটি রীতি মাত্র। বিশ্বায়ন মানুষের কাজের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করে যা

উৎপাদনশক্তি হিসেবে ভুমিকা রাখে। কিন্তু বিশ্বায়ন পরিবেশ সমস্যাকে প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদের অভিন্ন ব্যাপার হিসেবে দেখে না, মানুষ ও প্রকৃতিকে একটি অভিন্ন সত্তা মনে করে না। বিশ্বায়ন এও দাবি করে না যে, মানুষ ও পৃথিবী একটি সুন্দর সংসার গড়ুক, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো হওয়া সুযোগ রাখা হবে।[৪৩৫]

বিজ্ঞানের ভালো জিনিসগুলো মানুষের কাছে বিশেষ জ্ঞান হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষকে কর্মসংস্থান থেকে সরানো বা ছাটাই করাকেই বেকারত্ব বলা হয়। বিজ্ঞান যদি মানুষের জন্যে বিশেষ জ্ঞান হিসেবে কাজ করে, তাহলে মানুষের ভালো করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি মানুষ পুঁজিবৃদ্ধির চাইতে পণ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য দেয়, তাহলে সার্বিক মূর্তকাজের পরিবর্তে সাময়িক অস্তিত্বশীল কাজের বাস্তবায়নকেই বোঝানো হবে, যা বিশ্বায়ন করে চলেছে।

বিশ্বায়নের রীতিপদ্ধতি আসলে উন্নয়ন পদ্ধতির নেতিবাচক দিক। উৎপাদনের মাথায় খেলে যাওয়া গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা হলো প্রগতির প্রকাশ; যা বিশ্বায়ন না জেনেও করা যায়। এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে কিনা, সেটাই মানুষের প্রথমে স্থির করা উচিত। বিশ্বসমস্যার বর্তমান সমাধানগুলো আরো জটিল হয়ে উঠছে, কারণ এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী ও বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। এটিও ঠিক যে, বিশ্বায়ন একটি অনির্ভরযোগ্য উন্নয়ন, যা রূপান্তরিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ফল এবং এই চিন্তাধারা এই ধরনের রূপান্তরকেই সমর্থন করে। একথা যেই পরিবর্তন পুঁজিবাদের কোনো উল্লিখিত সদর্থক দিককে গ্রহণ করে না। আজকের উন্নয়নযন্ত্র ও যান্ত্রিকতা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতিধারায় অগ্রসর হওয়া বলতে ওজোন স্তরকে ছিদ্র করে মহাশুণ্যে পৌঁছানো বোঝায়। প্রগতি বোঝায় না। সবশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নে 'মানুষ নিজেই নিজেকে চেনে না।' বিশ্বায়ন তাই ধ্বংসাত্মক, বিনাশী।

৮.৬. বিশ্বায়ন ও পরিবর্তমান বিশ্বনিরাপত্তা

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বায়ন বা বিশ্বায়নের ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা সনাতন রাজনৈতিক কাঠামোয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর মুক্তবাজার অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যাপক প্রসার মুলত বিশ্বায়নের ধারণাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক অন্যতম নিয়মকে পরিণত করেছে। যেহেতু বিশ্বায়ন মুলত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক

---

[435] Paul Hirst and Grahame Thomson, *Globalizationin Questions, The International Economy and Possibilities of Governance,* Cambridge: Malden Polity Press, 1998, p.102

নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া, সেই হেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন অনেক ক্ষেত্রেই পুনঃসংজ্ঞায়িত হচ্ছে। আর এর অবধারিত প্রভাব পড়ছে এখন বিশ্বনিরাপত্তার প্রকৃতি ও ধারণার উপর। এ পর্যায়ে বিশ্বায়নের এই নতুন যুগে বিশ্বনিরাপত্তার সনাতন ধারণায় কী ধরনের পরিবর্তন আসছে ও জনমানুষের জন্যে এর প্রভাব কী হতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মূল আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা ধারণার তাত্ত্বিক যোগসূত্রগুলো পর্যালোচনা করার মাধ্যমে এখানে ঐ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।[৪৩৬]

৮.৭. বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা: তত্ত্বীয় পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের ধারণা যদিও প্রধানত অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের ধারণা তার চেয়েও অনেক গভীর ও ব্যাপক। কোনো কোনো বিশ্লেষক অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, রাজনৈতিক বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্বায়ন প্রভৃতি শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে বিশ্বায়নের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে বাজার অর্থনীতির প্রসার ও বাজার অর্থনীতিভিত্তিক সহযোগিতাই যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের মূল ভিত্তি, সে বিষয়ে তেমন কোনো দ্বিমত নেই। অবশ্য অনেকে বিশ্বায়নের ধারণাকে পুরোপুরি অর্থনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বাহুল্য অনেক সময় একে পশ্চিমা বাণিজ্যস্বার্থ প্রসারের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করলেই কেবল এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

প্রাথমিকভাবে বিশ্বায়নকে আমরা গোটা বিশ্বের জাতিরাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা নিরসনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অর্থাৎ কোনো জাতিরাষ্ট্রের বা কোনো অঞ্চলের স্বার্থ বিশ্বের অন্যান্য জাতিরাষ্ট্র বা অঞ্চলের স্বার্থের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে থাকবে যে, একপক্ষের ভালো-মন্দ অন্যপক্ষকে সুগভীরভাবে প্রভাবিত করবে। অন্যকথায়, বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটি কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সীমানার ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে একটি একক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এই একক বিশ্বের অন্যতম উপাদান হলো, একটি একক বিশ্ব অর্থনীতি, একটি বিশ্বসরকার ও একটি একক বিশ্বপার্লামেন্ট। অবশ্য বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার এইসব উপাদানকে কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়। এটি অর্জিতব্য, একথা মাথায় রেখে এই

---

[436] Alan Rughman, *The End of Globalization* (Washinton: Many Rivers Press, 2000) p.42

প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অর্জন করা অনেকাংশেই অবাস্তব, অসম্ভব। বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও প্রসার অনেকাংশে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের ফল। বিকল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শিক ধারা, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পর বাজার অর্থনীতি প্রসারের অবাধ বাধা আজ অপসারিত। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাম্যতা তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। সহজতর হয়েছে বৈদেশিক পুঁজির দ্রুত ও ব্যাপক বিনিয়োগ। এই নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী একটি মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা, যার নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা World Trade Organization (WTO)

বিভিন্ন বিশ্লেষক এই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান ও বৈশিষ্ট্যকে নানাভাবে চিহ্নিত করেছেন। মারজান ভেতলিকের মতে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চাইতে সরাসরি বৈদেশিক আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিনা বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।[৪৩৭] তাছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যেসব গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলোঃ

১) রাষ্ট্রসীমানার উর্ধ্বে গিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার গুরুত্ব বৃদ্ধি;

২) বহুজাতিক শিল্প ও বিনিয়োগ সংস্থার উদ্ভব;

৩) বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য উদারকরণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা;

৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে গোটা বিশ্বের কাঁচামাল ও পুঁজির একত্রিত ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি;

৫) একটি একক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্বজনীন প্রভাব; এবং

৬) বৈশ্বিকভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ নীতিসমূহের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা।

[437] ভেতলিক ১৯৯৬: ১০৮, উদ্বৃতি: মো. শামীম আহসান, KUbxwZ‡Kv|, ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০১৪, পৃ. ৫৩৬

বিশ্বায়নের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেক সমালোচকের মতে অনেক সংকীর্ণ, যা গোটা বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রকৃত প্রভাবকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে না। এই সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করার জন্যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই এই প্রবন্ধে বিশ্বনিরাপত্তার উপর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব পর্যালোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এজন্যে সর্বপ্রথম বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা দরকার তা হলো, এই প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বব্যবস্থায় জাতিরাষ্ট্রের একক ও সর্বপ্রধান ভূমিকা সার্বিকভাবে খর্বিত হচ্ছে। অন্যকথায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মূল্যবোধ ও কর্মকাণ্ড এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বরং রাষ্ট্রবহির্ভূত বিভিন্ন ক্রীড়কের ভূমিকা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুসান স্ট্রেঞ্জ বলেছেন যে, ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোও রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ফিলিপ জি সারনির মতে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের চাইতেও বেশি বলে পরিগণিত হবে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাখ্যার একটি চমৎকার সারসংক্ষেপ প্রদান করেছেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ জেমস রজেন্যু। তাঁর মতে, the term "globalization" seems appropriate to "denote something" that is chaging human kind's preoccupation with territoriality and the traditional arrangements of state system.[438]

সমাজবিজ্ঞানীরা আবার এই বিশ্বায়নকে দেখছেন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিচয়, মূল্যবোধ ও জীবনধারার সমাজতীয়করণের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।[৪৩৯] ফলে দেখা যাচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন প্রাথমিকভাবে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হলেও সুগভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের এই প্রক্রিয়া আন্তঃআঞ্চলিক, আন্তঃরাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তঃসামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কে কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই বিশ্বনিরাপত্তা

---

[438] জেমস রজেন্যু, উদ্বৃতিঃ মো. শামীম আহসান, KUbxwZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০

[439] মিলনার ১৯৯২, উদ্বৃতিঃ মো. শামীম আহসান, KUbxwZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০

সম্পর্কিত ধারণায় আসতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন। নিরাপত্তার ধারণা একটি আন্তজাতিক' রূপ লাভ করা শুরু করেছে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। অবশ্য তখন আন্তর্জাতিকতার ধারণাটি ঔপনিবেশিকতার সেই শেষ পর্যায়ে ছিল অনেকটাই সীমাবদ্ধ। তবুও ভার্সাই শান্তিচুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাও ছিল নিরাপত্তা ধারণার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিকীকরণের একটি বিশাল পদক্ষেপ। আমরা যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে এর প্রধান কারণ বলে ধরে নেই, তবে সহজেই বোঝা যাবে যে 'শত্রুরাষ্ট্রের' সামরিক আক্রমণ নিরাপত্তার প্রতি প্রধান হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামরিক ধ্বংসলীলা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার এই সামরিক চরিত্রকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। জাতিসংঘের সনদে তাই আমরা দেখি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তার প্রতি প্রধান হুমকি হিসেবে সামরিক আক্রমণ তার অবস্থান বজায় রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে স্নায়ুযুদ্ধের বাস্তবতা বিশ্বব্যাপী সামরিক নিরাপত্তার ধারণায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পারমাণবিক অস্ত্রপ্রযুক্তি নিরাপত্তা কাঠামা গঠনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। দুই পরাশক্তির ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্বকে পারমাণবিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা করাই হয়ে দাঁড়ায় নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। ফলে আমরা দেখি, পারমাণবিক অস্ত্রের সরাসরি ব্যবহার রোধ করে একে নিবারক ভূমিকায় সীমিত রাখা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার মাধ্যমে দুই পরাশক্তির মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।[৪৪০]

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সম্ভবত প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সামরিক ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বা মাইক্রো পর্যায়ে ইস্যুসমূহের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে। অন্যকথায় স্নায়ুযুদ্ধ যেমন এককভাবে গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, এখন সেভাবে কোনো ইস্যুর অস্তিত্ব আর নেই। ক্ষীণ হয়ে আসছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সামরিক ও পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা।

আবার সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা ধারণায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিকভাবে প্রথম অর্থনৈতিক ও ক্রমশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। লক্ষ্যণীয়, নিরাপত্তার জন্য সামরিক প্রস্তুতির বিষয়টি

---

440 মো. শামীম আহসান, KUb¨ZÍK¨I, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

দু'ক্ষেত্রেই অনেক কম গুরুত্ব পাচ্ছে। অবশ্য তাই বলে এ কথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে, নিরাপত্তার প্রতি বর্তমান বিশ্বে কোনো প্রকার সামরিক হুমকির অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তার নতুন ধারণায় হুমকির অসামরিক উৎস এবং কিভাবে এসব হুমকিকে অসামরিক পর্যায়েই মোকাবেলা করা যায়, সে বিষয়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও সহযোগিতার ভূমিকা হয়ে উঠছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের ১৯৯৪ সালের মানব-উন্নয়ন রিপোর্ট মানব-নিরাপত্তার যে ধারণা তুলে ধরেছে, তাতে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সামরিক নিরাপত্তার চাইতে বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকা অধিকার নিশ্চিত করার বিভিন্ন পন্থার গুরুত্ব অনেক বেশি। এমনকি নিরাপত্তাকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক' হিসেবে ব্যাখ্যা না করে জাতিসংঘ মানব-উন্নয়ন সংস্থা নিরাপত্তা ধারণার উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছে। স্পষ্টতই এ ধরনের মতবাদ বর্তমান বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক ধারণার উর্ধ্বে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে। এক্ষেত্রে ইউএনডিপি ছয়টি ইস্যুকে বিশ্বব্যাপী মানব নিরাপত্তার প্রতি প্রধান হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে:

(১) বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা,

(২) বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,

(৩) ব্যাপক আন্তর্জাতিক অভিবাসন (Migration),

(৪) পরিবেশগত বিপর্যয়,

(৫) মাদক উৎপাদন ও চোরাচালান, এবং

(৬) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস (১৯৯৪)।

৮.৮. বিশ্বায়ন ও বিশ্বনিরাপত্তা

সাম্প্রতিক বিশ্বনিরাপত্তা কাঠামোতে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, তা পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ম্যাক্রো বা বৃহত্তর পর্যায়ের প্রভাব অনুধাবন করা যায়। অন্য রাষ্ট্র শত্রু --এই ইমেজকেন্দ্রিক নিরাপত্তার ধারণা থেকে সরে এসে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও যোগাযোগের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন অবধারিতভাবেই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। প্রথামিকভাবে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভারশীলতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহসম্পর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অনেকটা সংকটমুক্ত করেছে। নিবারণ প্রভৃতি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। বিশ্বায়ন

প্রক্রিয়ার ফলে জাতিরাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিরাপত্তার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এক অপূর্ব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই নতুন বাস্তবতায় জাতিসংঘের ভূমিকা অনেক অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। এর আগে কসোভোতে ন্যাটোর ভূমিকা, পূর্ব-তিমুর দ্বীপপুঞ্জে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রভৃতি জাতিরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে কার্যরত ক্রীড়ক (Super national Actor) সমূহের সক্রিয় নিরাপত্তা ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ছিল।[৪৪১] অর্থাৎ একুশ শতকের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বার্থ, রাষ্ট্রের কার্যক্রম বা রাষ্ট্রের অবস্থানের চাইতে হয়তো অতিরাষ্ট্রীয় ক্রীড়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বনিরাপত্তার জন্যে এর ফল সুদূরপ্রসারী। আমরা যদি জাতিসংঘ বা ন্যাটোর সাম্প্রতিক কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করি, তবে দেখা যাবে এসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সমস্যা, বিশেষ করে জাতিগোষ্ঠীগত (Ethnic) সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং সংখ্যালঘু ও অত্যাচারিত জাতিগোষ্ঠীর নিরপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে। এই ভূমিকাকে বহুলাংশে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যায়। যেহেতু বিশ্বায়নের একটি প্রধান উপাদান ও ফলাফল হলো পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, সেহেতু আজকের বিশ্বে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘন সমগ্র বিশ্বের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী এক বিশাল যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, যার ফলে প্রকৃত অর্থে একধরনের বিশ্ববিবেক ও বিশ্বজনীন স্বার্থের বন্ধনে সবাই আবদ্ধ হয়ে থাকছে। তাই কোনো পরাশক্তির ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক স্বার্থ এখন নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়নের এ পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে বিশ্বনিরাপত্তার জন্য বিশ্বায়ন বা বিশ্বায়নের প্রভাব বহুলাংশে ইতিবাচক বলে ধরে নেওয়া যায়। বিশ্বায়ন, বিশেষত অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রবক্তারা এ প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা কাঠামো সংক্রান্ত ইতিবাচক প্রভাবের উপরই বেশি জোর দেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানব নিরাপত্তার যে ধারণা আগে আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বিশ্বায়নের ভূমিকা সর্বাংশে ইতিবাচক-এই উপসংহারে পৌঁছানো একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনার এই পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্বামানব নিরাপত্তার ধারণা প্রতিদেশ ও প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা চাহিদার ভিন্নতাকে কোনো না কোনোভাবে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের নিরাপত্তা যে-ধরনের

---

[441] J.A Camelleri, C. Mazaffar Ed . *Globalization : Perspectives experiences of the Religions Traditions of Asia Pasific*, Delhi: 1998, p. 7

হুমকির সম্মুখীন, তা মধ্য-এশিয়া বা ইউরোপের মতো নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বে যে একধরনের সমজাতীয়করণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে, তা মানব নিরাপত্তার বহুমাত্রিকতার সঙ্গে সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তিগত বিশ্বায়ন তথা সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্যাক্স, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। তথ্য সংগ্রহ ও আদান প্রদানের যে ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে, তা এক দশক আগেও রূপকথাতেই কল্পনা করা যেত। বিশ্বায়ন বা বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের মতে তথ্যপ্রযুক্তির অপরিহার্যতা বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও মানুষকে এত কাছাকাছি এনে দিচ্ছে আর তাদের এতটাই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে যে, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের বাস্তবতা ক্রমশই হীনবল হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই তথ্যপ্রযুক্তির সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর এর প্রভাব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও ঐতিহ্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সে অঞ্চলের রাজনীতি। ফলে তথ্যপ্রযুক্তিগত বিশ্বায়নকে একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করার সম্ভাবনা থেকে যায়। স্যামুয়েল হান্টিংটন তার সুবিখ্যাত 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of Civilizations) শীর্ষক লেখায় নতুন বিশ্বব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতা সংঘাত ও সংঘর্ষের নতুন পটভূমি তৈরি করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৪২] যদি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার আত্মসাংস্কৃতিক পরিচয়ভিত্তিক কোনো উগ্র রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব ঘটায়, তবে এই ধরনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে পারে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পর্ণোগ্রাফী গড়ে তুলেছে। একে কেন্দ্র করে গড়ে তুলছে নিজেদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক। সহজভাবে বলতে গেলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে একধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া (Cultural Backlash) বিশেষ এবং তাকে ভিত্তি করে উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার আর সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যা তৈরি করছে। ইন্টারটেনের মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষী, উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলো তাদের মতবাদ খুব সহজেই সারা বিশ্বে প্রচার করতে পারছে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং থেকে শুরু

[442] Samuel Hantingtong, *Clash of Civilizations,* উদ্বৃতিঃ মো. শামীম আহসান, KUb¨ZÍK¨I, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২

করে ট্রাফিক ব্যবস্থা পর্যন্ত কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অনেক ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন। শুধু নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন নয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা কম্পিউটার ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে জনজীবনে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইন্টারনেট লিবারেশন বলে দাবি করা একটি দল বেশ কয়েক ঘন্টার জন্যে জেনারেল ইলেকট্রনিকস, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন প্রভৃতি বিশাল বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কম্পিউটার ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।[৪৪৩] তাছাড়া ইন্টারনেট বহুজাতিক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের পাস্পরিক যোগাযোগের সুযোগও বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক সময় পারমাণবিক রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্রপ্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী দলের কাছে সহজেই সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিশ্বায়ন তাই শুধুমাত্র অর্থনীতি বা রাজনৈতিক মতবাদের বিশ্বায়ন নয়, এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ একটি ভয়াবহ অরাষ্ট্রীয় বা বিশ্বজনীন সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, যেখানে সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে যৌথভাবে তাদের ধ্বংসলীলা চালাতে সক্ষম।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন থেকে বিচার করলেও মানব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ভূমিকা সম্পর্কে তর্কের অবকাশ থেকে যায়। গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ডে বিশ্ববাণিজ্যের যে-সব নিয়মনীতি গৃহীত হয়েছে ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা যে-সব নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে কাজ করছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বহু বিশ্লেষক এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় হাতিয়ার মাত্র। তাদের মতে, এই বিশ্বায়ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে 'haves' ও have-nots'-দের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলবে। মানব নিরাপত্তার ধারায় মানুষের যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে, বাজার অর্থনীতির ব্যবসায়িক স্বার্থভিত্তিক বিভিন্ন নিয়মনীতি সেই মুক্তির পথে বিশাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইতোমধ্যে পরিবেশবাদীরা বলছেন, গ্যাটের বিভিন্ন নিয়মকানুন বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পরিবেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখার বিষয়টিকে উৎসর্গ করেছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বে মানুষের পরিবেশগত নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

---

[443] প্রথম আলো, ঢাকা: ১২ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ.৯

নবম অধ্যায়: বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

বিশ্বায়ন এবং সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা এখন আর শুধু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিতর্কের ডান বা বাঁ যেদিকেই আপনি থাকুন, এমনকি বিতর্কে যদি আপনি বিমুখ হন তাহলেও বিশ্বায়ন আজ কাউকে তার বলয়ের বাইরে থাকতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশও আজ আপনি আমি সবাই বিশ্বায়নের আওতায় আছি।[৪৪৪]

বিশ্বায়ন হল আসলে দেশীয় সীমানার উর্ধ্বে শিল্প কর্পোরেশনের প্রসারতা এবং আন্তঃসীমাভিত্তিক অর্থনৈতিক সুবিধা ও সম্পর্কের এক সংযুক্ত প্রক্রিয়া যা ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দ্রুত বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে মতাদর্শ হিসেবে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তার পেছনে ক্রিয়াশীল আছে মুক্তবাণিজ্যের দর্শন। এই মুক্তবাণিজ্য দর্শন ও কর্মসূচিকে বাধামুক্ত করতে এর প্রতিরোধ-শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য জোর প্রচার চালানো হচ্ছে এক জনহিতকর অর্থনীতি হিসেবে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতিকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা দেবার লক্ষ্যে। বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট-কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত যাবতীয় তত্ত্বসমূহের অন্যতম। অন্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলো হলো মূলত দেশীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা এবং বৈশ্বিক মুক্তবাণিজ্য ও মুক্ত বাজারে অংশগ্রহণ। মুক্ত বাণিজ্যের মতো বিশ্বায়ন শব্দটির মধ্যেও এক ধরনের উৎকর্ষের সুগন্ধ পাওয়া যায়। যেমন ‘স্বাধীনতা’ সবার কাছেই প্রিয়, তেমনই বিশ্বায়ন যেন আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বিশ্বব্যাপী দেশগুলোর মধ্যে একটা সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ভাব সৃষ্টির ইঙ্গিত করে, যাকে জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী বলে মনে করা হয়।[৪৪৫]

যখন বিশ্বায়ন ও মুক্তবাণিজ্য তত্ত্বদ্বয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক বলে মনে হয় এবং এই উভয় প্রক্রিয়াই যে ধরনের রাজনৈতিক অর্থনীতির সহায়ক হয়ে ওঠে, তাতে প্রগতিশীলতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লাভবান হয় এবং গতি লাভ করে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জনস্বার্থের এঁটে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আবার এর পাশাপাশি এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার স্পর্শকাতরতাকে নিশানা করে তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে এবং আঞ্চলিক স্তরে এর বিরুদ্ধে

---

444 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, wekvqb bwK Avš Í RwZKZv, দৈনিক আমার দেশ, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৭

445 ড.আবুল বারাকাত, ‘বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশ’, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯০

আক্রমণ সংগঠিত করার পরিকল্পনা করতে পারলে উন্নততর পারস্পরিক বোঝাপড়া সাপেক্ষে বৃহত্তর বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। বিশ্বায়ন-বিরোধী কথার মানে এখানে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরোধিতা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শক্তিবর্গের জোটের চেষ্টায় এই বিশ্বায়নের কাজ চলছে।[৪৪৬]

৯.১. বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম

ধনীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুধু যে ক্রমাগত গরিবকে পদানত করে রাখার চেষ্টা করে তা-ই নয়, তার মধ্যে এই ধারাণাও প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে, এ ছাড়া তার অন্য গতি নেই এবং এই পদানত অবস্থাতেই তার অস্তিত্ব ও আত্মা শান্তি খুঁজে পাবে। আজকের পৃথিবীতে রূপার্ট মার্ডক বা টাইম ওয়ার্নার-এর মত সংবাদ ও বিনোদন মাধ্যমের কর্তাব্যক্তি বা সংস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের মানুষ ভোলানো মতাদর্শ সারাক্ষণ নানাভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ধনীর বিশ্বায়ন এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রায় সমার্থক শব্দ-গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত কাজ করে। পার্থক্য যদি করতে হয় তবে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, সাম্রাজবাদ বহু ক্ষেত্রে শুধু বহিঃশক্তি ব্যবহার করে কোনো দেশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। কিন্তু ধনীর বিশ্বায়ন যে দেশেই প্রবল ধনতন্ত্রী বা আধা-সামন্ততন্ত্রী শ্রেণি আছে, সেই শ্রেণিবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া নতুনভাবে মানুষের মধ্যকার অযৌক্তিক হিংসাকে উস্কে দিয়ে ধনীর প্রতাপ স্তরের ক্রিয়া নয়, ব্যাংক, শেয়ার বাজার, বীমা, ওষুধ, শিল্প, পরিসেবা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অশুভ প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশ্বায়ন সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা নব্বই ভাগের উপরেই অশুভ ছায়া ফেলে।[৪৪৭] বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় শিকার বলা যেতে পারে শ্রমজীবি জনগণ এবং নারী। মানুষের ইতিহাস চিরকাল শোষণ এবং প্রতিরোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এগিয়ে চলে। মানুষকে কোনোদিনই শোষকশ্রেণি নিষ্ক্রিয় যন্ত্রে পর্যবসিত করতে পারেনি। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকেও শোষক শ্রেণি শুধুমাত্র তাদের নিজেদের কাজে লাগাতে পারেনি। ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের যুগে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ছিল। বর্তমানে জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে নতুনতর সংগ্রাম আগের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[446] ড. মঞ্জুর মোর্শেদ, evsjv‡'‡ki ivR‰bwZK A_bxwZ, ঢাকা: আনন্দ প্রকাশন, আগস্ট ২০১৫. পৃ ৪৫২-৪৫৩

[447] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, wekvqb bwK Avš—ÍRwZKZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৯.২. বিশ্বায়নের ভাষা

বিশ্বায়নের সর্বব্যাপী প্রভাব ভাষাকেও স্পর্শ করেছে। বিশ্বায়ন শব্দটি যতবেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ততই তার হচ্ছে অপব্যবহার। চিন্তাশীল মানুষ যে যে বিষয়ে আগ্রহী, বর্তমানে তার মধ্যে একটি বহুল চর্চিত বিষয় বিশ্বায়ন। আর এই চর্চা কেবল মাত্র মনন ও চিন্তাজগৎকে পরিপুষ্ট করবার জন্য নয়, বরং তা অনেক বেশি প্রয়োজন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবার জন্য। ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিশ্বায়ন শব্দটির প্রচলন ঘটে। ইংরেজি Globalization শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বৈশ্বীকরণ, বিশ্বায়ন, গোলকীকরণ, গোলকায়ন, ভুবনীকরণ, ভুবনায়ন ইত্যাদি শব্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিক্রম করে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা ভাষায় বিশ্বায়ন শব্দটির প্রতিষ্ঠা দেয়। সেই থেকে বিশ্বায়ন শব্দটি এখন প্রায় বিশ্বজনীনতার মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় গণমাধ্যমে তারা জাহানী সুদান (বিশ্বায়ন) ও জাহানী বুদান (বিশ্বজনীনতা) নামে বিতর্ক উপস্থাপন করে জাহানী বুদানের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা দৃঢ়চিত্তে বলছেন কোনো দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্য দেশ এসে বদলে দেবে এধরনের বিশ্বায়ন বরদাস্ত করবেন না। তবে যে বহিরাগত চিন্তা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপে আঘাত হানবে না এবং যা সর্বমানবিকীকরণের অনুকূলে, তা গ্রহণে আপত্তি নেই। বিশ্বায়ন ভাবনায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হল Think Global, act local। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের চিত্রটি এর বিপরীত। বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি সকল গণমাধ্যম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত এই বিশ্বায়ন মতবাদ গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি করেননি। তাঁরা এই বিশ্বায়নকে অনিবার্য ও অপ্ররিরোধ্য বলে মনে করেন।

তাই 'বিশ্বায়নের ভাষা', এই বিষয়টি গভীর মনোযোগ দাবি করে। 'বিশ্বায়ন' শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি, বিমানপথে মাল পরিবহণের বহুল প্রচলন, টাকার বাজারে ফাটকাবাজি, দেশগুলোর সীমান্ত পেরিয়ে ক্রমবর্ধমান পুঁজি-প্রবাহ, ডিজনি (কার্টুন) সংস্কৃতির প্রসার, গণবিপণন, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বহুজাতিক কর্পোরেটের শক্তি বৃদ্ধি, নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমের অবাধ চলাচল, জাতিরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হ্রাস,

উত্তর-আধুনিকতা, ফোর্ড -পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা (অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশনের অবসান)-এ সবই 'বিশ্বায়ন' নামক প্রত্যয়ের পটভূমিতে রয়েছে।[৪৪৮]

৯.৩. বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি

'বিশ্বায়ন' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি ব্যাপক বিষয় এবং বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ কারণেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপজ্জনক দিকটি আরও গুরুত্বর্পূ। কেননা এটি আধিপত্যের মতাদর্শ (ideology of dominance) থেকে উদ্ভুত। যাকে আমরা উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিকভাবে ধ্রুপদি সাহিত্য, সার্গসঙ্গীত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শিক্ষাচর্চা, দর্শন, বিজ্ঞান, শেকসপিয়ার, কালিদাস, এরিস্টটল, প্লেটো হোমার ও ভার্জিল... অন্যভাবে বলতে গেলে এ হল একধরনের জ্ঞান ও পারদর্শিতা, যাকে সাংস্কৃতিক পুঁজি বলা যেতে পারে। একে আর্থিক পুঁজির মতই উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন ও সঞ্চয় করা যায়।

'সংস্কৃতি' শব্দটি উঁচুশ্রেণির বৌদ্ধিক পারদর্শিতা এবং আত্মিক শুদ্ধির প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। এ কারণেই একজন সংস্কৃতিবান মানুষ বলতে আমরা শিক্ষিত, পরিশীলিত, নান্দনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভদ্র কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করি। কিন্তু সংস্কৃত বলতে আবার জীবনচর্চার একটি প্রক্রিয়াও নির্দেশিত হয়, মানুষ নিজেদের জীবনে যার ব্যবহারিক চর্চা করে থাকে, যদিও সে চর্চা জাতীয়তান্বী এককে সংগঠিত নাও থাকতে পারে। এ জন্যই 'মুসলিম সংস্কৃতি', 'বঙ্গ সংস্কৃতি', 'ভারতীয় সংস্কৃতি', 'প্রাচ্য সংস্কৃতি', 'প্রতীচ্য সংস্কৃতি' প্রভৃতি শব্দ আমরা ব্যবহার করি।[৪৪৯]

৯.৪. বিশ্বায়ন ও যুদ্ধ

হাজার বছর পূর্বে জাবীর বিন হাইয়ান নামে এক আরব বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, একটি পরমাণুর বিভক্তিজনিত উদ্ভূত শক্তি বাগদাদ আয়তনের একটা নগরীকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট। সহস্র বছর পরে দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সেই বিবৃতিকে আমরা সত্য বলে জানতে পারলাম। একটা আণবিক বোমার নারকীয় শক্তি দেখতে যদি তিনি হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে উপস্থিত থাকতেন, সে ক্ষেত্রে এমন অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ কথনের জন্য তাঁর মনে হয়ত ঘৃণার উদ্রেক হতো। বিস্ময়াহত হয়ে জানতে ইচ্ছা হয়, কেন এমন হলো? ৩ লাখ ৪০ হাজার নিরীহ জীবন এটা কি যথার্থ বিনিময়মূল্য? এমন একটি আণবিক ধ্বংসযজ্ঞ কি অনিবার্য

---

448 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, wekvqb bwK Avš Í RwZKZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

449 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, wekvqb bwK Avš Í RwZKZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

ছিল? এটা কি এড়ানো যেত না? এর পুনরাবৃত্তি কি আবার কোথাও ঘটতে পারে? কবে অবসান ঘটবে এমন মূঢ়তার!

হিরোশিমা বিপর্যয়ের পর পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। এ ঘটনা যে ইতিহাসের এক বিচ্যুতিমাত্র এবং তা পুনর্বার আবির্ভূত হবে না-এ নিশ্চয়তার পথে আমরা বেশি দূর এগোতে পারিনি। কিছু চুক্তি আর কনভেনশন স্বাক্ষরের বাইরে আমাদের তৎপরতা একটা সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে প্রণিধানযোগ্য নয়। বরং মনে হচ্ছে আমরা আরও একটা বৃহত্তর হিরোশিমার দিকে এগিয়ে চলেছি, ধ্বংসের এ পথ যেন সুপ্রোথিত সন্নিকট ও অনিবার্য। স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) অবসানের পরও আজকের এই শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া যেখানে অত্যন্ত জোরদার দারিদ্র দূরীকরণে ও মানবকল্যাণ সাধনে, তারপরও আরও যুদ্ধ সংঘটিত করার সমস্ত প্রক্রিয়া আজ পৃথিবীতে প্রায় সম্পন্ন। এটা কিসের ইঙ্গিত?

আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ায় মানব সভ্যতার প্রথম যে পদচারণা শুরু হয়েছিল তা কখনও শেষ হয়ে যাবে না মর্মে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, বুদ্ধবাদ, হিন্দুবাদ, ইহুদীবাদ ইত্যাদি মহান ধর্ম বিশ্বাসের জন্য পৃথিবী এই মহাদেশের কাছে ঋণী। বিগত সহস্রাব্দে এই মহাদেশ মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিল এবং তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, মর্যাদা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু বিদ্যদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই এর অধিবাসীদের দুঃখ-কষ্ট শুরু হয়। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এশিয়ার এখন নৈতিক দায়িত্ব মানবজাতির নিয়তি বিনির্মাণ করা। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে পুনর্গঠন দরকার, মানবজাতি তা করবার মতো শক্তি আজও অর্জন করতে পারেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি সাধিত হলেও মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার দিক দিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে মানুষ। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এবং ইরাক দখল করে নিয়েছে-এ তারই এক পৈশাচিক চরিত্রের আংশিক বহিঃপ্রকাশ। মানবিক মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটাতে না পারলে এ পৈশাচিকতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। পুনরাবৃত্তি ঘটবে ২০০১ সনের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের। হান্টিংটনের মতো, কোনো কোনো যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ মনে করেন এভাবে প্রতিশোধ পরায়ন মনোভাব আগামী বিশ্বে সভ্যতার যুদ্ধে রূপ নেবে। বিংশ শতাব্দী বিশেষত এশিয়ার জন্য একটা সন্ত্রাস ও দুর্দশাকবলিত শতাব্দী। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এশিয়া দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে

সর্বাত্মক যুদ্ধ অধিকতর প্রত্যক্ষ করেছে। এর দুটি দেশ দু পরাশক্তির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়কালে এশিয়ার অধিংকাং দেশ তাদের প্রতিবেশী দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সীমান্ত সংঘর্ষ এখানে গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিতর্কিত ভূমি, দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ, প্রত্যন্ত ও সমুদয় দ্বীপযুঞ্জ নিয়ে দাবি, পাল্টা দাবির সীমা-পরিসীমা নেই। পারস্পরিক সমুদ্রসীমা কার্যত অস্তিত্বহীন হলেও এ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে। বিবাদ চলছে আন্তর্জাতিক নদীর পানির ভাগবাটোয়ারা নিয়েও। এ সংঘাত যেন চিরন্তন, অথচ এর কারণ তুচ্ছ বা এড়ানোর যোগ্য।

এখন সম্ভবত এশিয়ার জন্য সময় এসেছে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার। ১৮৬৫ সালের পর থেকে উত্তর আমেরিকার মাটিতে বড় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ১৮৯৯ সালের স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের পর মহাদেশীয় শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে সবই বিদেশের মাটিতে। এমনটি এ শতাব্দীতে সংঘটিত দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময়ও মহাদেশটি ছিল অনাক্রান্ত। এদিকে দিয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা কিছুটা কম শান্তিকামী। যুদ্ধের দাবানল এ শতাব্দীতে অন্তত দু'বার লণ্ডভণ্ড করেছে এ অঞ্চলকে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ মহাদেশ অপেক্ষাকৃতভাবে শান্ত আছে; পশ্চিম ইউরোপেও কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। মহাদেশীয় শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার যদ্ধে লিপ্ত হবার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ। বলকান অঞ্চল ব্যতীত গোটা পূর্ব ইউরোপও ঐ সময় শান্তির আর্শীবাদপুষ্ট ছিল। বাকি যুদ্ধমুক্ত মহাদেশ হচ্ছে ওশেনিয়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এশিয়া, আফ্রিকা ও কিছুটা কম হলেও লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধ এমন সর্বব্যাপী, এমন অপরিহার্য?[৪৫০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাষ্ট্র একটা বিরাট ভূমিকা নেয়। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। স্তালিনের আমলে বা পরবর্তীকালে দেশটি সমাজতন্ত্রী ছিল কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তৃতীয় নেতাদের চোখে সোভিয়েত রাষ্ট্র ছিল মূলত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী; তাঁদের অনেকেই সাম্যবাদে আস্থা রাখেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে সোভিয়েত সরকার প্রয়োজন যা সাধ্যমত সামরিক, রাজনৈতকি ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে স্বাধীনতাকামী দেশগুলোকে, এটাই ছিল মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের প্রত্যাশা। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সোভিয়েত সরকার সে প্রত্যাশা পূরণ করে। গত ১০-১২ বছরে ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন-যুগোস্লোভিয়া-আফগানিস্তান আর সবশেষে ইরাকে যে তাণ্ডবনৃত্য চালিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সেটা

---

450 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, weKvqb bwK Avš Í RwZKZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

সম্ভবত ঘটতো না সোভিয়েত আমলে। কমিউনিস্ট-শাসিত চীন প্রতিটি বিষয়ে ওজর-আপত্তি তুলেছে বটে, কিন্তু মার্কিনদের সরাসরি বিরোধিতা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাদের নেই। বিগত দিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভূমিকা নেবে চীন, সে প্রত্যাশা করা যায় কি?

বিগত কয়েক দশক থেকে মানবজাতি অন্য একটা ফ্রন্টে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং গুটিবসন্তসহ অনেক রকম প্রাণসংহারী রোগের বিরুদ্ধে বিজয় সংহত করেছে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ যেমন পোলিও নির্মূল করেছে পাশাপাশি নিজেদেরকে যুদ্ধের নৃশংশতা থেকে মুক্ত করেছে। এখন তারা যদি পারে সেক্ষেত্রে আমাদের না পারার কি আছে? যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার এবং পৃথিবীর বুক থেকে এর ভয়াল উপস্থিতি মুছে ফেলবার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। সারা পৃথিবীর রোগক্লিষ্ট মানুষের রোগ নিরাময় ও শিক্ষার জন্য নামমাত্র অর্থ সাহায্য দেয়, অথচ যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ৫০০ বিলিয়ন ডলার।

বস্তুত যুদ্ধ একটা রোগ, একটা মানসিক অস্থিরতা। প্রাণঘাতী জীবাণুর প্রবণতাকে এটা অনুসরণ করে। এই আমাদের মনকে দুষিত করে আমাদের ভিতরকার নিকৃষ্টতম প্রবণতাকে উস্কে দেয়। ক্ষতিকর এ জিনিসটি সুপ্ত থাকতে পারে, এর লক্ষণগুলো অদৃশ্য হতে পারে, সর্বোপরি অন্তর্ঘাতী হতে পারে। এই স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে যুদ্ধের দেবতাকে পূজা করা হয়। রাষ্ট্রগুলো মহিমা ও গৌরব অনুসন্ধানে যুদ্ধযাত্রা করে। এ যুদ্ধকবলিত মানসিকতা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনে। যুদ্ধে একটা রাষ্ট্রের যদি লাভ হয় তবে তা হয় অপর একটা রাষ্ট্রের ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিনিময়েই।[৪৫১] আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, বর্তমান বিশ্বে একটা জাতি বা রাষ্ট্র অস্তিত্ব অর্জন করে কেবলমাত্র তার গঠনকারী উপাদান জনগণের স্বার্থকে সমৃদ্ধতর করতে। এটা বারংবার এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, রাষ্ট্র নিজে কোনো উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য পূরণের একটা মাধ্যম মাত্র। এটা সেই উদ্দেশ্য যা এর নাগরিকদের প্রত্যাশাকে পূরণ করে। কিন্তু এ সময়কার রাজনীতিতে একটা রাষ্ট্র ও তার নীতিনির্ধারকেরা প্রায়ই হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক জন্তু-যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ থেকে বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্র হয় যুদ্ধের এবং যুদ্ধবাজদের হাতে বন্দী। এসব দেশের নাগরিকরাও একই ভাগ্য বরণ করে।

কখন একটা রাষ্ট্র সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে লালায়িত হয়ে ওঠে? নিরাপত্তার অভাববোধ, পাশাপাশি প্রতিবেশী কর্তৃক আক্রান্ত হবার ভীতি একটা দেশকে সমরশক্তির দিকে ঝুঁকবার সবচেয়ে শক্ত

---

451 দাউদ হায়দার, 'অভিবাসী ও মানবিকতা এবং রাজনীতি', %'wbK mgKvj, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ.৮

অজুহাত এনে দেয়। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন একটা রাষ্ট্রে সামরিকতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাতে পারে। তৃতীয়ত, একটি অগণতান্ত্রিক ও অত্যাচারী সরকার তার শক্তি সংহত ও স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। পরিণামে একটি দেশ সামরিক কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সর্বোপরি রাষ্ট্র প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে সামরিকতন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় যখন দেশটি জাতীয় আয় ও সম্পদের বণ্টন সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের স্বার্থকে এড়িয়ে চলে ও ক্ষতিগ্রস্ত দুর্ভাগ্যবশত এর জবাব ধনাত্মাকই হবে। হ্যাঁ সত্য সত্যিই বিশ্বে তা বিরাজ করছে। কেননা বিভেদ ও সংঘাত সংখ্যালঘু শাসকদের সুবিধা এনে দেয়। শুধুমাত্র একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ধাঁচের সরকারই পারে একটা রাষ্ট্রকে অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধংদেহী ও বেশি মানবীয় করতে।

৯.৫. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা

মানব সভ্যতার উন্নতির চরম উৎকর্ষের মধ্যে একুশ শতকের শুরুতেও চলছে উৎকণ্ঠা। একদিকে চলছে আরো উৎকর্ষ, প্রাচুর্য ও নিয়ন্ত্রণ লাভেবর চেষ্টা, অপরদিকে টিকে থাকার তাগিদে নানা প্রচেষ্টা। মানব সভ্যতার সমকালীন জ্ঞানভাণ্ডার এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষার যথার্থতা নিয়ে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো গভীরভাবে চিন্তিত, ভাবান্বিত। কেননা জ্ঞানের পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাত্রা ও পরিধি বাড়ছে। ফলে প্রাকৃতিক ও বস্তুগত কারণেই এক দেশ অন্য দেশের উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে। এতে বিশ্বজনীন সমন্বিত ভাবনা আরো সুসংহত হচ্ছে। বিশ্ব পরিণত হচ্ছে জ্ঞাননির্ভর একক সমাজে, যা থেকে জন্ম নিয়েছে বিশ্বানাগরিকতার ধারণা। এজন্য নতুন শিক্ষাভাবনা শুরু হয়েছে, যা বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির লোকের সঙ্গে বসবাস ও কাজ করতে পরস্পরকে সমর্থ করে তুলবে। তবে এতে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে আরো সচেতন ও সামঞ্জস্য বিধানে ব্রতী হতে হবে। তাদেরকে বহুজাতিক সংস্কৃতি, পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও সার্বজনীন জীবন যাপনের মধ্যেও নিজস্ব স্বকীয়তা ও আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট থাকতে হবে। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও অনুন্নত, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া-সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে সহায়তার জন্য পূর্বের তুলনায়

আরো তৎপর হয়েছে। তবে সামগ্রিকীকরণের ফলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা প্রায়ই যথাযথ গুরুত্ব পায় না। বিনিয়োগ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তা কাজে লাগানোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েও সংশয় বাড়ছে।[৪৫২]

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন হলেও আন্তদের্শীয় সহযোগিতা তথা বিশ্বায়নের ধারণা নতুন হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে পৃথিবী কার্যত আরো ছোটরূপ ধারণ করেছ। ইতোমধ্যে সার্ক, সাফটা, আসিয়ান, নাফটা, ইউ, জি-৮, এসকাফে প্রভৃতির উদ্ভব ঘটেছে এবং তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করে যাওয়া। ইউরোপে দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হলেও ঐ সকল দেশ মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করেছে, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য। প্রকৃত অর্থে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, ইইউ নিজেদের মধ্যে বিশ্বায়নের আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশের উদ্যোগে সার্ক গঠিত হলেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অবাধ বাণিজ্যের জন্য পণ্যতালিকা প্রস্তুত করতে পারেনি, পণ্যের মানের সমতার অভাবে। তাই বিশ্ববাজারেও বাংলাদেশের পণ্য অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন। কারণ বাংলাদেশ যথাযথ মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের জন্য যে উচ্চ প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান দরকার তা বাংলাদেশর মতো দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও জানা থাকা দরকার, এতে তাদেরও ভূমিকা প্রয়োজন। তবে বিশ্বায়ন বাংলাদেশর জন্যও সুফল বয়ে আনতে পারে, যদি আমরা মানবসম্পদসহ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

৯.৬. প্রশিক্ষণের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থারও আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা যায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে গত তিন দশকে বিদেশে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেনি, বরং বেড়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি হবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এতেও বিশ্বায়নের নতুন চাহিদার নিরিখে অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-শিক্ষা দেয়া হয় তা বিশ্বায়নের নতুন চাহিদা মেটায় না। জ্যাক হালাকের মতে, প্রচলিত বেশিরভাগ শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপযোগী জনবল

452. Strange, Susan (1997), Erosion of State, *Current History*, November; Svetlic, Marjan (1996), "Challenges of Globalization and Regionalization in World Economy", Global Society, Vol. 10, No. 2

তৈরির জন্য শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। বাছাইকৃত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে নিয়োগ দেয়ার জন্য, যা সমকালীন পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যবস্থা আসলে দেশের বিরাজমান নতুন ধরনের নিরক্ষরতা ধারণার সমর্থন যোগায়।[৪৫৩]

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেককে এমন কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, যেখানে দায়-দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হয়, যেখানে প্রশাসনিক উর্ধ্বমুখী কাঠামোর পরিবর্তে নেটওয়ার্কিং হয়, যেখানে অসংখ্য চ্যানেলে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে তথ্য প্রবাহিত হয়, যেখানে আদেশ/আজ্ঞাবহনের স্থলে উদ্যোগ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং যেখানে দেশের বাইরে বাণিজ্য প্রসারের স্ট্রাটেজি অত্যন্ত জটিল। সুতরাং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এমন হতে হবে যা প্রত্যেককে এমন সব কাজ করতে সমর্থ করবে যার জন্য তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন; যা তাদের নন-লিনিয়ার ক্যারিয়ার প্রস্তুত করবে। কর্ম-দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবে, স্বাধীনভাবে তথ্য ব্যবহারে সক্ষম করবে; উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল ক্ষমতা বাড়াবে; সর্বোপরি বাস্তব জীবনের চরম পরিস্থিতিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমর্থ করবে।[৪৫৪]

৯.৭. শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো

জ্যাক হালাক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দেখিয়েছেন বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ক্ষেত্রে কিভাবে সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধু নতুন প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিাতেই খাপ খাওয়ানোর জন্য পথ ও উপায় ব্যবহার করতে হবে, যেমন:

১. শিক্ষকের ভূমিকা পরিবর্তন: প্রশিক্ষণকালে যেসব শিক্ষার্থী তথ্য খুঁজে বের করতে পারে, প্রক্রিয়াকারণ করতে পারে এবং বিশ্লেষণ করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষক তার ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করে শিক্ষণের পরিবর্তে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এজন্য তাকে নতুন তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবস্থা করে শিখন-শিক্ষণ এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে হবে। এই বিবর্তনের (অন্তর্নিহিত) নির্দিষ্ট অভিপ্রায়/উদ্দেশ্য হচ্ছে:

(১) তাদের কতগুলো বিষয়ে, যেমন শিখনপদ্ধতি চয়ন, শ্রেণিকক্ষের স্থান ও সময়বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া;

---

453. Ellen Wood, *Globalization or Globaloneny?* Cambridge University Press, 1997

454. David Felix, *Asia and Crisis of Financial Globalization,* Cambridge University Press, 1998

(২) তারা যাতে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে ও তাদের কাছে যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকে এবং

(৩) পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়ার আলোকে নিয়োমিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের বেতন নির্ধারণ করা।[৪৫৫]

২. সার্টিফিকেশন পদ্ধতির পুনঃনিরীক্ষণ: দ্রুত পরিবর্তনশীল চাকরির বাজারের চাহিদার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের খাপ-খাওয়ানোর দক্ষতা নির্ণয়ের ভিত্তিতে সার্টিফিকেশন চাহিদার প্রচলন করা। এজন্য জ্ঞানবহির্ভূত অন্যান্য পেশাগত বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানকেও পরিমাপক (criteria) হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া সার্টিফিকেশন পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে যাতে তা গ্রহণযোগ্য হয় এবং শিক্ষার্থী ও কর্মজীবির কর্ম-পরিসর বিস্তৃত হয়। এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সার্টিফাইয়িং বডি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষা-ব্যবহারকারীর প্রতিনিধি এবং মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৩. শিক্ষার প্রতি স্তরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পুনর্বিবেচনা: শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বলতে শিক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বিন্যাসকে বোঝায়:

(১) প্রত্যেকের মৌলিক শিক্ষার (Basic Education) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যাতে উৎপাদনক্ষম, কর্মোদ্যোগী ও দায়িত্বশীল নাগরিকের সমন্বয়ে একটি সমাজ গঠিত হয়, যারা সমসাময়িক ধ্যান-ধারণার বিষয়ে সাড়া দিতে ও চিন্তাভাবনা করতে পারবে;

(২) উচ্চ শিক্ষাস্তরে ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী ও কারিগরদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যাতে তারা দক্ষতার সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আর্থ-সামাজিক জরুরি সমস্যা বিশ্লেষণ করে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিতে পারে এবং

(৩) এই কাঠামোতে মাধ্যমিক শিখন-শিক্ষণ একটি সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ এই স্তরটি কী ক্রমাগত (Progressively) পরিত্যক্ত হবে, নাকি মৌলিক শিক্ষার অংশ হবে-সে সম্পর্কে ভাবতে হবে।

---

455. Alice Amsden, *Asia's Next Giant: South and Late Industrialization,* Oxford University Press, New York, 1989; Sahamat, *Culture and Globalization,* Safder Hasmi memorial Lectural Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1990

৯.৮. বিশ্বায়ন বিতর্ক

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: বিশ্বায়ন কি অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে অবশেষে সকল দেশকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, অথবা এটি কী একটি স্বল্পায়ু চলমান খোশখেয়াল (passing fad)? বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন/বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে হালাকের নিম্নরূপ মন্তব্য লক্ষণীয়:

১) বিশ্বায়ন প্রবণতাকে বিবেচনায় না নেয়া হলে বর্তমানের তুলনায় আরো বেশি প্রান্তিক (marginalizing) হওয়ার ঝুঁকি থাকবে, কোনো কোনো দেশ আন্তঃদেশীয় বিশ্ব আর্থ-ব্যবস্থার বাইরে পড়ে যাবে;

২) বিশ্বায়ন অভ্যন্তরীণ সংস্কার ব্যতিরেকে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা সম্ভারের উদ্ভব (বিশেষ করে বেসরকারি খাত থেকে) এবং অভিনব অ্যাপ্রোচকে সমর্থন জুগিয়ে অধিকাংশ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রবল প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে; এবং

৩) বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত ঔপনিবেশিকতার ঝুঁকি থাকলেও এর প্রভাবে স্থানীয়দের স্বাতন্ত্র্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ হবে এমন ভাবার কারণ নেই।[৪৫৬]

৯.৯. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বায়ন শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বিশ্বায়ন ধারণাটির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যই একে নিয়ে আবর্তিত প্রবল বিতর্কের কারণ কারো কারো মতে এটি ১৯৮০ ও ১৯৯০ দশকের উদার অর্থনীতিরই নতুন রূপ। তাদের মতে সেই অর্থে বিশ্বায়ন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন বাজারশক্তি, যা রাষ্ট্রে ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং অসমতার জন্ম দেয়। এটি প্রসারমান উন্মুক্ত বাজার ও সমন্বিত বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বৈশ্বিক শোষণ (exploitation) দারিদ্র ও বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বলা হয়, অনুন্নত গরীব দেশগুলোর প্রতিকূলে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে, যেমন গ্যাট, ইউআর, ডব্লিউটিও-এর উদ্যোগে চালানো হয়েছে। এটি ভাষার মারপ্যাচ ও চাতুর্যের অন্তরালে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আরো সুবিধা আদায়ের স্থায়ী আরেকটি উদ্যোগ মাত্র,

456. The World Trade Organizaiton Mellenium Round, Free Trade in the Twenty First Centry, Klaus Gnter Deutsch & Bernhard Speyer lan Livingstone, Development Economic and Policy Readings, London, 1981

যাতে পুরো বিশ্বব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর মূলধন তাই ব্রেইন ড্রেইন (brain drain)। সম্ভবত এ জন্যেই তদানীন্তন বিশিষ্ট বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যা সফল হতে পারেনি। বলা হয়, বিশ্বায়নের ঘোষিত নীতিমালা সফল হলে অনুন্নত দেশগুলোর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হবে এবং অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চলে যাবে গুটিকয়েক উন্নত দেশের সরকারের হতে, দেশি-বিদেশি তথা বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির মাধ্যমে। প্রকৃত অর্থে বিশ্বায়ন হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরশীলতা। শীতলযুদ্ধকালীন অবস্থার অবসানের পর থেকে এ প্রক্রিয়ায় গতির সঞ্চার হয়েছে। পণ্য, সেবা, মূলধন, জনসাধারণ এবং তথ্যের (জাতীয়) সীমান্তের বাইরে অবাধ প্রবাহের সুযোগ ঘটায় নতুন বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে তাই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রসার ও আন্তর্জাতিক বিনিময়/যোগাযোগের খরচ হ্রাস পেয়েছে, প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণার বিস্তার ঘটেছে, বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য-ব্যবসার পরিধি এবং মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও মানবাধিকার চুক্তিসহ (অন্যান্য) বিশ্বচুক্তি ও সহযোগিতার বন্ধন, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি (norms) ও মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রের চর্চা অবাধে বিস্তার লাভ করেছে। তবে গরীব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলো উদারভাবে সাহায্য (AID) দেয়ার ক্ষেত্রে নানা শর্তারোপের ফলে এই ব্যবস্থা ও চর্চা কার্যকর হয়নি। সুতরাং গরীব দেশগুলো গরীব থেকে আরও গরীব হচ্ছে।[৪৫৭]

বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়াও বিশ্বায়নের অবদান, যা বর্তমানে তিনভাগের একভাগ এবং বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বহুজাতিক কোম্পানির সহযোগীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা যথাযথ হলে বিশ্বায়নের মাধ্যমে দেখা যায় প্রচুর সম্পদের সৃষ্টি হয়, যা দরিদ্রের উন্নতিতে ব্যয় করা যায়। ব্যবস্থাপনা খারাপ হলে দরিদ্রদের অবস্থা আরো প্রান্তিক হয়। লাভ বা ক্ষতির কোনোটিই পূর্ব নির্ধারিত নয়; সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি খাত ও সিভিল সোসাইটি মিলে যে নীতি নির্ধারণ করে তার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। তবে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা উন্মুক্ত বাণিজ্যনীতি অবলম্বনকারী ১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকেও

---

457. Adam Smith, *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations,* Oxford University Press 1976; World Bank Debt Tables: External Finance for Developing Countries, World Bank Washington, 1994

সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যদিও এর ভিত্তি, ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব এবং কৃত্রিমতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।[৪৫৮]

৯.১০. বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, সংশয়, বিভক্তি, অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশগুলোকে খাপ-খাইয়ে চলতে হবে।[৪৫৯]

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই আর্থিক-বিভক্তি (Economic-divide), শিক্ষা-বিভক্তি বা শিক্ষা-বস্তি (Education-divide of Education-getto) এবং ডিজিটাল-বিভক্তির কবলে নিপতিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত) এবং প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রথমে পশ্চাৎপদতাজনিত যাবতীয় ঘাটতি মোকাবেলার জন্য দ্রুত গতিতে উপযুক্ত জনবল তৈরি করতে হবে, যা আমাদের ঘাটতি থেকে উত্তরণের পাশাপাশি চাহিদানুগ নতুন নতুন দায়িত্ব পালনেও সক্ষম করে তুলবে।[৪৬০]

তাই আমাদের জনগণের যথাযোগ্য জনসম্পদে রূপান্তরই হবে চরম প্রান্তিকতা থেকে রক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি উত্তরোত্তর যাতে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত নিত্য-নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা জোগান দিয়ে দেশ ও জাতির অগ্রগতির ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দৃঢ় সংকল্প এবং নিবিড় শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমানে শিক্ষাই হচ্ছে আসলে বিশ্বে প্রবেশের দ্বার (gateway to the world), কোনো গ্রিনকার্ড বা কোটা নয়।

৯.১১. বিশ্বায়ন ও জনসম্পদ উন্নয়ন নীতি: বিবেচ্য বিষয়

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর্যুক্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থবিরতা ও বাংলাদেশীদের সম্ভাবনাময় মেধার আলোকে উপযুক্ত মানবসম্পদ বা ক্রিটিক্যাল মান

---

458. Buzan Barry, *An Introduction Relations*, London: Macmillan, 1987

459. Earle Edward Mead (ed). *Makers of Modern Strategy? Military Thought from Machiavelli to Hitler*, Princeton University Press, Princetion, 1960

460. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, University Press Limited, Dhaka, 1993

সৃষ্টির স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি-পরিকল্পনার যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য একটি নিরপেক্ষ পেশাগত পর্যালোচনা এখানে অপরিহার্য মনে করি।

বাংলাদেশ ছোট হলেও এর শিক্ষা ব্যবস্থা সুবিস্তৃত। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা মতাদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিবেচনায় একক জাতীয় ব্যবস্থার উপযোগী, যা যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনেরও অনুকূল। বলা বাহুল্য, বিগত দু-তিন দশক যাবৎ দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক এবং বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীও সমভাবে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতির কথা বলেছেন। আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় বছরের শুরুতে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমরা কি সত্যিকার অর্থে জাতীয় ভিত্তিতে উপযুক্ত ঘোষণা রূপায়নের জন্য কার্যকর কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি? এর উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। তাই একদিকে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিজনিত বিপুল পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণ এবং অপরদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিকে সফলভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সার্বিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে বিশ্বায়নের প্রতিকূলতা মোকাবেলায় বাংলাদেশের কার্যকর তৎপরতা ব্যতিত কোনো গত্যন্তর নেই। আসলে শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া বর্তমান দারিদ্র্যসহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যে পর্যায়ে আছি তাও সংরক্ষণ করা যাবে না।

৯.১২. বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রক্রিয়া ও পুঁজিতন্ত্রায়নেরই একটি নতুন ধরন। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক শক্তিগুলোর অবাধ বিচরণ ঘটে। ফলে মানুষের ক্ষমতা ও দেশের সম্পদ সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সঞ্চালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীসমাজের সঙ্গে এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে সম্পৃক্ত সে-বিষয়ক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।[৪৬১] সভ্যতার ইতিহাস নির্মাণে নারী ও পুরুষের অংশীদারিত্ব যেমন সত্য, তেমনি মানুষে-মানুষে, শ্রেণিতে-শ্রেণিতে বঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাসও সত্য। বলা যায়, এ-এক অতি নির্মাম সত্য। যুগ-যুগ ধরে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে আছে এবং নেই এর মধ্যে এবং শোষক আর শোষিতের মধ্যে লড়াই চলে এসেছে। সমাজপ্রবাহে নারীর অবস্থান তাই সুচিহ্নিত। বিশ্বায়ন শ্রমবাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ঘটালেও

---

461 আবেদা সুরতানা, 'বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী; পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ.৫৪

তার অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা এখনো বহুমুখী বৈষম্যের শিকার। বিশ্বায়ন প্রসূত শ্রমবাজারে নারীশ্রমের কোণঠাসাকরণ তাদের শ্রমজীবনকে উন্নত করতে পারছে না। সস্তা শ্রমের কারণে শ্রমের নারীমূখীকরণ ঘটালেও তা আনুভূমিকভাবে (Horizontal) যতোটা নারীশ্রমের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে, উল্লম্বভাবে (Vertical) ততোটা ঘটেনি। জেন্ডার বৈষম্য প্রকটতর হওয়ায় নারীর নাজুকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৬২]

প্রচলিত অর্থনীতি, জাতীয় আয়, উৎপাদন, শ্রমশক্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক তত্ত্ব নারীর অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে এতদিন ছিল আশ্চার্যজনকভাবে নীরব। কারণ জেন্ডার বৈষম্যের পরিধি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রচলিত ধারণায়, পুরুষ বিবেচিত হয় শ্রমশক্তিরূপে। কারণ সে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তার শ্রমশিক্ত বিক্রি ও উপার্যন করে। আর জীবন ধারণের জন্য বাকি অত্যাবশ্যকীয় কাজ, অর্থাৎ পুনঃউৎপাদনমূলক (reproductive role) ভূমিকা সারাবিশ্বে নারী পালন করে। যেহেতু এসব কাজের কোনো পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য নেই, তাই তা স্বীকৃতিহীন। অথচ এই পুনঃউৎপাদনমূলক কাজ, যেমন সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন ও রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, পানি ও খড়ি সংগ্রহ, সেবাযত্ন করাসহ যাবতীয় গৃহস্থালি কর্ম সম্পাদন যখন কেউ কোনো অর্থ বা দ্রব্যের বিনিময়ে করে তখন তা হয় উৎপাদনমূলক (productive)। ঘরের কাজ বা গৃহশ্রমকে তাই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। উন্নত-অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সব দেশেই এ-চিত্র দৃশ্যমান।

বর্তমান শতাব্দীর তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব সামাজিক জীবনকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে শুরু করে। এ বিন্যাসের ধারক জ্ঞানভিত্তিক ও সম্প্রদায়গত। পুঁজি, প্রযুক্তি, তথ্য, পণ্য, পরিষেবা ও মুনাফার মাধ্যমে জাতিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনের আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন, অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের প্রকাশ ও প্রসার, গণমাধ্যমের প্রভাব এবং পরিবেশগত সমজাতীয় ভাবনা এ প্রক্রিয়াকে বেগবান করে। বিশ্বব্যবস্থার প্রাচীন ত্রিধা বিভক্তির (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্ব) অবলুপ্তির সঙ্গে নতুন বাজার সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের তৎপরতায় সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিরপেক্ষতা অর্জন করে। ফলে মুক্তবাজার অর্থনীতির ভিত হয় সুদৃঢ়। পক্ষান্তরে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় গোটা বিশ্বকে একই অবস্থানে সংহত করে। দৃশ্যমান ভাবনা এর মধ্য দিয়েই

[462] আবেদা সুরতানা, 'বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী; পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ', পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা ও দ্রুত প্রসার লাভ করে। দৃশ্যমান হয় যে, বিশ্বায়ন-উদ্ভূত বাণিজ্য উদারীকিরণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-মুক্তকরণ, বেসরকারিকরণ, ভুর্তুকি প্রত্যাহার-এসবই দেশের ভেতরে বিদেশী পুঁজিকে ধাবিত করেছে। ফলে দেশের উপর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের ঋণের বোঝা চাপাচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার অভাব, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জর্জরিত বাংলাদেশর মতো দুর্বল সরকারের মেশিনারিকে বিশ্বায়ন যেমন একদিকে দায়-দায়িত্বহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বেসরকারিকরণ ও কাঠামোগত পুর্নবিন্যাস কর্মসূচি ব্যাপক মাত্রায় দারিদ্রের নারীমুখীকরণ (feminization of poverty) ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি, নেতিবাচক প্রভাব এখনো ব্যাপকভাবে পরিমাপ করা না হলেও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নারীর সামগ্রিক অবস্থান বিনির্মাণের বিরূপ চিত্র এরই মধ্যে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ও বিশ্বায়নের প্রভাব নিরূপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান সামগ্রিকভাবে নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে।[৪৬৩]

১৯৭০-এর দশকে ইস্টার বোসেরাপ-এর সাড়া জাগানো গ্রন্থ Women's Role in Economic Development প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থে তিনি 'নারীরা কেবল তাদের পুনঃউৎপাদন বা প্রজননমূলক ভূমিকায় আবদ্ধ', এই প্রচলিত ধারণার বদলে নারীদের উৎপাদশীলতার উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং কৃষিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে তুলে ধরেন। তিনিই প্রথম জেন্ডার সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। ১৯৮০-র দশকে বিভিন্ন অধ্যয়ন নারীর গৃহশ্রমের স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক তোলে এবং বিশ্বায়নের ধারাটি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তির বাজার তৈরিতে তৎপর হয়। ফলে ক্রমশ বিশ্বজুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রের, বিশেষত অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও অবদান দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে নারীরা সংসারে যে কাজ করে, তার দাম দিতে হলে এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত করলে সমস্ত পৃথিবীর মোট জাতীয় আয়ের পরিমাপ সমাজে নারীর অদৃশ্য অবদানের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলো। এই হিসেবে দেখা গেছে যে, পরিবারে তৈরি হয় পরিবারেই ভোগ হয়। এ-রকম জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় মোট ১৬

463 আবুল বারাকাত (ও অন্যান্য), 'বিশ্বায়ন ও নারী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,' evsjv‡'k bvix cMwZ msN, ঢাকাঃ ফেব্রয়ারি, ২০০২, পৃ.২৯

ট্রিলিয়ন (১৬ লক্ষ কোটি) ডলার মুল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১১ ট্রিলিয়ন (১১ লক্ষ কোটি) ডলার উৎপাদন করে নারীরা। অর্থাৎ, বিশ্বের মোট উৎপাদিত পণ্যের ১০-৩৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় নারীর গৃহকর্ম থেকে। কিন্তু এর কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। এই হিসেবে বিশ্বঅর্থনীতি থেকে প্রতিবছর ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যাচ্ছে বা গণনা করা হচ্ছে না। যেহেতু এই ১৬ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে নারীর অবদান ১১ ট্রিলিয়ন। তাই বিশ্ব-অর্থনীতিতে নারীর অদৃশ্য অবদান হলো ১১ ট্রিলিয়ন ডলার।[৪৬৪]

সামাজিকভাবে বাংলাদেশ শ্রেণিভিত্তিক, সাংস্কৃতিকভাবে প্রথাগত আর আদর্শিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক। এ-রকম প্রথাগত, পিতৃতান্ত্রিক সামাজে পুরষের আধিপত্য স্বাভাবিক বাস্তবতা। কেননা এ-ধরনের সমাজে পুরুষ প্রধান উপার্জনকারী, পরিবারের কর্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রক। এ-সমাজে নারীর অবস্থান সংগত কারণেই অধস্তন। বিশেষত গ্রামীণ নারীদের একমাত্র নির্ধারিত ভূমিকা গৃহকর্ম ও প্রজননকর্ম সম্পাদন। পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন নারীদের অধস্তন করে রেখেছে এবং পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সাধারণভাবে শ্রমবিভাজনের সামাজিক অসমতার কারণে নারীদের শ্রম সস্তা করে তুলেছে। বাংলাদেশে ১৯৭০-এর দশকে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো নারীকে এ-যাবত গৃহস্থালির চৌহদ্দি পেরিয়ে ঘরের বাইরে মুক্ত করে দিয়েছে। মূলত আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণেই বাংলাদেশের নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সমাজে মতাদর্শিক পরিবর্তনের অবর্তমানে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে নারীর অনুকূলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেনি। প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ না থাকায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ-ধরনের মাধ্যমে পুরুষ-প্রধান মুল্যবোধের আরোপণ ও আত্মাস্থিতকরণ বজায় রাখার স্বার্থে রাষ্ট্র নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে দুভাবে: (১) শ্রমশক্তি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং (২) সামাজিক ও আদর্শিক বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে, অন্যদিকে বৈশ্বিক বুদ্ধিজীবীসমাজ ও তাঁদের সহযোগীদের জন্য খুলে দেয় অপরিমিত ভোগের দুয়ার। এ-প্রক্রিয়ায় বছরে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ দরিদ্র দেশগুলো থেকে ধনী দেশে

---

464 বন্দনা শিবা, 'বিশ্বায়ন এবং পরিবেশ', রতনধনু সম্পাদিতগ্রন্থ eûgwÎK wekvqb, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩০৬

চলে যায়।[৪৬৫] ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কল্যাণমুখী বাজেট বরাদ্দ কর্তন করা হয়। এর বোঝা বইতে হয় দরিদ্র পরিবারের ও শিশুদের। বিশ্বায়ন শ্রমবাজারে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেনি। কেননা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী বহুমুখী বৈষম্যের শিকার। এ-প্রক্রিয়া নারীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও হয়রানি, তার নাজুকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপর্যুপরি এ-প্রক্রিয়ায় নারীর স্বকীয়তা ও সামর্থ্য অবদমিত হয়েছে। এ-প্রক্রিয়া নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নারীকে পণ্যে পরিণত করেত সহায়তা করেছে। বিশ্বায়ন নারীকে আপাত ক্ষমতায়ন, সনাতন জীবন ধারার পরিবর্তন, মতামত তৈরিতে স্বাধীনতা এবং নিছক অর্থনৈতিক সক্ষমতা দিয়েছে, শ্রমবাজারে নারীর অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে। ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় ও অনুন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে সমাজে জেন্ডার বৈষম্য প্রকট হওয়ায় নারীর অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যা দুর্ভোগপূর্ণ ও হতাশাব্যাঞ্জক।

বিশ্বায়ন পৃথিবী থেকে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের আদর্শগত প্রয়োগ ঘটেনি। সামাজিক ন্যায়বিচার ও উৎপাদন উপকারণের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না -হয়ে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বায়নের লক্ষ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উদারীকরণে, নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ও ব্যক্তি-মালিকানাধীনকরণের মাধ্যমে অর্থনীতি উন্মুক্ত করা। কিন্তু এ-প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কাঁধে চাপে দারিদ্র্যের বোঝা। ঔপনিবেশিকতা, নির্ভরশীলতা সর্বোপরি কেন্দ্র-প্রান্তিক সম্পর্কই পরিণামে শক্তিশালী হয়েছে। তাই বিশ্বায়নকে নিয়ে ভাবতে হবে সুগভীরভাবে। এর নেতিবাচক প্রাভাব থেকে রক্ষার জন্য স্বনির্ভর ও টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। উন্নত বিশ্ব সবসময়ই নিজের লাভের পাল্লা ভারি রেখেই অন্যদের জন্য ন্যুনতম সুবিধার কথা চিন্তা করে। তাদের এ মানসিকতা মূল্যায়ন করেই তাদের সাথে সংযুক্ত হতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের কল্যাণমুখী কর্মসূচী শক্তিশালী করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যেসব নিয়ামক প্রধান বলে বিবেচিত হয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার মধ্যে অন্যতম। নারী-পুরুষের সমতার মূলভিত্তিও অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন। উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শেষার্ধে একটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি। নারী শুধু পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা নয়, শ্রমশক্তিরও অর্ধেক। সুতরাং বিশ্বায়ন অন্তত নারীকে অধিক মাত্রায় শ্রমবাজারে সংযুক্ত করে নারীর একটি অর্থনেতিক ও সামাজিক পরিচিতি দিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে

[465] দাউদ হায়দার, 'অভিবাসী ও মানবিকতা এবং রাজনীতি', পূর্বোক্ত, পৃ.৮

বাংলাদেশে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। কারণ গত দেড় দশকে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ এবং তা সুসংহতভাবে পরিচালিত নয়। অধিকন্তু এ-সকল কর্মকাণ্ড নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেনি। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ আনুভূমিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি তা যাতে লম্বভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশ্বায়ন-উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায়, বিশেষত নারীস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টিতে এবং শ্রমবাজারে নারী-পুরুষের সমতা বিধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়:

১. বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাবতগুলো সম্পর্কে নারীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনারের আয়োজন ও তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

২. নারী মর্যাদার উন্নততর পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সমাজ তা মেনে নিচ্ছে। এই অপসংস্কৃতির গ্রাস থেকে নারী গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে এ - সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত।

৩. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ILO প্রণীত শ্রমমান সম্পর্কে WTO-এর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করতে হবে।

৪. সকল শ্রমজীবী মানুষকে তথা নারীকে মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা ছাড়াও ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি-ক্ষেত্রে নারীর দক্ষ অংশগ্রহণ বাড়াতে শিক্ষা কার্যক্রমের পরিবর্তন জরুরি।

৬. গার্মেন্টস শিল্পকে অধিকতর প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠতে হবে।

৭. ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত নারী-কর্মীদের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর অনুযায়ী সকল কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদি নারী অভিবাসন হচ্ছে। সরকারের উচিত নারী অভিবাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করে অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপারে খুব জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা। সংবিধান-বর্ণিত নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হলে নারী অভিবাসন সংক্রান্ত নীতির সংস্কার প্রয়োজন।

৯. দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।

১০. জীববৈচিত্র ধ্বংস ও কৃষিবীজ-সংরক্ষণের ঐতিহাসিক পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলার পথ এখনই চিন্তা করা উচিত। এখন থেকেই প্রকৃতি ও নারীর ধ্বংস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দশম অধ্যায়: ইসলামে বিশ্বায়নের ধারণা ও বিশ্বায়নের ইসলামী বিকল্প

১০.১. ইসলামের বিশ্বায়ন ও বিশ্বজনীনতা

পৃথিবীতে অসংখ্য দ্বীন ও ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছ আসমানী আর কিছু মানব রচিত। কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হলো-ইসলাম আসমানী ও সভ্য ধর্ম হওয়ার সাথে সাথে একটি আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলাম বিশেষ কোনো জাতি ও গোত্রের জন্য নয়, বরং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানবের জন্য। ইসলাম তার দিকে আহ্বান করার জন্য বিশেষ কোনো জাতিকেই সম্বোধন করেনি, বরং গোটা মানব জাতিকেই সে সম্বোধন করেছে। তার দাওয়াত ও পয়গাম কোনো গোত্র, বংশ, জাতি কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমিত থাকেনি। বিশ্বের যে কোণায়ই মানুষ কদম রেখেছে, ইসলামের দাওয়াতও সেখানে পৌঁছেছে এবং তার উন্নত শিক্ষা ও সমুন্নত মূল্যবোধ দ্বারা মানুষকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নিয়েছে।

পবিত্র কুরআন অসংখ্য স্থানে ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম হওযার ঘোষণা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত রাসূল (সা)-এর রেসালাত, কুরআনের দাওয়াত ও ইসলামের পয়গাম প্রত্যেক মানবের জন্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৪৬৬]

আল্লাহ পাক বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[৪৬৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে " হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারিতা অর্জন করবে।"[৪৬৮]

আল্লাহ পাক বলে,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.

---

৪৬৬. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭

৪৬৭. আল-কুরআন, সূরা সাবা, আয়াত: ২৮

৪৬৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২১

"বলে দাও, হে মানব মণ্ডলি! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর রাসূল যে আল্লাহ রাসূল হিসেবে সমগ্র আসমান ও যমীনের একমাত্র মালিক।"[৪৬৯]

এটাই পার্থক্য ইসলামের আন্তর্জাতিকতা আর বিশ্বায়নের মাঝে। ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম কিন্তু সে নিজে নিজেকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় না, বরং অন্যান্য জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্মান করে এবং আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়িত্বের প্রবক্তা। আর বিশ্বায়ন বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর সকল সভ্যতাকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোটা মানবতাকে উপকার করা নয়, বরং একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশ্বের সকল ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বানানো।

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং তার দাওয়াত বিশ্বজোড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম তার সভ্যতা জোরপূর্বক অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বের সকল সভ্যতার এক সমন্বিত রূপ। ইসলাম অন্যান্য সভ্যতার ভাল কথা গ্রহণ করেছে এবং নিজের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয় এমন অভ্যাস ও রীতিনীতি বাকী রেখেছে। ইসলাম ধর্ম জাতি, দ্বীন, ধর্ম ও ভাষার ভিন্নতাকে মানব জাতির স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছে।

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক ড. মুহসিন আবদুল হামীদ লিখেছেন, ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র ও দেশের লোক বাস করে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। এজন্য ভূ-পৃষ্ঠের কল্যাণ এর মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত যে, সবাই পরস্পরে ঐক্য ও সহযোগিতার সাথে বসবাস করবে। এক জাতি যদি অন্য জাতির রীতিনীতি ও আচার-আচরণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কোন জাতি তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ অন্য জাতির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয় তা হলে অবশ্যই এটা একটি অনৈতিক অন্যায়। ইসলামের ইতিহাসের কোথাও এ কথা পাওয়া যায় না, যা দ্বারা একথা জানা যায়, মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতির কোনো রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদেরকে কোনো এক দিকে পরিচালিত করেছে, কিংবা কোনো বিশেষ ব্যবস্থার অধীন করেছে। বরং মুসলিম জাতি সর্বদা বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও জাতির স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যের সাথে নিজের মত ব্যবহার করেছে। এ কারণেই ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম শাসনকালে ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করেছে। মুসলমানরা সর্বদা আল্লাহ পাকের নির্দেশকে সামনে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "হে

---

৪৬৯. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৮

মানব সমাজ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সবচে' বেশি সম্মানিত যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন।"[৪৭০]

কিন্তু বিশ্বায়ন সর্বদা পুরো বিশ্বকে একই রঙ্গে রঙ্গীন করা, গোটা মানবতাকে একই পথে পরিচালিত করা এবং মানুষকে একই সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা ইসলাম ও বিশ্বায়নের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম ও বিশ্বায়ন নিয়ে অধ্যয়নকারীরা একথাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামের বুনিয়াদ ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্যের ওপর। সে জুলুম-অত্যাচারকে অনুমতি দেয় না, বরং জালেমদের জুলুমকে নির্মূল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। সে অন্যের অধিকার স্বীকার করে এবং "জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাকে" হারাম সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে বিশ্বায়নের বুনিয়াদ জুলুমের ওপর। এতে ন্যায়-ইনসাফের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। এতে দরিদ্র জনগণ ও দরিদ্র দেশের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। বিশ্বায়নে শুধু পুঁজিবাদীদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। বিশ্বায়ন স্বার্থ উদ্ধারে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়। চাই এর কারণে মানবাধিকার যেমনই পদদলিতই হোক না কেন।[৪৭১]

ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বায়নের মাঝে এটাই মৌলিক পার্থক্য যে, প্রথমটা কল্যাণই কল্যাণ এবং গোটা মানবতার জন্য মঙ্গল। আর দ্বিতীয়টা অকল্যাণই অকল্যাণ এবং গোটা মানব সমাজের জন্য অমঙ্গল। ইসলাম যেখানেই পৌঁছেছে সেখাহে সে তার উন্নত শিক্ষা দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করেছে। আর এ কারণেই সে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরো দুনিয়ার ওপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য বিস্তার আর অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা। তার মৌলিক ভিত্তি সাম্প্রদায়িক তার ওপর আর তার কারণ বস্তুবাদ ও ধন-সম্পদের সীমাহীন লোভ।

১০. ২. ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বজনীন ধর্ম

ইসলাম নিয়ে গবেষণা করলে জানা যায়, ইসলামের সম্পর্ক শুধু তাদের সাথেই নয়, যারা হযরত রাসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান এনেছে, বরং যখন দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকেই তার শিক্ষার অস্তিত্ব রয়েছে। প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে সে পয়গামই নিয়ে এসেছেন যার নবায়ন ও

৪৭০. আল-কুরআন, সূরা আল হুজরাত, আয়াতঃ ১৩

৪৭১. ইয়াসির নাদীম, wekvqb mv¤vR¨ev‡`' I bZb ÷¨v‡UwR, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৬৩-২৬৫

সংস্কার করেছেন আমাদের রাসূল (সা.)। এজন্য যদি বলা হয়, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন তাহলে ভুল হবে না। কুরআন-হাদীসে তার সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের বিতর্কমূলক বিষয় মীমাংসা করতে পারেন।"[৪৭২]

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত নূহ (আ.) ও হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে দশ শতাব্দীর দূরত্ব ছিল। এ শতাব্দীগুলোতে সকল লোকই ধর্মের অনুসারী ছিল।

হযরত নূহ (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলের আম্বিয়াও সেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন যার দাওয়াত তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ.) এবং নূহ (আ.)-এর পূর্বে হযরত আদম (আ.) দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তার ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না।"[৪৭৩]

হুজুর (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তিনি ও সে দাওয়াতেরই নবায়ন করেছেন এবং সে ইসলামের দিকেই লোকদেরকে আহ্বান করেছেন, যার দিকে হুজুর (সা.)-এর পূর্বে সকল আম্বিয়া পূরা মানবতাকে আহ্বান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো নবী প্রেরণ করিনি যার কাছে আমি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করিনি যে আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।"[৪৭৪]

উক্ত আয়াতের আলোকে এই দাবি করা যায়, ইসলামের দাওয়াত কোনো নতুন নয়, বরং ভূ-পৃষ্ঠে আগমনকারী সকল নবী এই ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন, যার নবায়নের জন্য রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাব হয়েছে। আর এই ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ধর্ম, তাই একথা বলা অবশ্যই সঠিক হবে যে, ইসলাম সে দিন থেকেই বিশ্বজনীন, যখন থেকে তার জন্ম হয়েছে এবং সেই তখন থেকেই সার্বজনীন, যখন থেকে এ বিশ্বকে সজ্জিত করা হয়েছে।

---

৪৭২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২১৩

৪৭৩. আল-কুরআন, সূরা ইসরা, আয়াতঃ ২৩

৪৭৪. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৫

১০. ৩. বিশ্বায়ন একটি ইসলামবিরোধী মতবাদ

বিশ্বায়ন শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের নামই নয়, বরং এটি সরাসরি ইসলামের ওপর আগ্রাসনও বটে! কারণ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে তার বিশ্বজনীনতার গুণাবলির কারণে বিশ্বায়নের প্রতিরোধ করতে পারে। নতুবা আজকের বিশ্বজনীনতার গুণাবলির কারণে বিশ্বায়নের প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোনো ধর্ম, এমন কোনো আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হয় না, যে বিশ্বায়নের সামনে সীসাঢালা প্রাচীর হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। অতএব, বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারণী সংস্থাগুলোর পরিকল্পনার মধ্যে যেমনিভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তেমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইসলামকে প্রতিহত করে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষমতা ও দখলদারিত্বকে নিরঙ্কুশ করার উদগ্র বাসনা। এ কারণেই ইসলামের ওপর আগ্রাসন চালানো তাদের প্রথম টার্গেট।

বিশ্বায়ন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যে সব ষড়যন্ত্র করছে, এ পর্যায়ে সেগুলো সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেয়া হলো। যেমন,

(১) বিশ্বায়নের প্রচেষ্টা হলো-মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া যাতে মুসলিম উম্মাহ ধর্মের আশ্রয় নিতে না পারে যা মূলত মুসলিম উম্মাহর সবচে’ বড় আশ্রয়।

(২) পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে বেশি প্রসার করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো পশ্চিমা শক্তির অধীনে নিয়ে আসা, যাতে মুসলমানদের নিকট কোনো কেন্দ্র না থাকে।

(৩) প্রতিটি দেশে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্থানে বস্তুবাদী দর্শন চাপিয়ে দেয়া যাতে মুসলমানেরা ইসলামী আকাঈদ থেকে কোনো আলো না পায়।

(৪) ইসলামকে রাজনীতি ও নেতৃত্ব থেকে বিদায় করে দেয়া এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সেক্যুলার দর্শনের আলোকে বিভিন্ন সরকার গঠন করা।[৪৭৫]

আজ প্রতিটি দেশে এমন সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কায়েম আছে যারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে নামে ইসলামী শরীআতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত। সে সব সংগঠনের প্রতি চিন্তা ও বস্তুগত

৪৭৫. ইয়াসির নাদীম, wekvqb mv¤vR¨ev‡' I bZb ÷¨v‡UwR, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭

দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের সমর্থন রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধিতা করা। ইসলামী আইনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা। নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও মুসলিম রমণীদের সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করা। কিছু কিছু মুসলিম দেশে তো সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে এসব সংগঠন সরকারের কাছে এই আপীলও করছে যে, মানবাধিকারের ব্যাপারে জাতিসংঘের পাশকৃত প্রস্তাবাবলির আলোকে আইন-প্রণয়ন করা হোক এবং ইসলামী শরীআকে এ ধরনের আইন থেকে দূরে রাখা হোক! কিন্তু এর চেয়েও বড় বিপজ্জনক বিষয় হলো, বিশ্বায়নের নেতৃবৃন্দ ইসলামী নীতিমালার ওপর হামলা চালাচ্ছে। তাদের সকল প্রচেষ্টা যে কোনোভাবে ইসলামের স্বীকৃত আকাঈদের অস্তিত্ব নির্মূল করার ওপর ব্যয় হচ্ছে, এমন কি যাতে ভূ-পৃষ্ঠ ইসলামের অনুসারীদের থেকে মুক্ত হয়ে যায়।এজন্য এ স্পর্শকাতর বিষয়ে যে ব্যক্তিই নেতিবাচকভাবে কলম ধরে তাকেই পাশ্চাত্য পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বসে। সাম্প্রতিক বিশ্বে তিনজন নাস্তিক কলামিষ্টের আবির্ভাব হয়েছে আর তারা হলো সিরিয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ শাহরুর, মিসরের অধিবাসী মুহাম্মদ সাঈদ আল-আশমাবী ও আল-যাযায়েরের মুহাম্মদ আরকোন। এ তিনজন ইসলামী নীতিমালা ও আইন-কানুনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা ইসলামী আকাঈদ, হুদুদ, মীরাছ ও পারিবারিক আইনকে জাহেলী যুগের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করার হীন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো লোকদেরকে একথা বোঝানো যে, ইসলামী আইন এ যুগে অচল। এ তিনজনের লিখিত পুস্তক জনসম্মুখে আসার পর পাশ্চাত্য তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে দেয়, এমন কি সাবেক মার্কিন প্রশাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের মুখপাত্র টেরো তিনটি পুস্তকেরই খুব প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে মুক্ত বুদ্ধি ও উজ্জ্বল চিন্তাধারার অধিকারী আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নবাদীরা ভালভাবে জানে যে, ইসলামে যেহেতু তার উত্তম বিকল্প ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা ইসলামের মধ্যে রয়েছে, এজন্য তারা ইসলামকে শুধু এমন একটা ধর্ম বানিয়ে দিতে চায়, যা শুধু কিছু আরকান, আহকাম ও কর্তব্য পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া যিন্দেগীতে তার আর কোনো ভূমিকা থাকবে না।[৪৭৬]

১০. ৪. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে বিদ্যমান কয়েক হাজার ধর্ম শুধু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সে সব ধর্মের কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

৪৭৬. ইয়াসির নাদীম, wekvqb mv¤ªvR¨ev‡` I bZb ÷¨v‡UwR, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩-২৭৪

এজন্য এ ধর্মসমূহের অনুসারীদের জন্য নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে দিশা দেয়। স্থান-কালের ঊর্ধ্বে ইসলাম সকল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হেদায়েতের বার্তাবাহী। তার নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা রয়েছে। তার একটি বিশেষ সভ্যতা ও একক সংস্কৃতি রয়েছে। এজন্য এটা অসম্ভব যে, ইসলামের সঠিক অনুসারীরা ইসলামী শিক্ষা ছেড়ে বিশ্বায়নের পেশকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বিশ্বায়নের রাস্তায় সবচে' বড় বাধা ইসলাম। বিশ্বায়নের প্রবক্তারাও এটি বুঝেই সকল ক্ষেত্রে এমন নীতিই প্রণয়ন করেছে যা একান্তভাবে ইসলামের মূলনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য বিরোধী।

রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই, বরং শুধু কিছু কৌশল ও পরিকল্পনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে যাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলে। এজন্য এখানে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার প্রয়েজান মনে করছি, যে ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী ও একতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা জীবনকে শান্তি, নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে দূরত্বকে দূর করে।[৪৭৭]

যখন আমরা ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, তখন অনুমিত হয় এসব মুলনীতির সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্যে প্রবল দৃঢ়তার সাথে সাথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও আছে। আর এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতি প্রতিটি যুগে অনুসরণযোগ্য। অবশ্য এ নীতিমালার মধ্যে এমন কিছু নীতিমালাও রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় এবং স্থান ও কালের পরিবর্তন তার মধ্যে প্রভাব ফেলবে না। যেমন যাকাত ও ফাই-এর খাতসমূহ, গনীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ, সুদ, জুয়া, চুরির নিষিদ্ধতা ও অবৈধ পদ্ধতিতে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা ইত্যাদি। এসব মূলনীতির মধ্যে যে দৃঢ়তা রয়েছে তা সম্পদশালী, আমীর, বাদশা, বিশেষ করে শাসকদেরকে স্বেচ্ছাচারী জীবন কাটানো থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখে এবং তাদেরকে বস্তুবাদের লালসার শিকার হতে বাধা দেয়। অপর দিকে ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধানকে এ অনুমতি প্রদান করেছে যে, সে স্থান-কাল পাত্র হিসেবে অর্থনীতিকে পরিচালিত করবে এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ইসলামের পয়গাম ও বার্তা ব্যাপকতর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।[৪৭৮]

---

477. Sirajus Salekin, 'Globalization : Perspective Aisa', ibid, p.12

৪৭৮. ইয়াসির নাদীম, wekvqb mvgvR¨ev‡' I bZb ÷¨v‡UvR, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

১০. ৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য অর্থব্যবস্থার মধ্যেই নেই। ইসলামের সাথে অর্থনীতির শরঈ, নৈতিক ও আকীদাগত সম্পর্ক রয়েছে। একে তাই ইসলামী শরীআত ও নৈতিকতা থেকে পৃথক করে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী অর্থব্যবস্থা শরীআতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণেই যদি বৈধ বস্তুগত কাজে সঠিক নিয়তের সংমিশ্রণ থাকে তাহলে এ কাজ সওয়াব ও প্রতিদানের যোগ্য হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বিশ্বায়নের বুনিয়াদ, তার সমগ্র মনোযোগ ব্যক্তিমালিকানার দিকে। এ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে ব্যক্তিই একক মালিক, তার নিকট ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক স্বার্থ হতে উর্ধ্বে।

এ ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে স্টক বৃদ্ধি পায়। মানুষের নিকট যে বস্তুর প্রয়োজন সবচে' বেশি পুঁজিবাদীরা তা স্টক করে রাখে। অতঃপর পরবর্তীতে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করে। উপরন্তু এ ব্যবস্থার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ দু'টি বিষয় আজকাল ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। অপর দিকে কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার সকল মনোযোগ সামষ্টিক স্বার্থের ওপর ব্যয় হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল মাধ্যম ও উপকরণ, যেমন ক্ষেত, বাগান ও কারখানা ইত্যাদি এ সব কিছু রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। জনগণ শুধু বেতনের অধিকার রাখে যা সমাজের খেদমতের বিনিময়ে সে পাবে। এ ব্যবস্থার সবচে' ক্ষতিকর বিষয় হলো, এটা খোদায়ী প্রকৃতির বিরোধী ব্যবস্থা, যা মালিক হওয়ার অভিলাসের সময় মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়াও অলসতা ও হীনমন্যতাও এই ব্যবস্থার ধর্ম। এ কারণেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের হার প্রচুর কম দেখা গেছে বরং এমনও অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এক ওয়াক্তের পেট চালানোর জন্য লোকদের স্বর্ণ-রৌপ্য পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি ও সামষ্টিক উভয়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে।

এ ব্যবস্থা একদিকে যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি অধিকার প্রদান করে, তেমনি অভ্যন্তরীণভাবে তার কিছু নৈতিক সীমারেখাও এবং বহিরাগতভাবে কিছু আইনগত বিধি–নিষেধ পাওয়া যায়। এ কারণেই যদি কখনো ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তখন ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক শস্য ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে যে ব্যক্তি এসব শস্য স্টক করে রেখেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের

কারণেই ফ্রান্সের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর জ্যাক আইস্ট্রোবী "প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা", নামক স্বীয় গ্রন্থে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দ্বিতীয় আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই ইসলামী অর্থব্যবস্থাই ভবিষ্যতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে।[৪৭৯]

১০. ৬. ইসলামী ও অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য

১। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাধারণ নীতিমালা আল্লাহ পাকের তৈরি, যিনি মানব জাতির স্রষ্টা এবং তাঁর উন্নত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। আর অন্যান্য অর্থব্যবস্থার জনক মানব মস্তিস্ক, যা ভ্রান্ত এবং ভুল করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সৃষ্ট ব্যবস্থা আর মানবের সৃষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে তেমনিই পার্থক্য যেমন আসমান-যমীনের মাঝে পার্থক্য।

২। মানব রচিত অর্থব্যবস্থা শুধু বস্তুগত সমাধান পেশ করেছে, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন করা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তু শুধু একটি উপায় ও উপকরণ, উদ্দেশ্য নয়, বরং মানবের আসল উদ্দেশ্য প্রভুর পরিচয় লাভ করা।

৩। মানব রচিত অর্থব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা, উন্নত চরিত্র ও সমুন্নত মুল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং তার সকল মনোযোগ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি কেন্দ্রীভূত থাকে। চাই বৃদ্ধি যে কোনোভাবে হোক না কেন। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পূর্ণাঙ্গ সম্পৃক্ততা রয়েছে, বরং তা ইসলামের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা হতে প্রবাহিত পানি যা মানুষকে একে অপরের সাহায্য করা এবং পরস্পরে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা যার কয়েক বছর হলো দাফন হয়ে গেছে। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিরোধের জন্যই পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে বিকল্প হিসেবে পাশ্চাত্য বিশ্বাবাসীর সামনে পেশ করেছে, যা আজ বিশ্বায়নের ভিত্তি। এ ব্যবস্থার ক্ষতিকর বিষয়াবলীর আলোকে এ কথা বলা সঠিক হবে যে, মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই পুঁজিবাদকে নির্মূল করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইসলাম এভাবে জোরপূর্বক কারো উপর আদর্শ চাপিয়ে দেয়া বা কাউকে কোনো আদর্শ মানতে বাধ্য করার শিক্ষা প্রদান করে না।

১০. ৭ বিশ্বায়ন জাহেলী যুগের আদর্শ

[479] হাসান মতিউর রহমান, wekvq‡bi A_bxwZ I gmwjg wek, (ঢাকা: ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, মার্চ ২০০২,) পৃ.৭৭

জাহেলী যুগে যেমনিভাবে অসংখ্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয় পাওয়া যেত তেমনিভাবে সুদ খাওয়া, যৌনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির মত সমস্যাও বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মানুষকে ঘিরে রেখেছিল। সে যুগকে যদি মানবতার সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগ বলা হয় তাহলে ভুল হবে না। একটি ছহীহ রিওয়ায়েতে রয়েছে, হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা.) বলেন, আল্লাহ পাক দুনিয়াবাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন কিছু আহলে কিতাব ছাড়া পুরো আরব অনারব সবার ওপর ক্ষুব্ধ হলেন। হাদীসের ব্যাখ্যাকাররা সে সময়ের মানুষের অপকর্ম ও অন্যায়ের কারণেই আল্লাহর এ ক্রুদ্ধতা বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৮০]

আজ বিশ্বায়ন যে দৃষ্টিভঙ্গির দাওয়াত দিচ্ছে এবং যে চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়ন করতে চায়, তা সেই জাহেলী যুগেরই ক্ষতিকর বিষয় যা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের কারণে পরিণত হয়েছিল। জাহেলী যুগের মত সুদ, নগ্নতা, যৌনতাকে বৈধ আখ্যা দিয়ে বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সুসংহতির নামে রাজনৈতিক অস্থিরতাই বৃদ্ধি করছে। জাহেলী যুগে যেমনভাবে সম্পদশালীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হতো এবং দরিদ্রদের জীবনকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে দেয়া হতো, বিশ্বায়নের যুগেও মুষ্টিমেয় কিছু হাতে গোণা মালিকের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং যেমনিভাবে নারীর মর্যাদায় একটি সস্তা পণ্যের চেয়ে বেশি ছিল না, তেমনিভাবে বিশ্বায়নের যুগেও নারীর মর্যাদা একটি সস্তা পণ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। নারী স্বাধীনতার নামে নারীর ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যেমনিভাবে নবী আবির্ভাবের পূর্বে করা হতো। মানব ইতিহাসের সে অন্ধকারময় যুগে তারাই ক্ষমতার মালিক হতো যারা শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর। বর্তমানের এই তথাকথিত সভ্য যুগের বিশ্ব ক্ষমতা নেতৃত্ব সে সব ক্ষমতাশীলদের হাতে, যারা নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এজন্য যদি বলা হয় যে, বিশ্বায়ন সে যুগেরই নতুন সংস্করণ তাহলে ভুল হবে না।

১০.৮ বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর দৃষ্টিতে বিশ্বায়ন ও ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভিন্ন মুসলিম দেশের কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ আধুনিকতার আলোকে ইসলামের পুনঃব্যাখ্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়ের প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণের মধ্যে মিসরের মুস্তাফা কামাল, মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহ এবং রাশিদ রিদা, ইরানের জামালুদ্দীন আফগানী, আফগানিস্তানের

---

[480] মাসুম মুতাসিম বিল্লাহ, nv‘x‡mi Av‡j‡K be¨ RwnwjqvZ, (চট্টগ্রামঃ রাহবার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬,) পৃ.২৭

মাহমুদ তারাজী, তুরস্কের জিয়া গোকালপ এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মুহাম্মদ ইকবাল ও সৈয়দ আমির আলী অন্যতম। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এ সময় পৃথিবীর প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বিদ্যমান ছিল যে কারণে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্যের সীমালংঘনকারী সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

এ সময়ে ইসলামী চিন্তাধারার উপর পশ্চিমা উদারপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে আলবার্ট হোরানী খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, ... (ইসলামী চিন্তার) এ পুনর্জাগরণ ইউরোপীয় উদার চিন্তাধারার অনুপ্রেরণায় সংঘটিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ের ইউরোপীয় চিন্তাধারার মৌলিক নীতিগুলোর আলোকে ইসলামী ধ্যান-ধারণাগুলোর পর্যায়ক্রমিক পুনঃব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হয়। ইবনে খালদুনের 'উমরান' পর্যায়ক্রমে গিজট এর সভ্যতায় রূপান্তর হলো। একইভাবে মালেকী মাযহাব ও ইবনে তাইমিয়ার মাসলাহা জন স্টুয়ার্ট মিল এর ইউলিটি বা উপযোগতত্ত্বে মিলে গেল, ইসলামী আইনের ইজমা গণতন্ত্রে জনগণের মতামত এবং আহল আল-হাল ওয়া আল-আকদ হলো পার্লামেন্ট মেম্বার। এভাবে ইসলামী ঐতিহ্যিক বিষয়গুলোর আধুনিকায়ন বা নতুন নামকরণের ফলে এর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত অনেকগুণ বেড়ে গেলো।

এখানে আলোচনার জন্য আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চিন্তাবিদগণের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইকবালকে নির্বাচন করেছি। কারণ হলো তার চিন্তা-চেতনার মৌলিকতা এবং ইসলামী চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রশ্নে অন্যান্য চিন্তাবিদের উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল। তাঁকে সত্যিকারার্থে বলা যায় যে, তিনি সমসাময়িক ইসলামী পুনঃজাগরণের অগ্রদুত ছিলেন।

মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ছিলেন প্রথম আধুনিক মুসলিম দার্শনিক যিনি ইসলামের আন্তর্জাতিক মতাদর্শকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ বিশ্ববাসীর সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর প্যান-ইসলামিক ধারণাটা বৃহৎভাবে তৎপূর্বের আরেকজন মুসলিম দার্শনিক জামালুদ্দীন আল আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[৪৮১]

জামালুদ্দীন আল আফগানী ছিলেন "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একজন প্রথম সারির গুরু ও প্রবর্তক... পাশ্চাত্য বিরোধী ঐক্য শক্তি এবং সংস্কারক।" তার মতাদর্শ ছিল প্যান-ইসলামিক। তিনি প্রচার করতেন যে,

481 ড. জয়নাল আবেদিন, 'ইকলবালের রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বায়ন', (‰'wbK bqv w'MšÍ, ১৪ আগস্ট ২০০৭,) পৃ.৭

মুসলমানদের উচিৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ ও প্যান-ইসলামীবাদকে গ্রহণ করা।

ইকবাল উদারপন্থা ও মার্কসবাদের কিছু ভালো গুণাবলির প্রশংসা করতেন, তবে তিনি উভয় উদারপন্থাবাদের গতিশীলতাকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমালোচনা করেছেন এ বলে যে, এটা আসলে কিছু সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু শ্রেণির রাজনীতিতে আধিপত্যময় অংশগ্রহণ বৈ কিছু নয়, এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রেই চরম অবিচারের শামিল, আর এর জাতীয়তাবাদ অভ্যন্তরীণভাবে বর্ণবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে সমতা ও গণ-অংশগ্রহনের উপর এর গুরুত্বারোপ করা এবং পুঁজিবাদকে মারাত্মাক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এটি সার্থকভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তবে তিনি এ মতবাদের নাস্তিকতা, এর ব্যক্তি মূল্যের উপেক্ষা এবং বিশেষ শ্রেণির একনায়কতন্ত্রকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ মতামত ছিল যে, পুঁজিবাদ সমাজবাদ কোনোটাই দিশেহারা মানবতার মুক্তি আনতে সক্ষম নয়।

তাঁর মতে, প্যান-ইসলামবাদ হলো বিশ্ব মানবতাবাদ। ইসলামের বাণী হলো বিশ্বজনীন এবং এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রণীত হয়েছে। তাঁর মতে, ইসলামের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি দুটো মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর একটি হলো তাওহীদ বা খোদার একত্বতা এবং অপরটি হলো মানুষ হলো পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি এবং বিশেষ জিম্মাদার। ইসলাম মানুষকে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে দেয় এবং বিশ্বাসীদের দ্বারা একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে।[৪৮২]

তাঁর ভাষায়: ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো এটা সকল প্রকার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে এবং এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব মানবতাকে একটা চূড়ান্ত এককে পরিণত করার একটা রূপরেখা উপহার দেয়া। এটা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বর্ণ-গোত্র থেকে এর অনুসারী তৈরি করে এবং এটিকে সামগ্রিক একটা জনসমষ্টিতে রূপান্তর করে যে জনসমষ্টি তাদের স্ব-স্ব আত্মসচেতনতা বহন করে এবং কাউকে বিলীন করার কর্মসূচি ঘোষণা করে না।

এটা উল্লেখ্য যে, যদিও ইকবালের লক্ষ্য হলো ইসলামের বিশ্বজনীন চিন্তাধারাকে সাম্যবাদী ধারণার আদলে উপস্থাপন করা, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে নিয়ে একটা বিশ্বজনীন সমাজ গঠন করা, এর লক্ষ্য হলো জাতীয়তার বিভিন্নতা এবং স্বকীয়তা সত্ত্বেও মানবতাকে একত্রিত ও

---

[482] ড. জয়নাল আবেদিন, 'জামালুদ্দীন আফগানী ও তার প্যান ইসলামিক মতবাদ', (^'wbK bqv w'MšÍ, ২০ আগস্ট ২০০৭,) পৃ.৭

সংগঠিত করা। "মক্কা ও জেনেভা" নামের একটা কবিতায় তিনি 'লীগ ও নেশনস' এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন এ যুক্তিতে যে, এটার ভিত্তি হলো জাতিসমূহকে একতাবদ্ধ করা, বিশ্বমানবতা নয়। জাতীয় কোন্দল দ্বারা বিভাজিত পৃথিবীর প্রতি মক্কার বার্তা হলো যে, বিশ্ব মানবতাকে একতাবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে এমনতর সমস্যাকে চুরমার করে দেয়া। তিনি মন্তব্য করেন: জাতিসমূহের সংঘবদ্ধতা আজকাল একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু মানবতার একতাবদ্ধতা একনো লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। মানব সমাজের বিশৃঙ্খলাই হলো Frankish Statemenship-এর উদ্দেশ্য। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানবতার একাত্মতা, মক্কানগরী-জেনেভাকে যে বার্তাটি দিতে চায় সেটা হলো-জাতিসংঘ (League of nations) নাকি মানবতার সংঘ?

ইকবাল দেখতে পেয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা মুসলিম বিশ্বের উপর একটা অন্যায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস সুবিচার ভিত্তিক একটা বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।[৪৮৩] তিনি বলেন: পাশ্চাত্য যে শোষণময় অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে এর বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণ অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে.... তোমরা যে ধর্মবিশ্বাসের ধারক সেটা ব্যক্তিমূল্যকে স্বীকার করে, এবং আয়ের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ হয় না। বরং এটা নির্ধারিত হয় তার জীবন-যাপনের গুণগত মানের ভিত্তিতে যেখানে গরীবেরা ধনীদের উপর গুরুত্বারোপ করে না আবার ধনীরাও নিজেদেরকে সুপিরিয়র মনে করে না। যেখানে একজন অচ্ছুৎ একজন রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে; যেখানে ব্যক্তি মালিকানাকে আমানত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যেখানে এমনভাবে সম্পদ উপার্জনকে গ্রহণ করা হয় না যাতে সম্পদের মূল উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করা হয়। তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের এ অসাধারণ আদর্শটাকে অবশ্যই মধ্যযুগীয় ধর্মবেত্তা ও আইনবিদদের রূপকল্প থেকে মুক্ত হতে হবে।

তাঁর মতে, আজকের জাতীয়তাবাদ হলো উদারবাদের একটা প্রাপ্তি। এটা একটা বহিরাগত ধারণা এবং ধর্ম বিরোধী হওয়ার কারণে তিনি এটাকে বর্জন করেন। ইকবালের মতে, পশ্চিমা বিশ্বের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় খ্রিস্টধর্মের বিশেষ ধর্মতত্ত্বের কারণে যেটা শুধুমাত্র পরকালভিত্তিক, পার্থিব জীবনের প্রতি নেতিবাচক এবং আত্মা ও বস্তুর দ্বৈততা সম্পর্কিত। জাতীয়তাবাদ হলো কিছু স্থান দখল করে নেয়া। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য জাতীয়তাবাদ একটা মারাত্মক দুর্যোগ বলে ইকবাল মনে করেন। একটা

---

[483] ড. জয়নাল আবেদিন, 'ইকলবালের রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বায়ন', পূর্বোক্ত, পৃ.৭

সফলতার গর্ব অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অন্য একটা জাতির উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও এর শোষণে উদ্বুদ্ধ। এটা জাতীয় বৈরিতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ এবং মানব দৃষ্টিভঙ্গি ও পারস্পরিক সহানুভূতির সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। সর্বোপরি এটা বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংস করে। তিনি মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন এ বলে: উদারবাদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উপাদান রয়েছে, এবং আধুনিক ইসলামী চিন্তায় এটা যেভাবে অভূতপূর্ব শক্তি নিয়ে প্রভাব বিস্তার করছে তাতে মনে হয় অবধারিতভাবে বিশ্ব-মানব দৃষ্টিভঙ্গি যেটা মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে আহরণ করেছে সেটা পুরোপুরিভাবে মুছে যাবে।[৪৮৪]

ইকবাল মুসলমানদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, নৃ-তাত্ত্বিক, বর্ণ এবং ভৌগোলিক-সীমানাগত পার্থক্যের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ এবং ইসলামে এটাকে শুধুমাত্র আত্ম-পরিচয় দানের বাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলাম কোনো জাতীয়তাবাদও নয়, কিংবা সাম্রাজ্যবাদও নয় বরং এটা একটা কম্যুনিটি, এটা নিজেই একটি জাতিসংঘ, যেখানে কৃত্রিম জাতীয় সমস্যা এবং বর্ণগত বিভিন্নতা কেবলমাত্র ভিন্নতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়, মানুষের সামাজিক সীমানাকে সীমিত করার জন্য নয়। নিম্নোক্ত ভাষায় ইকবাল জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: জাতীয়তাবাদের নতুন উপাস্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান হলো জন্মভূমি-যে উপাস্যের পোষক হলো ধর্মের কফিন। জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতার মূল হলো এটা। বাণিজ্যের মাধ্যমে জাতিগুলোকে দাসত্বে পরিণত করা এটারই কারণে। রাজনীতি যদি সততাবর্জিত হয়, তবে সেটার কারণেই, যদি দুর্বলের ঘর ধ্বংস হয় তবে এটার কারণেই; এটাই সেটা যেটা খোদার সৃষ্টি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে, এটাই সেটা, যেটা ইসলামের জাতীয়তার মূলে আঘাত করে।

ইকবাল শুধুমাত্র একজন আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি জানতেন সে জাতীয়তাবাদ হলো একটা দ্বিমুখী অস্ত্র যেটাকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতেও ব্যবহার করা যায়। তিনি ইসলামী জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বব্যাপী একটা একক মুসলিম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেন: আমাদের জাতীয়তার মৌলিক নীতি ভাষা কিংবা দেশের অবিভাজ্যতা কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থের সামঞ্জস্যতা নয়। এর কারণ হলো, আমরা সবাই একটা বিশেষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করি.... যে আমরা ইসলামের রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজের সদস্য। ইসলাম সকল বস্তুগত সীমাবদ্ধতাকে ঘৃণা করে এবং এর জাতীয়তাকে একটা নির্ভেজাল

---

[484] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, BKeÿ‡ji ivR%bwZK ‘kb, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৯,) পৃ.২৭

Abstract idea বলে গণ্য করে যেটা প্রকৃতিগতভাবে বাস্তব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিস্তারমান শ্রেণিতে রূপ নিতে পারে। কোনো একটা নির্দিষ্ট জাতির মেধা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর এর জীবনী শক্তির নীতিমালা নির্ভর করে না। মৌলিকভাবে, এটা হলো সর্বকালীন এবং সর্বব্যাপী।

১০.৯. ইসলামের বিশ্বজনীন ধারণার আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

ইসলামের বিশ্বজনীন ধারণার আধুনিকায়ন নিয়ে যে সকল মুসলমান সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু রয়েছেন পাশ্চাত্য ধাঁচের উদার জাতীয়তাবাদী। এদের মধ্যে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, ইরানের রেজা শাহ পাহলভী, আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লাহ, পাকিস্তানের আইয়ুব খান, সুদানের জাফর আল-নুমাইরী, মিসরের আনোয়ার আল-সাদাত, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো এবং জর্দানের রাজা হুসেইনের কথা উল্লেখ করা যায়। কাছাকাছি সময়ে আরেক দল মুসলমান রাজনীতিবিদ–শাসকগোষ্ঠী ছিলেন যাদেরকে জাতীয় সমাজবাদী ধাঁচের রাজনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এদের মধ্যে মিসরের জামাল আব্দুন নাসের, সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, ইরাকের সাদ্দাম হোসাইন, পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং আফগানিস্তানের সরদার দাউদ খাঁনের কথা উল্লেখ করা যায়। এ সকল নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, দর্শন ও জীবনবোধ–মূল্যবোধ পর্যালোচনা করলে তাদের কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়। যেমন,

১. তাঁরা সবাই জাতীয়তাবাদী। তাঁদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিকতাবাদ যেমন আন্তঃআরববাদ, ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ বা তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা প্রাথমিক তাঁদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাস্তবতা বা তাঁদের দেশের বিদেশী নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।[৪৮৫]

২. তাঁদের মতাদর্শগুলো ছিল বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণ। তারাঁ উদার কিংবা সমাজবাদী জাতীয়তাবাদকে নৃ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল আধুনিকায়ন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে আধুনিকায়ন হলো মূল্যবোধ বিমুক্ত প্রক্রিয়া এবং তাঁরা মতাদর্শকে বাদ দিয়েই প্রযুক্তি ধার বা গ্রহণ করতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ছিল পশ্চিমা বিশ্ব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

[485] ইকবাল কবীর মোহন, gm‍¨jg we‡k AvMvmb, (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন, ২০০২,) পৃ.২৯

৩. প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের মতাদর্শ গঠনে ইসলামকে একটা অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। ইসলামের উপর গুরুত্বারোপটা দেশ কিংবা ঐতিহাসিক সময়কাল ভেদে বিভিন্ন ছিল। তাদের কেউ কেউ ধর্ম হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বৈরিতাও প্রদর্শন করেছেন আবার ক্ষমতাকে সংহত করা বা নিজের অবস্থানকে গ্রহণীয় করার লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার করেছেন এবং ইসলামকে তাদের ভাষানুযায়ী ব্যাখ্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[৪৮৬]

এদের মধ্যে মিসরের রাষ্ট্রপতি জামাল আবদুন নাসের (১৯৫৪–১৯৭০) এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইউব খান (১৯৫৮-১৯৬৯) নানা কারণে সময়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন।

মুহাম্মদ আইউব খান ছিলেন পাশ্চাত্য উদার ধাঁচে জাতি গঠনে একজন আদর্শ নেতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষিত সমাজের ভাষায় যেটা বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিশ্ব ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের ভাষা, ইসলামের আদর্শকে সে ভাষায় প্রকাশ ও পালন করাই যথেষ্ট। তাঁর মতে, পাকিস্তানের কর্তৃত্ব সেক্যুলার উদার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে, তাই ইসলামীদের জন্য দাবি করার কিছুই ছিল না। তাঁর মতে, পাকিস্তানীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের তীব্র অনুভূতি ছিল না। পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য হলো একটা শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ জাতি যেটা বিশ্ব ইতিহাসে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।[৪৮৭]

তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে সীমিত ছিল আন্তঃএশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে পাকিস্তানের একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা থাকবে। তিনি লিখেছেন: আমি সমস্যাবলীকে পর্যবেক্ষণ করেছি একজন পাকিস্তানী, একজন মুসলিম ও একজন এশীয় হিসাবে। বিশ্ব সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমি সমস্যাগুলোকে একজন এশীয় হিসেবে দেখেছি। এশীয় কম্যুনিটির ভিতর থেকেই আমাদের জন্য একটা স্থায়ী সম্মানজনক ও শক্তিশালী স্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই আমাদের জাতীয় স্বার্থ দাবি করে। এবং এ লক্ষ্যেই আমরা বিশেষ এ অংশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

---

486. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore:S.M Ashraf, 1944), p.67

487. Zafar Ishaq Masri, “Iqbal and Natonalism,” *Iqbal Review,* (April, 1961), pp.54-89

পাশ্চাত্য ধাঁচে আধুনিকায়নে তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এটা জাতি রাষ্ট্রকে বৃহত্তর সুসংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করবে। তাঁর মতে, আধুনিক ভৌত অবকাঠামো গঠন যেমন রাস্তার উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিশেষে একটা দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম দেবে যেটা পাশ্চাত্য ধাঁচের জাতি রাষ্ট্র গঠন করবে।[৪৮৮]

মিসরের জামাল আব্দুন নাসের আধুনিক ধাঁচে মিসরে একটা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ফিরাউনদের যুগ থেকে শুরু করে ইসলামের বিজয় পর্যন্ত মিসরের ইতিহাসকে পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওসমানীয়, বৃটিশ এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তি যাদেরকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী বলে মনে করতেন তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে তিনি প্রশংসা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মিসরে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উভয় ধরনের বিপ্লবের দরকার রয়েছে। তিনি বলেন: দুনিয়ার সবাই দুটো বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়-একটা হলো রাজনৈতিক বিপ্লব যেটা তাদেরকে তাদের উপর জেঁকে বসা একজন রাজনৈতিক শাসকের হাত থেকে তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ফিরিয়ে দেবে; অথবা বিজাতীয় সামরিক শক্তি যেটা তাদের জন্মভূমিতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করবে; এবং দ্বিতীয়টা হলো একটা সামাজিক বিপ্লব যা হলো একটা শ্রেণি সংগ্রাম যেটা পরিশেষে দেশের সকল জনগণের জন্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে .... আমরা উভয় বিপ্লবের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছি।

তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির তিনটা বৃত্ত-বিশিষ্ট ছিল। এগুলো হলো আরব বৃত্ত, আফ্রিকান বৃত্ত এবং মুসলিম বিশ্ব বৃত্ত।

আফ্রিকা নামে একটা মহাদেশ আছে ভাগ্য আমাদেরকে যেটাতে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং যেটা আজ এর একটা ভবিষ্যত দিনের জন্য তীব্র সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করার জন্য বাধ্য হয়েছে। আমরা চাই বা না চাই-এ সংগ্রাম আমাদের উপর প্রভাব ফেলে।। আমরা কি এটা অগ্রাহ্য করতে পারি যে, একটা মুসলিম বিশ্ব

488. Shamloo, ed., *Speeches and Statements of Iqbal*, (Lahore: Al_Manar Academy, 1949), p. 54

আছে যেটার সাথে আমরা কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের বন্ধনেই নই বরং ঐতিহাসিক সভ্যতার দ্বারা আবদ্ধ?[৪৮৯]

তাঁর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উভয় নীতিই মূলতঃ জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট থেকে গৃহীত যেটাতে ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনো সামান্যতম গন্ধও ছিল না, বরং এটাকে তুলনামূলকভাবে একটা কম গুরুত্বসম্পন্ন বৃত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১০.১০. উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

এর আগে আমরা যে সকল নেতৃবৃন্দের কথা উল্লেখ করেছি, তারা ইসলামী আদর্শের আলোকে কোনো বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেননি। তারা বরং নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের তিনটি বিশেষ ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা যায়, যাঁরা একান্তভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, ন্যূনতম পক্ষে এর একটি যথাবিধি রূপরেখা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে ইরানের ইমাম খোমেনী, মিসরের সাইয়েদ কুতুব শহীদ এবং পাকিস্তানের সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বলা বাহুল্য যে, এ তিনজন যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের নিকট গ্রহণীয় ছিলেন তেমনি বিতর্কিত এবং অগ্রহণীয়ও ছিলেন সমানভাবে। কিন্তু যারা তাদেরকে বর্জন করেছেন বা তাদেরকে বিতর্কিত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তারা এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা দাড় না করানোর কারণে এটি কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা কিংবা বিশ্বায়নবাদী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বনের জন্য বিরোধিতার স্মারক হয়ে রয়েছে।[৪৯০]

ইমাম খোমেনী স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি স্বদেশপ্রেমকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদকে বর্জন করেছেন দুটো কারণে। এর একটি কারণ হলো এটা ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত এবং দ্বিতীয় কারণ হলো এটা একটা বিজাতীয় ধারণা যেটা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার জন্য বিদেশীরা প্রচার করেছে।

---

489. Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939,* (London: Oxford University Press, 1970), P. 344

490 ইকবাল কবীর মোহন, gm¨jg we‡k¦ AvMvmb, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪

তিনি বলেছেন: একজনের পিতৃভূমি এবং জনগণকে ভালোবাসা এবং এর সীমানার নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা উভয়ই অনাপত্তিকর, কিন্তু জাতীয়তাবাদ যেটা অন্য মুসলিম জাতির প্রতি বৈরিতার সঙ্গে জড়িত সেটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন বিষয়। এটা মহাগ্রন্থ কুরআনের এবং মহান রাসূলের আদর্শের পরিপন্থী। জাতীয়তাবাদ যেটা মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম বিশ্বাসীদের মর্যাদায় ফাটল ধরায় সেটা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। জাতীয়তাবাদ হলো বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত একটা কৌশল যারা ইসলামের প্রসারকে সহ্য করতে পারে না।

তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলেছে, তাই তিনি মুসলিমদের প্রতি আবেদন করেছেন বর্তমানের জাতিরাষ্ট্রকে উৎখাত করতে। খোমেনী পাশ্চাত্যের লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তারা ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন অংশকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং আলাদা আলাদা কৃত্রিম জাতির জন্ম দিয়েছে। এ কারণে খোমেনীর মতে, মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা ও অবিভাজ্যতা অর্জন করতে আমাদেরকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিপীড়ক সরকারগুলোকে উৎখাত করতে হবে এবং তদস্থলে ইনসাফভিত্তিক ইসলামী সরকার প্রবর্তন করতে হবে যেটা জনগণের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদেরকে দায়ী করেছেন একটা অন্যায্য ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি বলেন: সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের উপর একটা অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের জনগণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেঃ নিপীড়ক ও নির্যাতিত। কোটি কোটি মুসলমান ক্ষুধার্ত এবং সকল প্রকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত, অথচ গুটিকতক ধনী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণি বিলাসীও দুর্নীতির জীবন-যাপন করে। ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত জনগণ নিপীড়নকারীদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে এসেছে এবং তারা আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।[৪৯১]

ইসলাম হলো 'সত্য এবং সুবিচার'-এর ধর্ম। এটা তাদের ধর্ম যারা স্বাধীন ও মুক্ত হতে চায়। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এটা তাদের পাঠশালা।

ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং মানব জীবনের এমন কোনো ক্ষুদ্র বিষয় নেই যে ব্যাপারে ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়নি এবং মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেনি। ইসলামী সরকার বলতে বুঝানো যেতে পারে "মানুষের উপর ঐশী আইনের শাসন"। বেলায়েত-ই-ফকীহ (আইনজ্ঞদের শাসন) মূলনীতির

---

[491] আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRwZK m¤úK, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

অস্পষ্টতা স্বীকার করে নিয়ে তিনি মনে করেন যে, ইসলামের প্রদত্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও রাসূল (সা.) এর বাস্তব জীবনের উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্মবিশেষজ্ঞদের শাসন হলো স্বপ্রমাণিতভাবে যৌক্তিক।

তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেনে: ফকীহগণ হলেন প্রকৃত শাসক এবং শাসনকার্য অবশ্য তাঁদের জন্যই মানায়। যারা আইন বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার কারণে ফকীহদের নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য শাসন তাদের জন্য নয়।

শাহ'এর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে খোমেনীর সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইরানে বিরাজিত সামাজিক অবিচার। তিনি তীব্রভাবে অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এবং 'স্ফীতশীল শাসককূল' ও 'সাধারণ জনগণের' মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অসমতাকে সমালোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য কর্তৃক ইরানের শোষণকেও তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন: বিশাল অংকের অর্থ খেয়ে ফেলা হচ্ছে; আমাদের সরকারি অর্থের অপব্যবহার করা হচ্ছে; আমাদের তেল সম্পদকে নিঃশেষিত করা হচ্ছে এবং বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের দেশকে দুর্মূল্য অথচ অপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা হচ্ছে যেটা বিদেশী পুঁজিবাদী ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের জন্য আমাদের জনগণের পয়সাকে পকেটস্থ করতে সাহায্য করছে।

ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য হলো "ন্যায়-বিচার, একটা ন্যায্য ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকরণ'। এমন একটা সুবিচারভিত্তিক সমাজ যেটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিচর্যা করবে।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) একজন পাকিস্তানী চিন্তাবিদ যার লেখা বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাবশালী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম হলো আন্তর্জাতিক এবং এর বাণী হলো বিশ্বজনীন। এটা সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিকতাভিত্তিক একটা সুবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা উপস্থাপন করে এবং সকলকে এর প্রতি আহবান করে। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এমন একটা বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে বর্ণ ও জাতীয়তাবাদের গোড়ামী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সমন্বিত একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেটা সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভূক্ত করবে। এবং যেখানে মানুষের মধ্যে তৈরি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্ম দেবে, যাতে তারা তাদের একে অপরের বস্তুগত ও নৈতিক উন্নতির জন্য একে অপরকে সাহায্য করবে।

তার মতে, জাতীয়তাবাদ ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কারণ এটা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ বলতে এটাই বুঝায় যে, একজন জাতীয়তাবাদী অন্য সব জাতীয়তাবাদের উপর নিজের জাতীয়তাকে অগ্রাধিকার দিবে। একজন ব্যক্তি আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী না হলেও জাতীয়তাবাদ তার কাছে দাবি করে যে, নিজের জাতির সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে একজন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে নিজের জাতি ও অন্যের জাতির মধ্যে পার্থক্য রচনা করবে। ঐতিহাসিক ধারা ও প্রথাগত কুসংস্কার শক্তভাবে সংরক্ষণ করবে এবং জাতীয় গর্বের স্পর্শকাতর অনুভূতির জন্ম দিবে।

তিনি মত প্রকাশ করেন, জাতীয়তাবাদ কখনো অন্য কোনো জাতির লোককে নিজের সাথে কোনোভাবে সমান ভাবে না। যখনই একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন আসবে তখন সকল ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে তার হৃদয় রুদ্ধ থাকবে। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে জাতি-রাষ্ট্র, বিশ্ব-রাষ্ট্র নয়। তথাপি সে যদি কোনো বিশ্ব মতবাদের ধারক হয় তবে সেই মতাদর্শ অত্যাবশকীয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্ব আধিপত্যে রূপ নিবে, কারণ তার রাজ্যে অন্যান্য জাতিগুলো কখনোই সমান মর্যাদা পেতে পারে না, প্রজা বা দাস হয়ে থাকতে পারে।

মওদূদী বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটা সমাজ থেকে ধর্মের বিচ্ছেদে বিশ্বাস করে না। ইসলামী রাষ্ট্র চারটি মৌলিক ধারণা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। তার মতে এগুলো হলো,

(১) আল্লাহ হলো সার্বভৌম-যেটা রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি;

(২) মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি তাই সে আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভূত হতে পারে না;

(৩) শাসনের অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমার ভিতরে থেকে সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের;

(৪) ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল কার্যক্রম সমগ্র মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।[৪৯২]

ইসলামে কম্যুনিটির একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী শরীআহ সামাজিক জীবনের সার্বিক বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে যেমন-"পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়, প্রশাসন, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ বিষয়ক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এক কথায়, এটা মানব জীবনের

---

[492] Rzen al-Mahdi, *Philosophy of Moududi : Modernization of Islam, (*London: IRA, 1996,) p.67

সবদিক অন্তর্ভুক্ত করে। শরীআহ হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং একটা সর্বভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যাতে কোনো কিছুই অসার নয় বরং যাতে কোনো কিছুরই অভাব নেই।"[৪৯৩]

১০.১১. মূল্যায়ন

ইকবাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন কম্যুনিটির বিচ্ছিন্নতা একটা বাস্তবতা হিসেবে। তিনি জাতীয়তাবাদকে একটা বিজাতীয় মতবাদ এবং বিখণ্ডীকরণ শক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন যেটা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরাজ করছে। তাঁর মতে, পুঁজিবাদ মুসলিম বিশ্বের উপর একটা অন্যায্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার অপনোদনে তিনি দু'স্তরে সমাধান পেশ কেরছেন।

প্রথমতঃ ইসলামী চিন্তাধারাকে আধুনিকতার আলোকে পুনর্গঠন করে তিনি এর সাম্যবাদী মতবাদকে তুলে ধরেছেন। ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের আলোকে একটা ন্যায্য বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর উক্ত মনোভাবের ফলশ্রুতি;

দ্বিতীয়ত, বাস্তবক্ষেত্রে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো একটা দ্বিমুখী অস্ত্র, তাই অন্ততঃ রাজনৈতিক পর্যায়ে স্বাধীনতা অর্জনে এটা ব্যবহার করা যায়। তিনি মুসলমানদেরকে এটা সাময়িক ভাবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে চূড়ান্ত ঐক্য অর্জন ও একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি তারা পশ্চিমা জাতি রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন হয়তো উদারপন্থী নতুবা সমাজবাদের শ্রেণিভুক্ত। তাঁদের মতবাদ ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

মুহাম্মাদ আইয়ুব খান ও জামাল আব্দুন নাসেরের মতামত বিষয়ক আমাদের পর্যালোচনা এটা স্পষ্ট করে যে, তাঁরা উভয়ই মূলতঃ শক্তিশালী, মজবুত ও আধুনিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেতন ছিলেন। তাঁদের একজন সেটা পাশ্চাত্য উদার ধারায় এবং অন্যজন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিও মূলতঃ ভৌগোলিক সীমার দ্বারা আবদ্ধ ছিল, আর সরকারি নীতিকে

---

493. Nikki R. Keddie, *An Islamic Response to Imperialism: Political and Religous Writings of Sayyed Jamal ad din ad-Afghani* (Berkeley: University of California Press, 1983), p.76

জাতীয় স্বার্থের ধুয়া দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতেন যার ফলাফল ছিল যে জাতীয় স্বার্থ হলো সবকিছুর উর্ধ্বে। ইসলামী আর্ন্তজাতিকতাবাদকে তাঁরা খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪৯৪]

উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদগণ ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁরা মনে করতেন, জাতীয়তাবাদ হলো ইসলামী চিন্তাধারায় একটা বিজাতীয় ধারণা এবং একটা সাংস্কৃতিক কাঠামো যেটাকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তাই তাঁরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে আহ্বান করেছেন। তাঁরা সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যেটাকে তাঁরা অন্যায্য, নিপীড়ক এবং পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মুসলিম উম্মাহর একীভূতকরণ সম্ভাব্যতাকে তাঁরা অবধারিত বিষয় বলে মনে করতেন। নিজস্ব ঐতিহ্যকে নিজস্ব অর্থে অনুধাবন করতেও তাঁরা ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, সামাজিক সুবিচার হলো ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য এবং যুক্তি পেশ করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী সুবিচারের ভাবধারাকে লংঘন করেছে।

দৃশ্যতঃ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উদারবাদ ও মার্কসবাদ উভয়ই তাদের বিশ্লেষণে মৌলিকভাবে একই রকম। উভয় চিন্তাধারাই তাদের মতবাদকে পশ্চিমা ইউরোপের ঐতিহাসিক ধারার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকবাদের মোড়ক থাকা সত্ত্বেও উভয় মতবাদই ইউরোপীয় নৃ-কেন্দ্রিক। উভয় ধারার আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো আধুনিকায়ন বা পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরের ফলাফল। উভয়ই একটা পর্যায় জাতীয়তাবাদের একীভূতকরণের উপর জোর দেয়। উভয়ই বিশ্বাস করে যে, ইতিহাস আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটা এটাকে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে আর অন্যটা দেখে শ্রমজীবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে। উভয়ই দাবি করে তারা প্রত্যেকে উত্তর-আলোকায়ন বুদ্ধিবৃত্তিবাদের (Enlightenment) উত্তরসূরী। উভয়ে বিশ্বাস করে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বকে। উভয়ই মনে করে সংস্কৃতি হলো গতানুগতিক ও প্রাচীন।[৪৯৫]

মজার বিষয় হলো উভয় মতবাদই ইসলামকে একইভাবে মূল্যায়ন করে। উদারবাদ ইসলামকে মূল্যায়ন করে নিছক বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতিক উপাদানগুলোর একটা হিসাবে। তাদের মতে, মিসরীয় ইসলাম, পাকিস্তানী ইসলাম, ইরানী ইসলাম ও ইন্দোনেশীয় ইসলামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদীরাও ঠিক একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে উজবেক ইসলাম, তাজিক ইসলাম এবং

494 আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRWZK m¤úK, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

495 Rzen al-Mahdi, *Philosophy of Moududi : Modernization of Islam*, ibid, p.107

Dhaka University Institutional Repository

আন্তঃদেশীয় ইসলামের মধ্যে পার্থক্য টেনেছিলেন। ইরান ও আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আগ পর্যন্ত উভয় মতবাদই ইসলামী ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করত। তাদের ধারণা ছিল যে, আধুনিকতার অগ্রযাত্রায় ধর্ম পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বিশ্ব তাদের পূর্বসূরীদের ধারণা মত চলেনি। যে বিশ্ব এখন খণ্ড-বিখণ্ডতার মুখোমুখী। নৃ-জাতীয়তাবাদ এবং পুরাতন রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ উভয়ের উত্থান, ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এবং উদারপন্থা ও মার্কসবাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে পিছিয়ে আসা-এগুলো সবই হলো নব্য বাস্তবতা বা বৈপরীত্যতা যার বিশাল গুরুত্বকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। ক্রমেই বিশ্বকে মনে হয়েছে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন।

ইসলামী চিন্তাধারার চিন্তাবিদগণ ব্যাপারগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন পুঁজিবাদের বিস্তারের পাশাপাশি উদারবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। তাঁদের মতে, সমাজবাদ কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প পেশ করতে পারেনি। এটাকে প্রকৃতপক্ষে দেখা হয়েছে গর্তে নিপতিত উদারপন্থাবাদের সাথে প্রতিযোগী আরেকটা পাশ্চাত্য মতাদর্শ হিসেবে। ইসলামের সঙ্গে এতদ্বয়ের ছিল মৌলিক পার্থক্য ও সংঘর্ষ। ইসলামী চিন্তাবিদগণ পুঁজিবাদের প্রসারকে ধরে নিয়েছেন বিশ্বব্যাপী একটা অন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। তাঁরা এর বিখণ্ডীকরণ প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজ অভ্যন্তরীণভাবে নিপীড়ক ও নিপীড়িত এ দু'শ্রেণিতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। খোদ জাতীয়তাবাদকেই ধরা হয়েছিল বিজাতীয় ও ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল হিসাবে। মূলধারার ইসলামী চিন্তাবিদগণ যুক্তি পেশ করেছেন যে, তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বজনীন উম্মাহ। তবে মুসলমানদের উচিত সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা যাতে তারা একের পর এক মুসলিম জনগণকে স্বাধীন করতে পারে। ইকবাল যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ যেটা বিশ্ব-মুসলিমের সামষ্টিক মুক্তি আনয়নে সক্ষম সেটা ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটা অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ।

মুসলিম বিশ্বের আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ যারা অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তাঁরা পশ্চিমা মডেলকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিল। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকায়নের যুগ যার জন্য পাশ্চাত্যে দীক্ষিত শ্রেণি উঠে-পড়ে লেগেছিল। ঐতিহ্যগত সবকিছুই বর্জন করতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকায়নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। কিন্তু উদারবাদ ও সমাজবাদভিত্তিক

তিরিশ বছরের রাজনৈতিক প্রয়াস পরিশেষে কার্যকর কিছু উপহার দিতে ব্যর্থ হয়। অভ্যন্তরীণভাবে প্রায় প্রত্যেকটা মুসলিম দেশই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতার সংকটে ভুগেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা সমস্যা আধুনিকায়নের চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আধুনিকায়নের এ পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টা- পাশ্চাত্যের অনুকরণ, ধার করে আনা মডেলের ব্যর্থতা, ফলশ্রুতিগত পশ্চিমা-বিরোধী পশ্চাদাঘাত- অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য রকমের সামাঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছিল।[৪৯৬]

এক্ষেত্রে মৌলিক যে বৈপরীত্য ছিল সেটা ছিল মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা-ইউরোপীয় অর্থে "জাতি-রাষ্ট্র" ছিল না; বরং সেগুলো ছিল বাস্তবিকপক্ষে 'রাষ্ট্র' যারা পশ্চিমা ধারণামত 'জাতি' হওয়ার চেষ্টা করেছিল। জাতীয়তাবাদ ছিল একটা ক্ষুদ্র শহুরে অভিজাত শ্রেণির আদর্শ অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর আদর্শ ছিল ইসলামের আন্তর্জাতিক সাম্য ও ঐক্যবাদ।

মুসলিম জাতির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক হামিদ এনায়েতের মতে: জাতীয়তাবাদ কখনো মুসলিম আত্ম-চেতনায় বিরাজ করত না সেটা নগরেই হোক আর গ্রামেই হোক। তবে এটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা ইহুদীবাদ বিরোধী দ্ব্যর্থ শ্লোগান হিসেবে বিরাজ করত। পশ্চিমা বিশ্বের মত জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে দ্ব্যর্থহীন প্রবক্তা ও মহাপুরুষেরা বুর্জুয়া ও অভিজাত শ্রেণি থেকে উদগত। সেজন্য তাদের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল জন-প্রশাসন, শিক্ষক, মধ্য-পর্যায়ের সামরিক অফিসার এবং তুলনামূলকভাবে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ...উচ্চ এবং মাধ্যমিক সমাজ পশ্চিমা ধারণা ও এর অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সাধারণ জনগণ প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের প্রতি অনুগত ছিল।

মুসলিম বিশ্বের উত্তর-আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ যাঁরা প্রায় সবাই স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে এমন ভাষায় পুনঃগঠন করেছিলেন যেটা আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবধারায় পশ্চাৎপদদের নিকট বোধগম্য ছিল। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেটা তার নিজস্ব সংজ্ঞায় বুঝতে হবে। ইসলামের নামের আগে বা পরে কোনো উদার বা সমাজবাদী বিশ্লেষণের যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এটা একটা পরিপূর্ণ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি যেটা

---

496. Sharif al Mujahid, "Muslim Nationalism: Iqbal's Synathesis of Pan-Islamism and Nationalism", *Ameridcan Journal of Islamic Social Sciences*, vol.2,no.1, (July 1985), p.12

সম্পূর্ণরূপে এর অতিমানবীয় অলৌকিক ধারণা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের যুক্তিমতে, ইসলামী ব্যবস্থায় মূল্যবোধের যে স্তরবিন্যাস তার ভিতরে সামাজিক সুবিচারের ধারণাটা হলো কেন্দ্রীয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী আদর্শের এ কেন্দ্রীয় মূল্যবোধকে লংঘন করে।

এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁরা নৃ-জাতিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু জাতীয়তাবাদকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করেছেন এবং এটাকে পাশ্চাত্য দ্বারা আরোপিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক রূপ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমস্ত বিজাতীয় আদর্শ বর্জন না করলে এবং মূল দেশজ ঐতিহ্যের পুনঃরুজ্জীবন না ঘটলে সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

উদার ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার সাম্প্রতিককালের চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো প্রভাবশালী ও রাজনীতির প্রাকৃতিক কাঠামো। তবে ইসলামী চিন্তাধারার মতে, এটা হলো একটা বিজাতীয় মতাদর্শ যেটা উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে, বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির রক্ষাকবচ মাত্র। তাঁদের মতে, সাংস্কৃতিক মুক্তি তখনই সম্ভব যখন মুসলিম উম্মাহ এটা থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। [৪৯৭]

এ বিষয়ে আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণ আমাদেরকে জাতি-রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কাঠামোর একটা সর্বজন গৃহীত একক রূপরেখা প্রণয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এতে আমাদের মত হলো, যে মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা ইউরোপীয় ধাঁচে জাতি রাষ্ট্র নয়, বরং সেগুলো হলো রাষ্ট্র, যেগুলো মূলত পশ্চিমা আদর্শে জাতি হওয়ার প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু সেগুলো ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদ যা আন্তর্জাতিক পরিচিতির মাধ্যমে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যতা ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি আনুগত্যতা এ দু'য়ের মধ্যকার প্রতিযোগিতার সর্বশেষ ফলাফল কি দাঁড়াবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলা অবশ্য এ পর্যায়ে অপরিপক্কতার পরিচয় হবে। তবে এটা স্পষ্ট যে, জাতীয়তাবাদ ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।[৪৯৮]

আমাদের বিশ্লেষণ এটাও নির্দেশ করে যে, ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্থান একই সঙ্গে পশ্চিমা উদারবাদ ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং এর নিজস্ব পরিচিতির প্রমাণস্বরূপ। এটা এমন একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেটাকে এর নিজস্ব সংজ্ঞায় বুঝতে হবে। মূল্যবোধের স্তরবিন্যাসে সামাজিক সুবিচার

---

497 আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AVš Í RWZK m¤úK, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

498 Rzen al-Mahdi, *Philosophy of Moududi : Modernization of Islam*, ibid, p.165

কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে যেটার দিকে ইসলামী ব্যবস্থা ধাবিত হয়। যারা সত্যিকারভাবে আন্তর্জাতিক বাস্তবতার জটিলতা সম্পর্কে বুঝতে চায় তাদের জন্য ইসলামকে এর নিজস্ব সংজ্ঞায় অনুধাবন করা জরুরী।

আমাদের পর্যালোচনা এটাও নির্দেশ করে যে, 'আন্তর্জাতিক' শব্দের নামে করা অধিকাংশ আলোচনাই সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত। প্রতিটা চিন্তাধারা বিশ্বকে তার নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে অনুধাবন করে। প্রতিটা চিন্তাধারা বিশ্বকে এর নিজস্ব কল্পনায় একীভূত করতে চায়। কিন্তু যখন এটাকে অন্য চিন্তাধারার আলোকে দেখা হয় তখন তাকে সাম্রাজ্যবাদী মনে করা হয়। নিজস্ব মূল্যবোধের গণ্ডিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ঐ সকল ঐতিহ্যগুলোর মধ্যকার সাযুজ্যতার মাত্রা কিংবা এদের মূল্যবোধের আন্তঃসারশূণ্যতা বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয়, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, যে কোনো ধরনের বিশ্ব-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে সে ব্যবস্থা কতটুকু পারস্পরিক সাযুজ্যতা ও অংশীদারিত্বের সঙ্গে মিল রাখে কিংবা অমিল রাখে।

১০.১২. মুসলিম বিশ্বে আধুনিকীকরণ বনাম পাশ্চাত্যকরণ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে আধুনিকীকরণের বিষয়টি পাশ্চাত্যকরণের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণের জন্য এ দু'টি পারস্পরিক নির্ভরশীল পদ্ধতির পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্যের সমার্থক বলার কারণ হলো, বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোও পাশ্চাত্য হতে আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা অর্জন করছে। নানামুখী বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, পৃথিবীতে পাশ্চাত্য প্রভাব বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ার তিনটি সুস্পষ্ট দিক রয়েছে। যেমন:

১. উত্তর আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে ইউরোপীয়দের বসবাস;

২. বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন শক্তিশালীকরণ এবং

৩. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমদানিকৃত বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ।

ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীগণ দেশীয় জনগণকে আবদ্ধ রেখে প্রাথমিক অবস্থায় উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বেশ উন্নত সাংস্কৃতিক এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়দের চলে যাওয়ার বহুদিন পরও কিন্তু ইউরোপীয় ও স্বদেশীদের মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য প্রভাবের দরুন এ সময়ে নব আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এসব এলাকা পাশ্চাত্য দেশ হিসেবে পরিচিত।

আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর উপনিবেশিকীকরণ নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহ হতে একটি ভিন্ন পদ্ধতির জন্ম দেয়। এতে দেশীয় জনগণকে পুরো বন্দী করে রাখা হয়। পূর্ব থেকে শিল্পসমৃদ্ধ ঔপনিবেশিক হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের উন্নত প্রযুক্তি ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে দু'টো মহাদেশকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়। তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী ও ভারতীয় সভ্যতার বহু পুরনো উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এখনো বর্তমান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল তাদের শিল্পের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশ ও দূরপ্রাচ্যে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের নিরবিচ্ছিন্ন ও সংরক্ষিত সরবরাহ নিশ্চিত করা। দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাণিজ্য পথগুলোকে রক্ষা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের এলাকাগুলো ইউরোপীয় শক্তির নিকট ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে ইউরোপীয় ও অটোমানদের মধ্যেকার যুগসঞ্চিত বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালিয়ে নেয়াই ছিল প্রাচীন ইউরোপীয় শক্তি ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা ও মুখোমুখী সংঘর্ষের কারণ।[৪৯৯] প্রাক-শিল্প ইউরোপ বহু দিন ধরে বরাবরই অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল কিন্তু ইউরোপে শিল্পশক্তির উত্থানের পর শক্তিশালী আর্থ-রাজনৈতিক সংগঠনের অভ্যুদয় ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম শক্তির পতন ডেকে আনে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে চূড়ান্তভাবে এর পতন হয়। ইসলামী শক্তির জন্য অটোমানদের খেলাফতকে একটা জীবন্ত শক্তি হিসেবে মনে করা হতো। ধীরে ধীরে এর ক্ষমতা লোপ পাওয়ার সাথে সাথে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে এটা একটা প্রতীকে পরিণত হয়। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে অটোমানদের ওপর তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীরা চূড়ান্ত আক্রমণ করে। ফলে খেলাফতের স্বর্ণযুগ চূড়ান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে। কিন্তু অনেকে মনে করে যে, ইসলামী শক্তির শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত করতে এটা ছিল পাশ্চাত্য শক্তির প্রচ্ছন্ন আক্রমণ।

---

[499] ইকবাল কবির মোহন, gm‡jg we‡k AvMvmb, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৮

বিশেষভাবে তুরস্ক ও ইরানের বেলায় পশ্চিমা শক্তির প্রভাবের তৃতীয় পর্যায়ের কথা খাটে। তারা কখনো সরাসরি ঔপনিবেশিক শক্তির আওতায় আসেনি। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার ও তা শক্তিশালীকরণের সময়েও তারা তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। সরাসরি জার-শাসিত রাশিয়ার (Czarist Russia) সাথে থাকার জন্য আফগানিস্তানসহ ঐ দেশগুলোতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানোর অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে একটি।[৫০০]

তাদের শিল্পে নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শক্তি দক্ষ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। তারা শাসক দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত আর্থ ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করে। বর্ধিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা বিস্তার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি একটি দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে। এ সময় অফিস কর্মচারী ও নিম্নশ্রেণির প্রশাসক হিসাবে বিদেশী শাসককে সহায়তা করার জন্য তাদেরকে পশ্চিমা শিক্ষা ও ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। পাশ্চাত্য প্রভাবিত দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপনিবেশগুলোতে একদিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। অপর দিকে প্রতিশ্রুতিশীল করণিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপে প্রেরণের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রশাসন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আধুনিকীকরণ এবং নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির শহরবাসীদের জন্য পাশ্চাত্যকরণ এক সাথে চলতে থাকে।

আরব উপদ্বীপ ও আফগানিস্তানের জন্য মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সরাসরি ঔপনিবেশিক তোষণ এবং ঐ সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতিতে যদিও আরব উপদ্বীপের অনেকগুলো দেশে বৃটেনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তবুও তখন কোনো আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেয়া হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এরূপ স্থিতাবস্থা (status quo) চলতে থাকে।

আফগান যুদ্ধে উপজাতিগুলোকে কোনো সামরিক শক্তির নিকট মাথা নত করান খুবই কষ্টকর ছিল। ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আফগান সরকার অর্থনৈতিক বা

[500] ইকবাল কবির মোহন, gm‣jg we‡k AvMvmb, পূর্বোক্ত, পৃ.১০১

রাজনৈতিক কোনো সুবিধাই বৃটিশদের প্রদান করেনি। শুধুমাত্র বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্তের আফগান উপজাতিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে সামরিক অভিযান চালানো হত। আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী দেশের মধ্যে আফগানিস্তানকেই কেবল অদ্বিতীয় বলা যাবে যেখানে সবচেয়ে কম পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে। আধুনিকীকরণের বর্তমান স্রোতধারায় সুবিধাবাদী সামন্ত পরিবারের ক্ষুদ্র একটা অংশ এবং পশ্চিমা জীবন ধারায় পুষ্ট একটি সীমিত আধুনিক শহুরে মধ্য বিত্ত শ্রেণিকেই শুধু আফগানদের মূল জীবনধারা থেকে ভিন্ন করে দেখা যেতে পারে।[৫০১]

ইরান ও তুরস্ককেই কেবল পূর্বে উল্লিখিত পশ্চিমা প্রভাবের তৃতীয় পর্যায়ে ফেলা যায়। ইরানের ক্ষয়িষ্ণু কাজার রাজবংশ **১৯২৫** সনে রেজা শাহ পাহলভী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। ৪ বছর পূর্বে **১৯২১** সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক পরিচালিত প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বশেষ অটোম্যান সম্রাটকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। ইরান ও তুরস্ক উভয় দেশই তাদের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বৈচিত্র সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নতুন নেতৃত্বের অধীনে সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধাঁচে আধুনিকীকরণের অভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। যুগ যুগ ধরে পরিচালিত পুরনো রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত উন্মুক্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে রাতারাতি বিলুপ্ত করা হয়। বিনিময়ে নতুন ধরনের আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও পশ্চিমা ধাঁচের সরকারি প্রশাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। তুরস্ক আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। পশ্চিমাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে তাল মিলাতে গিয়ে তুরস্ক নিজকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং আরবির পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা চালু করে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় ইসলামী বিশ্বের ওপর যে পশ্চিমা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপের সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজের সংযোগ সাধন। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং এটা বলা কঠিন যে, পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের সাথে ইসলামী মূল্যবোধ একত্রে অবস্থান করছে। আফগান অথবা পাখতুন উপজাতীয় পাঠানদের নিকট পাশ্চাত্যের সবকিছুই অনৈসলামিক। কিন্তু একজন তুর্কী ইউরোপীয় জীবনবোধের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ দু'টো জীবনবোধ বা বিশ্বাসের বেলায় বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের ব্যাপারে বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এ দু'টো পদ্ধতির ব্যাপারে মুসলমানদের বিভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি

---

[501] আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRwZK m¤úK, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬

পর্যালোচনার পূর্বে এ স্তরে প্রকৃতপক্ষে দু'টো পদ্ধতি কি তা পরিষ্কার করে জানা প্রয়োজন। সে সাথে ঐগুলো মুসলিম সমাজে প্রয়োগের ব্যাপারে একটি থেকে আর একটির পার্থক্য কতটুকু তাও বের করা আবশ্যক। আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের প্রেক্ষিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে সনাতনী মতবাদকে একটি স্থায়ী উপাদান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। একে কখনো অবহেলা করা যাবে না।

প্রথমেই তিনটি স্বতন্ত্র ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। আধুনিকীকরণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এমন একটি পর্যায় যার ফলে নতুন ক্ষমতা কাঠামো সৃষ্টি হয়, যা পরিণামে নতুন সামাজিক আচরণ ও আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ফলে পুরনো কারিকুলামের স্থলে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন পদ্ধতি চালু হয়।

পাশ্চাত্যকরণ একটি সাংস্কৃতিক ঝোঁক প্রবণতা। এর ফল প্রাচ্যের জনগণ জীবনের সর্বত্র পাশ্চাত্যের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে, যারা পাশ্চাত্যের অনুসারী তারা মনে করে যে, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিক যেমনঃ অভ্যাস, আদর্শ, মূল্যবোধ, রাজনীতিতে নৈতিকতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা, ললিতকলা ও সাহিত্য, এমনকি পাশ্চাত্য-উদ্ভুত চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছেদ-এসবই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও বিখ্যাত। এসব ভেবে যদি প্রাচ্যের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে থাকে তাহলে তা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামষ্টিক বা আংশিক ক্ষতি সাধন করবে।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সনাতনী ধ্যান ধারণা হলো ইসলামের একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এটাও একটা স্থায়ী কারণ। ইসলামের প্রথম দিকে বদ্ধমূল সনাতনী প্রথা যে কোনো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অভাব, সাম্য ও অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইসলামের সনাতনী পদ্ধতি ও পুনর্জাগরণী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো আধুনিকীকরণকে উপেক্ষা না করে সনাতনী পদ্ধতিতে গ্রহণ করা। সনাতনী পদ্ধতি ইসলামের মৌল কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ আধুনিকীকরণের বিষয়গুলোকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিতে পারে। জনজাগরণ প্রক্রিয়া (Revivalism) সর্বদাই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এটা সর্বদা প্রথম দিককার ইসলামী সামাজিক সংগঠনের পুরো জীবনধারায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সনাতনী পদ্ধতি বিভিন্ন ইসলামী সমাজে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিপরীত ভূমিকা পালন

করে আসছে। এছাড়া সামাজিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন মৌলিক পরিবর্তনগুলোর বেলায় সনাতনী পদ্ধতি সমন্বয়ের (Synthesis) কাজ করছে।[৫০২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার ইসলামী সমাজে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ দু'টো ভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা হিসেবে সংহতি আনয়ন করে। এর একটি হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উন্নত সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন ও কাঠামো, যেমন ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতীয় উপমহাদেশ, তুরস্কের অধীন বিরাট অটোমান সাম্রাজ্য এবং অপরটি হলো আরব উপদ্বীপ ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার উপজাতীয় সামাজিক সংগঠন এবং ভারতের শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য চূড়ান্ত ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এশীয় সামন্তবাদ বহুদিন ধরে ইসলামী সাম্রাজ্য সংহত করতে থাকে যখন প্রাচ্যে ইউরোপের শিল্প-উত্তর ঔপনিবেশিক শক্তি উন্নয়নের দিক থেকে চরমে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শুধু ক্ষয়িষ্ণু এশীয় সামন্ত কাঠামোকে দূর করার উপায় অবলম্বন করেই আসেনি। বরং উন্নত শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী সংগঠনও সাথে নিয়ে আসে। এছাড়া তারা সাম্রাজ্যের কারণে ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তাদের উপনিবেশগুলোতে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত আধুনিকীকরণ প্রবর্তন করে।

এর কারণ হ'ল, ইসলামের আধিপত্যপূর্ণ বিশাল এলাকাটা (দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলব্যাপী বিস্তৃত এলাকা) ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি দখল করে নেয়। সর্বপ্রকারের আধুনিকীকরণ ও ইউরোপীয় সব কিছুর প্রতি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বৈরিতা ছিল সুস্পষ্ট। এরূপ বৈরী মনোভাব ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিমদের শত্রুতা পর্যায়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করে। এসব আন্দোলন, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক নব প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। পুরো উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী সাধারণ ইসলামী মনোভাব এবং ইউরোপ প্রবর্তিত আধুনিকীকরণ বৈরিতাপূর্ণই থেকে যায়। এরপরও পাশ্চাত্যকরণকে একটি বিরাট দোষ হিসেবে কঠোরভাবে প্রত্যাখান করা হয়। এমনকি ঐ সময়ে মুসলিম জনগণের বিরাট অংশ কর্তৃক তা নিন্দিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আধুনিকীকরণের কিছু বাছাই করা উপাদান গ্রহণে ইসলামী ভাবধারা এগিয়ে আসে। মনোভাবের এরূপ পরিবর্তনের কারণ হলো, মুসলিম উদারপন্থীগণ বুঝতে পারেন যে, অগ্রগতির নব স্রোতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা

502 দ্রষ্টব্যঃ সাইয়েদ কুতুব, wesk kZvãxi RwnwjqvZ, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ.৩৪

রয়েছে। তারা এটা অনুভব করলেন যে, আধুনিকীকরণের প্রতি মুসলমানদের এরূপ না-সূচক মনোভাব পরিণামে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে।[৫০৩]

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সকল সামন্ততান্ত্রিক ইসলামী সমাজে মুসলিমদের আধুনিক পন্থায় অগ্রগতি সম্পর্কে উদারনৈতিক পরামর্শের কথা অনেক বেশি শোনা যায়। ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদারনৈতিকতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিমূল গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করায় আধুনিকীকরণের নীতি অবলম্বন করা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়নি। এই দ্বীপপুঞ্জের শতকরা ৮৫ ভাগ সাধারণ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতি হলো আরব ও ভারতীয় সভ্যতার শংকর। যে সমাজ দ্বৈত সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা ছিল মন ও মেজাজে শান্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকরা তাদের সমসাময়িক বৃটিশদের ন্যায় উপনিবেশের ওপর পুরোপুরি তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেনি। ফরাসী উপনিবেশও এটা কখনো করেনি। তারা শুধু ঐসব বিষয় প্রচলন করতে চেয়েছিল, যেগুলো তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য থেকে নব-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ধারক বাহক বলে পরিচয় দিতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনেও দেশীয় কর্মচারীদের জন্য মধ্যস্তরের পেশা লাভে সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল হওয়ায় প্রথমদিকে ঐ শ্রেণির প্রবৃদ্ধি কিছুটা সীমিত থাকে। যার ফলে এ শ্রেণির বিরাট কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জনগণের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে গেলে ধার্মিকদের দ্বারাই প্রথম পরিচালিত হয়।[৫০৪]

ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত হাজী আহুস সালিম (১৮৯৪-১৯৫৫) যার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণকে পূর্বেকার আরব নেতা আল আযহারের মুহাম্মদ আবদুহুর অনুসারী বলা যায়। তিনি ছিলের উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা। ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে তিনি অগ্রগতির ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ইসলামে প্রগতি আনয়নের পরামর্শ দেন। মাসজুম পার্টি দ্বিধাহীনভাবে হাজী আহুস সালিমের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। অপরপক্ষে দারুল ইসলাম প্রগতির এরূপ ধারা অনুসরণকে গোড়া পুনর্জাগরণী মতবাদ বলে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারণা চালাতে থাকে।

ইসলামী সনাতনী মতবাদের ভক্ত নাহদাতুল উলামা কোনো এক সময়ে আধুনিকীকরণের প্রবাহে গা ভাসাতে অস্বীকার করলেও উন্নয়নের ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি

---

503 সাইয়েদ কুতুব, wesk kZvãxi RwnwjqvZ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯

504 সোহরাব উদ্দীন, gmwjg we‡ki BwZnvm, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬,) পৃ.৩২৪

সর্বক্ষেত্রে আধুনিকীকরণকে সমর্থন করা হয়। দারুল ইসলামের ক্ষুদ্র একটি অংশ এর প্রতিবাদ করে। পাশ্চাত্যকরণের ক্ষেত্রে (সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন প্রণালীতে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বনে) ইন্দোনেশীয় ইসলামী সমাজ ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দেশীয় সংস্কৃতি এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, প্রচলিত সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের কোনো পরিবর্তনের কথা বলার সাথে সাথে এর বিরোধিতা করা হতো এবং প্রত্যাখ্যান করা হতো। বিংশ শতাব্দীতে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। সে জন্য পাশ্চাত্যের যেকোন সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন অবলম্বনকেই জাতীয়তাবাদ বিরোধী বলে মনে করা হতো। আধুনিকীকরণের ভিত্তিতে অগ্রগতির যে কোন উপায়কে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করা হলেও দেশীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যকরণের যে কোনো বড় ধরনের প্রবণতা প্রতিরোধ করা হতো।

বৃটিশ ভারতে মুসলিমগণ ছিল সংখ্যালঘু। ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন এ উপমহাদেশের প্রায় ৩৩% মানুষ ইসলামের অনুসারী ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে মুসলিম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। ভারতে ইসলামী সংস্কৃতি যদিও হিন্দু সংস্কৃতির সাথে পাশাপাশি অবস্থান করেছে তবুও ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় এটা আরব-পারস্য স্বকীয়তা হারায়নি। মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয়ের সংস্কৃতি সর্বদা খাপ খাইয়ে নিত। হিন্দুরা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের নিকট থেকে অনেক সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ রপ্ত করে। বিনিময়ে মুসলিমরাও হিন্দুদের অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ শিখে নেয়। দুটো ধর্মীয় দলের মধ্যে এমন একটি যোগসূত্র রচিত হয় যে, তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহিষ্ণুতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তাদের সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় মুসলিম নেতৃত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়েই নেতৃত্বের পদমর্যাদা সৃষ্টি করা হয়।[৫০৫]

মুসলিম বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয় ও ভারতীয় এলাকাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে এক করে ফেলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের সামনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার আরেকটি নতুন প্রেক্ষাপট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত কাঠামোর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সম্পৃক্ততা

[505] সোহরাব উদ্দীন, gmjjg we‡ki BwZnvm, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩২

থাকায় নতুন সংগঠনে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক দূরে অবস্থান করতে থাকে। তারা তখনো তাদের গৌরবময় অতীতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় একটি শূণ্যতার মধ্যে বসবাস করছিল। এরূপ অচলাবস্থা থেকে বের হয়ে আসার কথা তখন মুসলিমগণ ভাবতে শুরু করে। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি পরস্পরবিরোধী দু'টো সমাধান বের হয়ে আসে। দু'টো চিন্তাধারাই সনাতনপন্থী মুসলিমদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

একদল মুসলিম আধুনিকতার মাধ্যমে আচারনিষ্ঠ জীবনাদর্শ থেকে বের হয়ে না আসার পক্ষে মত প্রকাশ করে। এ দলকে আহলে হাদীস বলা হয়। তাদের বিশ্বাস যে, কোনো নতুন জীবনাদর্শ ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আপোষ করলে পরিণামে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। সনাতনপন্থী স্যার সৈয়দ আহমদ খান অন্য একটি দর্শন প্রচার করেন। তার নতুন দর্শনে তিনি শুধু ভারতীয় মুসলিমদের অংশগ্রহণের কথাই বলেননি বরং বৃটিশদের সাথে যতটুকু সম্ভব নিজেদেরকে এক করে ভাবার কথাও বলতে থাকেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি আলীগড়ে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ-এর (বর্তমানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) ভিত্তি স্থাপন করেন। কেম্ব্রিজ ইউনির্ভাসিটি স্টাইলের এরূপ কলেজ কয়েক বছর পূর্বে সৈয়দ আহমদ খান দেখে এসেছিলেন। তিনি যে জীবনধারার কথা উৎসাহের সাথে সমর্থন করেছিলেন ও আলীগড়ে যে পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, প্রথম প্রথম তা ছিল পুরো বৃটিশ ধাঁচে মুসলিম পাশ্চাত্যকরণের একটা দৃষ্টান্ত।

মুসলিমদের পরীক্ষামূলক এ পাশ্চাত্যকরণও কিছু আংশিকভাবে এবং কিছু সাময়িকভাবে সফল হয়। এর ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আস্থা ফিরে আসে। বৃটিশ প্রশাসনে তাদের চাকরি পেতে সুবিধা হয়। বৃটিশদের পক্ষে এর বাইরে আর কোনো জনসমর্থন ছিল না। পাশ্চাত্যভিত্তিক আলীগড়ে প্রশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা সরকারি চাকরি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার লাভ করলো এবং মুসলিমদের প্রধান জীবনধারা থেকে দূরে থেকে গেল। জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ সালে মুসলিম খেলাফত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এ আন্দোলনের ফলে স্যার সৈয়দ আহমাদ খান কর্তৃক প্রবর্তিত ও সর্বান্তঃকরণে সমর্থিত পাশ্চাত্যকরণ সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে পুনঃচিন্তার সৃষ্টি হল। আলীগড়ের আন্দোলন তার প্রথম দিকের ভাবমূর্তি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং বিকল্প পন্থার অন্বেষণ করতে থাকে। দু'দশক পর অবশেষে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়।[৫০৬]

[506] আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRwZK m¤úK, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় মুসলিমগণ দু'টো প্রধান রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর অপরটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর পরিণতিতে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শাসনের মোহমুক্ত হয়ে তুরস্কের চাকচিক্যময় খেলাফতের পতনের ফলে আলীগড়ে প্রশিক্ষিত পাশ্চাত্য অনুসারী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী) ভুল ভেঙ্গে যায়। তারা আবার খেলাফত পুনর্জাগরণের (তাহরিখ-ই-খেলাফত আন্দোলন) ডাকে সাড়া দেন ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা পাশ্চাত্যবাদী আলীগড়ের শিক্ষার নিন্দা করে আলীগড়েই জামীয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া নামক নতুন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলনকারীদের মধ্যে আবুল কালাম আযাদ ছিলেন ইসলমী সনাতনপন্থীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূতত, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের মুসলিম বিপ্লব শুধুমাত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যকরণের নিন্দা করেন। জমিয়ত-উলামা-ই-হিন্দও (ভারতে মুসলিম আলেমদের সংগঠন) ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। এ সংগঠনটিও অস্পষ্টভাবে মুসলিম প্রগতিকে সমর্থন করত এবং স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যকরণকে অনৈসলামিক বলে নিন্দা করত।

১৯৩০-এর দশকে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে উৎসাহব্যঞ্জক দিকনির্দেশনা লাভ করে। তিনি পাশ্চাত্য ধাঁচে প্রতিষ্ঠাযোগ্য পৃথক পকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব করলেন। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও আলীগড়ে প্রশিক্ষিত সৈয়দ আহমেদের অনুসারীদের কাছ থেকেও পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আসতে থাকে। জিন্নাহ যে ধরনের মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন তা শরীআর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি কামাল আতাতুর্কের পাশ্চাত্যকৃত তুরস্কের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্যকৃত ইসলামী সমাজ সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা প্রথমদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, তবে পরিণামে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জনসাধারণের নিকট পাশ্চাত্যকরণ পদ্ধতি বুদ্ধিগত ও সামাজিক দিক থেকে বোধগম্য ছিল না। পাকিস্তান বলতে তারা একটি আচারনিষ্ঠ রাষ্ট্রকেই

বুঝতো। মধ্যপন্থী ও ইসলামী বিপ্লবী উভয় শ্রেণিই মধ্যবিত্ত শ্রেণির রপ্ত করা পাশ্চাত্যকৃত জীবনধারাকে সক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। জামায়াতে ইসলামী (আবুল আলা মওদুদী কর্তৃক পরিচালিত) একটি আচারনিষ্ঠ (পিউরিটান) রাষ্ট্র গঠনের প্রতি বরাবরই আহ্বান জানাতে থাকে।

ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে যে ধরনের আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ ঘটে তার চেয়ে আরব বিশ্বে ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ভৌগোলিকভাবে ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের দরুন নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-পূর্ব আধুনিকায়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর চাইতে পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে বেশি পাওয়া যায়। ভারত ও ইন্দোনেশীয়ায় উপনিবেশবাদ প্রবেশের পরেই এসব অঞ্চলে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের যে শেষ শক্তিটুকু বাকী ছিল তার জন্যই এমন হয়। এর পরপরই অটোমান সাম্রাজ্য চূড়ান্ত পতনের দিকে এগিয়ে যায়। ১৮৩৫ সালের কিছুকাল পূর্বেই আলজেরিয়া ফরাসীদের অধীনে আসে। এরপর ১৮৮১ তিউনিসিয়া ফ্রান্সের অধীনে চলে যায়। ১৮৮২ সালে বৃটিশরা মিসর দখল করে। এসব দেশকে উপনিবেশে পরিণত করার ফলে উত্তর আফ্রিকার ওপর ইন্দো-ফরাসী আধিপত্য বিস্তার চূড়ান্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অটোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের পর মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো ৯টি আরব উপদ্বীপ ব্যতীত বৃটিশ (প্যালেস্টাইন, জর্দান, ইরাক) ও ফরাসীদের (সিরিয়া ও লেবানন) আধিপত্যে চলে আসে।[৫০৭]

ওলন্দাজের ন্যায় বৃটিশরা তাদের উপনিবেশের ওপর নিজেদের সংস্কৃতি পুরো চাপিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে দেখা যায় ফরাসী উপনিবেশকরণ যেমন সাংস্কৃতিক ছিল তেমনি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ফরাসী ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীনে তারা শতাব্দীব্যাপী তাদের সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে সেদিন পর্যন্তও ফরাসী শাসিত উত্তর আফ্রিকা ও মরক্কো (সরাসরি এ দেশগুলো ফ্রান্স ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধীনে না থাকলেও ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল) বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মধ্যযুগীয় পর্যায়ে থেকে যায়। ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল হওয়ার পর কাদেরীয়া তরীকার একজন গোঁড়া শেখ, আবদুল কাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন ও ১৫ বছর ধরে (১৮৪৭ পর্যন্ত) যুদ্ধ করেন। তার জিহাদ ছিল প্রকৃতই ইসলামী এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

[507] ইকবাল কবির মোহন, gm‡jg we‡k AvMvmb, পূর্বোক্ত, পৃ.১০০

এরপর ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়নি। এ সময় ফরাসীদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রতি অবদমিত মনোভাব উত্তর আফ্রিকানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। ১৯৫০-এর দশকে মিসরে যখন আরব জাতীয়তাবাদী চেতনা ঘনীভূত হচ্ছিল এবং আরব মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিমা শক্তির সাথে মুকাবিলায় রত ছিল, উত্তর আফ্রিকা তখনো আরব জাতীয়তাবাদের অনুসারী হবে, না ইসলামী ভাবধারায় নিজকে গড়ে তুলবে তা নিয়েই দ্বিধান্বিত ও সিদ্ধান্তহীনতায় নিমগ্ন ছিল। এসব উত্তর আফ্রিকান দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেনির পাশ্চাত্যকরণ ঔপনিবেশিক হয়ে তাদের মধ্যে একটি শূণ্যতার সৃষ্টি করে (ফরাসী শিক্ষা-দিক্ষা ও ফরাসী জীবনধারায় অভ্যস্তকরণ)। তখন তাদের সামনে আর কোনো নির্দেশনা ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা ঔপনিবেশিক কাঠামোতেই আধুনিকীকরণ আনতে সক্ষম হয় এবং তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করে। মরক্কো, আলজেরিয়া ও লিবিয়ার এ জাতীয় সম্ভাবনা ছিল না। পাশ্চাত্যকরণের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যকে প্রতিরোধ করা এবং স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলজেরিয়া ও লিবিয়া দ্রুতগতিতে আরব-ইসলামী পুনর্জাগরণী আন্দোলনে শরীক হয়।[৫০৮]

এ সময় মিসরের আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রভাব মুসলিম বিশ্বে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাদের ধ্যান ধারণা শুধুমাত্র মিসরেই লক্ষ্যণীয় ছিল না। এর প্রতিধ্বনি আরব বিশ্ব তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই শোনা যায়। ইসলামের প্রভাব জানার ব্যাপারে এর গভীরে যাওয়ার পূর্বেই মিসরের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনার বেলায় সেখানে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। ১৮৮২ সালের দিকে মিসরে বৃটিশ শাসন শুরু হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের আক্রমণের পূর্ব থেকে ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের সাথে মিসরের সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মিসরীয় অভিজাতগণ তাদের তরুণদের সামরিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্যারিসে পাঠাতে থাকে। এতে মিসরে ইউরোপীয় আধুনিকতার উদ্ভব ঘটে। এমনকি নব উদ্ভুত আধুনিকীকরণ শুরু হওয়ার পূর্বে এ কারণেই মিসরে ফরাসী শিক্ষিত শ্রেণির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। নব উদ্ভুত পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষিত এই শ্রেণি মিসরীয় এলিটদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনা প্রবর্তন করে।

---

508 ইকবাল কবীর মোহন, †'‡k †'‡k gmwjg RvZqZvev', (ঢাকাঃ ইকরা ফাউন্ডেশন, ২০০৯,) পৃ.২২

উনবিংশ শতাব্দীতে মিসরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ থেকে অনেকাংশে উন্নত ছিল। সামন্তবাদ কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদের দিকে মোড় নিচ্ছিল। জমিদারীর শোষণ চলছিল মজুরীশ্রমের মাধ্যমে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তখনো মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের মধ্যে বসবাস করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটিশ আধিপত্যবিস্তার ও মিসরীয় তুলা ফসলের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণের ফলে অতিরিক্ত সুবিধা কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। ইউরোপের সাথে ভৌগোলিক সান্নিধ্য এবং সর্বোপরি ইউরোপের অগ্রসর সার্বিক অর্থনৈতিক পটভূমি মিসরের দ্রুত পাশ্চাত্যকরণে সহায়তা করে।

আল-আজহারের সেকেলে শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণে তিনি বিরাট অবদান রাখেন। মুহাম্মদ আবদুহুর সনাতনী কাঠামোতে ইসলামকে আধুনিকীকরণের প্রশ্নে জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত তাহা হুসায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে, মিসর ও ইউরোপ উভয়ে একই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের অধিকারী। তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণ এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বৃত্তি গ্রহণের তুখোড় সমর্থক ছিলেন। তাহা হুসায়ন যদিও তার প্রাথমিক শিক্ষা আল-আজহারেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু প্যারিসে তার পরবর্তী শিক্ষা তার আদর্শগত পরিবর্তনের সূচনা করে। তাহা হুসায়নের লেখা আধুনিক আরবি সাহিত্যে বিরাট প্রভাব ফেলে। এরপরও ইসলামী বিশ্বে তার নাম কেউ জানে না। আবদুহুর আদর্শই দেশে–বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৫০৯]

সিরিয়া, লিবিয়া এবং দূর ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর আধুনিকীকরণ তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। ইরাক ও জর্দান (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি এ দু'টো দেশ বৃটিশের অধীনে থাকে) উভয় দেশেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান। এখনো অনেক ভূস্বামী রয়েছে যারা অনেক জমির মালিক ও গ্রামদেশে বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শহর এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী (১৯৫৮ সারে ইরাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন দ্বারা এ পদ্ধতি ধ্বংস ও বিলুপ্ত করা হয়) মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ ছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানও এ দু'দেশের আধুনিকীকরণে বেশ বিলম্ব ঘটায়। উভয় দেশই অন্যান্য দেশের সীমান্ত দ্বারা চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত ছিল। শুধু ইরাকের জন্যই উপসাগরীয় পথের মাধ্যমে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় শক্তির প্রসারের সময় বহির্বিশ্বের সাথে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে যোগাযোগ সৃষ্টির সুযোগ হয়। এ ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক উপাদান এ দু'টো দেশের জমিদারী

509 ইকবাল কবীর মোহন, †'‡k †'‡k gmwjg RwZqZvev', পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

আভিজাত্যের অন্তর্মুখী জীবনধারা সৃষ্টিতে বিপুলভাবে দায়ী। মিসরের মত এ দু'দেশের সুবিধাবাদী শ্রেণি সাধারণভাবে স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত থাকেনি। বৃটিশ প্রশাসন ১৯২০ দশকের দিকে আধুনিকীকরণের কিছু কিছু নমনীয় পন্থা প্রবর্তন করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি এর অগ্রগতি মন্থরই থেকে যায়। বর্তমানের আরব তেল-অর্থনীতি ও অন্যান্য সম্পদ এ দু'টি দেশে আধুনিকীকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশ দু'টি পাশ্চাত্যকরণের যেসব উপাদান পেয়েছে তার প্রায় সবগুলোই মিসরীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও গণমাধ্যমের সাহায্যে। গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে বহু ধরনের যোগাযোগের ফলে ইরাক ও জর্দানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিকট ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতির দ্বার খুলে গেছে। কিন্তু মানুষের বর্তমান অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য পাশ্চাত্যকরণের যেকোনো প্রভাবের প্রতি না সূচক অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ইরাকের বেলায় আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইরাক শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের (দু'টো বড় ধরনের ইসলামী মাযহাব) ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। আজও শিয়াপন্থী পীর আওলিয়াদের শিক্ষার সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্র নাজাফে অবস্থিত। স্থানটির ধর্মীয় পবিত্রতাবোধ ও বর্তমানে প্রচলিত সনাতনী জীবনধারা পাশ্চাত্যকরণের গতি প্রতিরোধের ব্যাপারে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এখানে সুন্নী ও শিয়া আওলিয়াদের কারো নিকটই আধুনিকীকরণ ও ইসলামী জীবনধারার মধ্যেই কোনো বিরোধ নেই। শিয়া-সুন্নী মতবাদ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা এবং সেকেলে অর্থনীতিকে নতুন করে সংস্কার করার ব্যাপারে কখনো ইসলামের মৌল ঘোষণার বিরোধিতা করেনি।[৫১০]

প্রায় তিন দশক পূর্বেই আরব উপদ্বীপে আধুনিকীকরণের গতি সঞ্চারিত হয়। তেল থেকে প্রাপ্ত ক্রমবর্ধমান রাজস্বের মাধ্যমে এ সংক্ষিপ্ত সময়ে উপদ্বীপে পুরো অঞ্চলে (দক্ষিণ এলাকা ব্যতীত) জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও এখনো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতির জীবনধারায় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণ কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। আরবের অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় সনাতনপন্থী মতবাদ আধুনিকীকরণ ও এর নিজের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করেনি।

---

[510] ইকবাল কবীর মোহন, †'‡k †'‡k gm‡jg RwZqZvev', পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫

তুরস্ক ও ইরান এ দু'টো মুসলিম দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকীকরণ করার নিমিত্তে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল বিপ্লবাত্মক। এমনকি তুরস্কের বেলায় রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তন করে পুরোপুরি ইউরোপীয় ধাঁচে তোলার পদক্ষেপও নেয়া হেয়েছিল।

অটোমানদের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোতে খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু হওয়াতে তুরস্ক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ও আধিপত্য সংকুচিত হয়ে যাওয়ার মত একটি প্রকৃত সত্য তুরস্ক বাসীদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তুরস্কবাসী নতুন স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা খুঁজে পায়। ইসলামী দিব্যতত্ত্বের নামে সমগ্র শতাব্দীব্যাপী খেলাফত টিকে ছিল। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা খেলাফতের ব্যাপারে চূড়ান্ত লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ইসলামের কেন্দ্রীয় ভূমিকারও সমাপ্তি ঘটে। প্রজাতান্ত্রিক যুগের প্রথম দিকে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে বর্তমান থাকলেও তা ছিল প্রতীকী ধরনের। এ সময় শরীআা মন্ত্রণালয় ও অটোমানদের ইসলামী আদালত উঠিয়ে দেয়া হয় ও মুসলিম পীর আওলিয়াদের দমন করা হয়। পোশাকের বেলায় কঠিন আইন চালু করা হয়, ফেজ টুপী ও বোরখা নিষিদ্ধ করা হয়। তুর্কিদের লেখার জন্য আরবির স্থানে রোমান হরফ চালু করা হলো। আরবিতে আযানের পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় আযান চালু করা হয়। ইউরোপের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে জাতীয়তাবাদী তুর্কীদের অভিন্ন করে দেখার জন্য এসব কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যকরণের নিমিত্ত নতুন নেতৃবন্দের উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে ১৯৩১-৩২ সালে পুরো পাশ্চাত্য ধাঁচে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পিপলস্ হাউস করা হয়। লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কামাল আতাতুর্কের শাসন পুরো জাতিটাকে দমন করে রেখেছিল। ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর পর উদার নৈতিকতা অনমনীয় রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।[৫১১]

যুদ্ধ-পরবর্তী শতকে তুরস্কে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, ইসলামী সনাতনপন্থীরা তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি প্রেসারগোষ্ঠীরূপে আবির্ভূত হয়।

বিভিন্ন কারণে ইরানেও দ্রুত আধনিকীকরণের (যেগুলো পাশ্চাত্যকরণের কাছাকাছি পৌঁছে যায়) একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ইরানী শাহদের শাসনের শেষ দশকগুলোতে কাজার রাজবংশ প্রদেশগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কেন্দ্রীয় সরকার নামে মাত্র থেকে যায়। ১৯২৫ সালে রেজা শাহ ক্ষমতা

---

511 ইকবাল কবীর মোহন, †'‡k †'‡k gmwjg RwZqZvev', পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮

দখল করে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী সংগঠিত করা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি পশ্চিমের দেশগুলোর সাহায্য কামনা করেন। তার সৈন্যবাহিনীর সমস্ত কাঠামোকে ইউরোপীয় মানে পুরোপুরি আধুনিকীকরণ করার পর তিনি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে ফরাসী শিক্ষাক্রম অনুসরণের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য এ সময় ছাত্রদেরকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ শিল্পোন্নত দেশে পাঠান হয়। যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে তখন ছাত্রদেরকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল তা' আসলে বেশ উঁচু শিল্পোন্নত সমাজের জন্যই উপযোগী ছিল। ঐ শিক্ষা সে সময়ের ইরানের প্রয়োজন অনুসারে যথার্থ ছিল না। রেজা শাহ (তার সন্তান মোহাম্মদ রেজাও) এমন ধরনের উচ্চ প্রশিক্ষিত পাশ্চাত্য শ্রেণির কথা ভাবতেন। পরিণামে যা তার গোষ্ঠীর শাসনের জন্য একটি শক্ত ভিত নির্মাণ করে। ইউরোপীয় পর্যায়ে পৌঁছার উদ্দেশ্যে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায় তিনিও চরম মানের আধুনিকতার ওপর ধর্মের প্রভাব হ্রাস করার জন্য কঠিন পন্থা অবলম্বন করেন। এরূপ করতে গিয়ে তিনি শুধু যুগ-পুরনো ইসলামের বৈধ নিয়মগুলোরই বিলোপ সাধন করেননি বরং আমামা (ইসলামী ওলামাদের পরিহিত পাগড়ী) ও পর্দা নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারী করেন।

মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইরান ছিল একটি পুরোপুরি শিয়া অধ্যুষিত দেশ। দৈনন্দিন জীবনে শিয়ারা বেশ সনাতনপন্থী। তারা বেশ উৎসাহের সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। স্বভাবতই আধুনিকীকরণের নামে সম্পূর্ণ বিদেশী যে সংস্কৃতিকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল তা শিয়া আলেমদের মধ্যে মারাত্মক বৈরিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাহলভী শাসনামলে ইরানি সমাজের নিম্নস্তরে এই শত্রুতা বিরাজমান ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে ধীরে ধীরে আধুনিকীকরণ চলতে থাকলেও আজকের ইরানের ইতিহাস পুরো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত।

পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রথমটিতে সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং দ্বিতীয়টিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বুঝায়। এর মধ্যে পাশ্চাত্যকরণ হলো একটি বেশ আধুনিক ঘটনা যাকে বিভিন্ন সমাজের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। আধুনিকীকরণ একটি স্তর। এর প্রমাণে ইতিহাসে ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এসবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা আন্দোলন,

মিসরে তাহা হুসায়নের বুদ্ধিজীবী আন্দোলন, কামাল আতাতুর্ক, রেজা শাহ, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাশ্চাত্যমুখী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংস্কার তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেগুলো ইসলামের গ্রহণযোগ্য সনাতনী মতবাদের কাঠামোকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।[৫১২] উদারপন্থীগণ ঐসব সংস্কার বিরোধিতা করেছিল, এমনকি প্রত্যাখ্যানও করেছিল। অপরপক্ষে দেখা যায় আধুনিকীকরণ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা 'ইসলামী সমাজ সংগঠনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখা যায় কিন্তু পুনর্জাগরণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যকরণের ন্যায় তা জনসমর্থন পায়নি।

পাশ্চাত্যকরণ এবং ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ দু'টোই বিপরীত মেরুর ন্যায় হলেও উভয়ের সম্পর্ক সাংস্কৃতিক প্রবণতার সাথে। পাশ্চাত্যকরণ সাংস্কৃতিক নির্দেশনার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। পুনর্জাগরণবাদ প্রথমদিকের ইসলামী সমাজ সংগঠনের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরনের জন্যে অতীতের দিকে চেয়ে থাকে। সবাই এটা লক্ষ্য করে থাকবে যে, যেসব ইসলামী দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানেই আবার পুরো বিদেশী সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য পুনর্জাগরণ মতবাদের শক্তিশালী যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, ঐসব দেশের যেখানে আধুনিকীকরণ সাংস্কৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে একটি স্থিতিশীল গতি বজায় রাখতে পেরেছে সেখানে পুনর্জাগরণ মতবাদকে মানুষ তেমন গ্রহণ করেনি।[৫১৩]

১০.১৩. আজকের ইসলামে সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ

বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ একই বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতার ওপর গড়ে না উঠলেও তাদের মধ্যে বিস্তর মিল রয়েছে। ইউরোপে ইসলামের অনুপ্রবেশের কারণে বৃহত্তর অর্থে এটা ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী চিন্তার আন্দোলন। এটা ছিল প্রতিশোধের আন্দোলন, যদিও এর মধ্যে ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত বিষয়াবলি যুক্ত হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ হতে এগুলোকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একভাগে রয়েছে সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ আর অন্য ভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারবাদ ও বিভিন্ন ধরনের আধুনিকতাবাদ -এর মধ্যে বিরাজমান দ্বৈত বিভাজন।

---

[512] Murad Mahfuz, 'Westernism, Islam and Muslim World : A Critical Study', *Al-Islam,* Issu-32, April-June 2002, p.65

[513] Murad Mahfuz, 'Westernism, Islam and Muslim World : A Critical Study', ibid, p.66

পৃথিবীর অসংখ্য বিষয়সমূহের মতো গতানুগতিক মুসলিম গোষ্ঠী হতে সংস্কারবাদের উৎপত্তি হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন উলামা বা মুসলিম গোষ্ঠীর প্রধানগণও অন্তর্ভুক্ত। যেমন আফগানী, আবদুহু, রশীদ রিযা ও আরো পূর্বের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, সুদানের মাহদী। তারা আসলে ঐসব উলামা বা অতিন্দ্রীয়বাদী নন যারা ঐ গোত্রের প্রধান অংশটাই গঠন করেন কিংবা যারা অধিকাংশ আন্দোলনের সাথে জড়িত। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বৈততা ছিল না। পশ্চিমা প্রভাবের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়নি। তারা মুসলিম। ঈমানের দিক দিয়ে সামাজিক আচার আচরণ নির্ধারণকারী ধ্যান ধারণা ও অনুভূতিতে তারা মুসলিম। কিন্তু তাদের লক্ষ্য কোন দিকে?

এটা সাধারণত মার্টিন লুথারের ন্যায় বিরোধ সৃষ্টিকারী একটি ধর্মীয় সংস্কার নয় বরং সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি পরিশুদ্ধ ধর্ম। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব একটি ব্যতিক্রম। তিনি তার ধর্মের দেয়া পূর্ণ সমাধানের পরিপোষক ছিলেন। বহির্বিশ্বের কোনো প্রভাব তার ওপর পড়েনি।

অপরপক্ষে আধুনিকতাবাদের মূল নিহিত ছিল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও যারা মুসলিম ছিলেন। সালামা মুসার ন্যায় একজন আধুনিকতাবাদী মুসলিম প্রথমে ফেবিয়ান এবং পরে মার্কসবাদী হয়ে এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদের মধ্যে সাধারণ গ্রহণীয় বিষয় যা তা হলো সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে ইসলামী আকীদা ও ঐতিহ্যকে সমগ্র গভীরতাসহ গ্রহণ করা। এর পরও আধুনিকতাবাদী আন্দোলনে পশ্চিমা আর ইউরোপীয় জীবনধারা ও চিন্তাধারার প্রতি পরিষ্কার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

তাই বলা যায়, আধুনিকতাবাদের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব। সমস্যাটা এখানে নৈতিকতা বিষয়ক নয় বরং আচার আচারণ ও রাজনৈতিক পদ্ধতি বিষয়ক। আধুনিকতাবাদের বিভিন্ন রূপ মুসলিম চিন্তাবিদদের ভীষণভাবে ইসলামে আকৃষ্ট করে। এসব চিন্তাবিদদের মধ্যে ইকবাল, আমীর আলী, সমাজ সংস্কারক কাসিম আমিনের ন্যায় উদার বুদ্ধিজীবীদের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা ধীরে ধীরে তাদের সংস্কৃতির গোড়ায় বিদ্রোহ করেন। এদের মধ্যে লুতফী আস-সাইয়িদ বা তাহা হুসায়ন এমনকি ধর্মরিপেক্ষ রাষ্ট্রনায়ক আতাতুর্কের নামও উল্লেখ করা যায়। এটা উল্লেখ্য যে, আধুনিকাতাবাদ বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটাকে সাধারণ ও শিথিলভাবে বিশ্লেষিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবেও গণ্য করা যায়।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ ও প্রস্তাবনা

বিশ্বায়ন একটি ধারণা। এটি একটি বিশ্বজনীন ধারণা। বিশ্বায়ন এমন এক বিশেষ ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে জটিল সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে সীমান্ত বা জাতীয় সীমারেখার কোনো ভূমিকা থাকবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বের কোনো এক অংশে সংঘটিত পরিবর্তন বা উন্নয়নের প্রভাব পৃথিবীর অন্য অংশেও পড়তে বাধ্য। এতে দেখা যায়,

১. বহুজাতিক পুঁজির সাথে রাষ্ট্রনামক প্রতিষ্ঠানের জটিল ও সক্রিয় সম্পর্কই বিশ্বায়নের আকার ও পরিধি নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক এলিটশ্রেণি, বহুজাতিক কর্পোরেশন ও পুঁজিব্যবস্থাপকদের সামনে এক বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় বাধা ধীরে ধীরে উঠে যেতে শুরু করায় তারা এখন বিশ্বের যে কোনো বাজারেই অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।

২. শ্রমজীবী মানুষ ও জনগণের আন্দোলনগুলো ধীরে ধীরে এই উপলব্ধিতে পৌঁছাচ্ছে যে, বিশ্বায়ন দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের যে অংশেই সে বসবাস করুক না কেন, অধিকাংশ মানুষই এখন মনে করছে যে, বিশ্বায়ন সমৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কোনোভাবেই অর্জিত হয়নি।

৩. অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়েছে, আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে, জীবন যাত্রার মান নেমে গেছে।

৪. বিশ্বায়নের ফলে আয় বৈষম্য দিন দিন বেড়ে চলেছে।এই বৈষম্য শুধু একদেশের সাথে অন্য দেশেরই নয় বরং একটি দেশের অভ্যন্তরেও সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কার্যত চরিত্রগতভাবেই বিশ্বায়ন একটি অসম প্রক্রিয়া। এর স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো অসমতা সৃষ্টি করা। একদেশের সাথে আর এক দেশের, এমনকি কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের বা সমাজের মধ্যেও বৈষম্য আজ লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ফুটে উঠেছে। আর এটা ঘটছে মূলত এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিকে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে। লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের কারণে অসমমতা আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। পুঁজির

মালিক ও ব্যবস্থাপকরা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার একদেশ থেকে অন্যদেশে আদান প্রদান করছে।

৫. একদেশ থেকে অন্যদেশে শ্রম বিনিময়কে কঠিনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। খুবই দক্ষতা সম্পন্ন কিছু পেশাজীবীর জন্য একদেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই সংখ্যা কোটিতে গুটিকয় মাত্র।

৬. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া কেবল বিত্তবান ও সমৃদ্ধ একটি শ্রেণিকেই একত্রিত ও পূর্ণতা দান করছে কিন্তু যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সম্পদ নাই, তারা বিশ্ব বাজারে কোনো সুবিধাই ভোগ করতে পারছে না, তারা ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থানে নেমে যাচ্ছে। বাস্তবে উৎপাদনী শক্তির অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক বিকাশ সত্ত্বেও এবং বিশ্বায়নভুক্ত পক্ষগুলোর ভৌত বা ভৌগোলিক দুরত্ব তাতে সংকুচিত হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতাগত ব্যবধান কেবল সংকুচিতই হয়নি বরং বহুক্ষেত্রে ঐ ব্যবধান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির দশম বার্ষিক রিপোর্টে (১৯৯৯) বলা হয়েছে, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলছে। শুধু তাই নয়, দরিদ্র দেশসমূহে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়ে দেশে সামজিক ক্ষেত্রে সংঘাতময় অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা ও বেড়ে গেছে। এর মূলে রয়েছে প্রধান কারণ হিসেবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অসম বৃদ্ধি।

৭. পাশ্চাত্যের মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদ এখন বিশ্বায়নের প্রভাবে সর্বজনীন ব্যবস্থারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতিই একালের চুড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. বিশ্বায়ন নব্য উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটিয়েছে নতুন অবয়বে, নতুন কৌশলে। নব্য উপনিবেশবাদের সূক্ষ্মরূপ, উক্ত মতবাদের আওতায় সরাসরি দখল কায়েম না করে বাজার দখল ও মন মানসিকতা পরনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন কৌশলাধি প্রয়োগ করা হয়।

৯. বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অল্প কিছু প্রভাবশালী রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমুহ তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বিশ্বায়নের নামে সারা পৃথিবীতে প্রসারিত করছে। বিশ্বায়নের সিংহভাগ উপকারভোগী হলো উন্নত রাষ্ট্রসমুহ।

১০. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির পথ ধরে রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমাগতভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সমাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের কাঠামো একর পর এক ভেঙ্গে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক কাঠামো এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে

পরিণত হয়েছে। তবে মিশরে গনতন্ত্র পছন্দ হয়নি আমেরিকা-ইউরোপের। যে কারণে মোহাম্মদ মুরসির উত্থান এবং নির্বাচনে জয় গণতন্ত্র ও মিশরের জন্য অশনিসংকেত -এই ধুয়ো তুলে সেনাপ্রধান আব্দুল ফাত্তাহ সিসির অবৈধ ক্ষমতা দখলকে আমেরিকা স্বাগত জানিয়ে বিরাট সার্টিফিকেট ও দিয়েছে।

১১. বিশ্বব্যাপী অভিবাসী সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এশিয়া ইউরোপ সর্বত্র এ সংকট। ইউরোপ এখন শরনার্থীর ভিড়ে টালমাটাল। শরণার্থীরা আসছে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও লিবিয়া থেকে। প্রত্যেকটি দেশ ধ্বংস করেছে বিশ্বায়নের মোড়ল আমেরিকা, সায় দিয়েছে ইউরোপ। ইরাক ধ্বংসের মূলে আমেরিকার প্রথম সহযোগী ব্রিটেন, কম যায়নি স্পেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ডও। উল্লেখ্য, সিরিয়া থেকেই ৮০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুহারা, ২৫লাখ আশ্রয় নিয়েছে সউদি আরবে, ২০ লাখ আশ্রয় নিয়েছে তুরস্কে ও ১১ লাখ লেবাননে। বাকিরা ইরান, জর্ডান ও ইউরোপে। জার্মানি বলেছে, ৮ লাখ শরনার্থীকে আশ্রয় দেবে। শরনার্থী ও মানবিকতা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল রাজনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই সবচেয়ে বড় শরনার্থী সংকটে পড়েছে পশ্চিমা বিশ্ব।

১২. মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন লিখেছেন, বিশ্বায়নের এ যুগে যে সংঘাত সৃষ্টি হবে তা জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে আর হবে না, হবে সভ্যতার মধ্যে, কেননা জাতিরাষ্ট্র তার গৌরবময় অবস্থান হারিয়ে ফেলবে। এরই মধ্যে প্রত্যেক সভ্যতার অভ্যন্তরে ছোটখাটো সংঘর্ষ ঘটবে বটে, কিন্তু বড় আকারের সংঘাত ঘটবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে। এক পর্যায়ে চাইনিজ ও জাপানি সভ্যতাও হাত মিলাতে পারে ইসলামী বিশ্বের মধ্যে। সাংঘর্ষিক ইসলামকে এভাবে তাদের সাধের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়ে হান্টিংটন ইউরোকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং তার বর্ধিতাংশ যুক্তরাষ্ট্রকে সাবধান করলেন। এরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চেইন ইভেন্ট হিসেবে দেখা যায় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে ধ্বংসলীলা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটতে থাকে আফগানিস্তানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। শুরু হয় পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে যুদ্ধ, আগ্রাসন, বিমান হামলা, মুসলিম অধ্যুষিত জনপদসমুহে তালেবান এবং মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি অনুগত আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগের রাজনীতি। শুরু হয় শক্তিশালী মিডিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকপর্যায়ে ইসলাম বিরোধী জনমত সংগঠনের বিশাল আয়োজন।

১৩. বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে। পরিবার ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বা বিলুপ্তির ফল হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(ক) ধীরে ধীরে বিবাহ প্রথা উঠে যাচ্ছে।

(খ) বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্মের হার ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) তালাকের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে।

(ঘ) গর্ভপাতের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়ছে।

(ঙ) অবৈধ যৌনতার মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

(চ) নারী প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, সহিংসতা, উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে।

(ছ) নিকট রক্ত সম্পর্কীয় সহিংসতা প্রতিদিনই বাড়ছে।

(জ) নারীকে যৌনতার একমাত্র উপকরণ হিসেবে দেখা দেখানো হচ্ছে।

(ঝ) মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের পর্ণোগ্রাফী সাম্রাজ্যে নারীকে ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়েছে।

(ঞ) লিভ টুগেদারের হার বেড়ে গেছে।

(ট) অনৈতিক পরকীয়ায় আসক্তি বেড়ে গেছে।

১৪. তৃতীয় বিশ্বে অত্যন্ত দ্রুতগতির নগরায়ন প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে বিশ্বায়ন। নগরায়নের দ্রুতগতি তৃতীয় বিশ্বে প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এসব নগরে অভাবী, দরিদ্র, কর্মসংস্থানকামী মানুষের ভিড় বাড়ছে। নগরে এসে অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীনেই ৫০ মিলিয়ন মানুষ আশ্রয়হীন।

১৫. বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ আন্তর্জাতিক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের বাজার অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাদক ব্যবসা হয়ে থাকে।

১৬. সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হয় না যে, এটি হলো হলো বিশ্বময় পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট নীল নকশা। বিশ্বায়নের প্রভাবে উন্নত ও উন্নয়নকামী বিশ্বের মধ্যে যে পার্থক্য রচিত হয়েছে বিশেষ করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে -তা জেরেমি রিফকিটের

কথায়, সাংস্কৃতিক পুঁজিবাদের আদলে সমগ্র বিশ্বকে সমজাতীয় এবং সংহত ও একীভূত করার লক্ষ্যে।[৫১৪] এই পরিকল্পিত বিশ্বে গতিই হবে মুখ্য। যতির কোনো স্থান নেই।

১৭. বিশ্বায়নের পরিকল্পিত বিশ্বে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী এককেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিজয় নিশ্চিত করতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। তাই বিশ্বব্যাপী জনগণের সামনে আকর্ষণীয় মোড়কে প্রতিনিয়ত তুলে ধরা হচ্ছে পানের জন্য কোকাকোলা, উপভোগের জন্য চটকদার মার্কিনি চলচ্চিত্র এবং আহারের জন্য খাদ্যের অনুপোযোগী মার্কিনি জাঙ্ক ফুড। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, টেলিভিশন প্রোগ্রামের মতো বিনোদন শিল্পের প্রাণ ভোমরা কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনের সুগভীর সরোবরে। এই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য আর্থিক সম্পর্ক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ, সনাতন সামাজিক সম্পর্ক অথবা পারিবারিক মূল্যবোধ নয়। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৌন্দর্য এবং নগ্নতার মধ্যে পার্থক্য অপসারিত হয়েছে। এককেন্দ্রিক সংস্কৃতির স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি মোটেই সহনশীল নয়।

অন্যদিকে ইসলাম একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্মীয় মতাদর্শ। ইসলামের রয়েছে বিশ্বদৃষ্টি। সর্বজনীনতা-বিশ্বজনীনতা ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম আল্লাহর শ্বাশ্বত পথ নির্দেশ। এর শিক্ষাসমূহ নবীন ঊষার মতো তরতাজা, স্বচ্ছ ও আধুনিক। মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা এর গুণবৈশিষ্ট্য। এ সত্যটি ভালোভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এবং সমুদয় সমতা, উদারতা, সুষমনীতি তার দেয়া অধিকার ও কর্তব্যসমূহের ব্যবস্থাবলীতে পূর্ণ অবয়বে রয়েছে।

দেড় হাজার বছর পূর্বের ইসলামের বিশ্বজনীন আহ্বান আজকের বিশ্বায়নের আহ্বান থেকে শ্রেষ্ঠ ও অনেক ব্যাপক। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য। ইসলাম মানবতার একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামে সমস্ত মানুষই সমান। বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। এ দ্বীনের আহবান সমগ্র মানবতাকে সচেতন করার জন্য রক্ত,বর্ণ, গোত্র সম্পদ ও অঞ্চলগত মর্যাদার সমস্ত মিথ্যা বাধা মূলোৎপাটন করে মানবতাকে সত্যিকারের মর্যাদার আসনে সমাসীন করাই এ দ্বীনের লক্ষ্য। ইসলামের কল্যাণ বিশ্বজাহানের জন্য। এ জন্য ইসলামে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের রব হিসেবে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা.কে বলা হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীন বা বিশ্ব জাহানের জন্য করুণা। আল-কুরআন হচ্ছে

---

[514] Jeremi Rifkit, উদ্বৃতিঃ মো. আব্দুল হালিম, VvDv h‡×vËi Avš Í RwZK m¤ú‡Ki BwZnvm ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ.১৪৮

জিকরুল লিল আলামীন-বিশ্বজাহানের জন্য উপদেশ। এর চেয়ে বড় বিশ্বজনীনতা আর কি হতে পারে। বস্তুত এখানেই ইসলামী মানবতার বিশ্বজনীনতা। ইসলামের আবেদন ও আহ্বান বিশ্বজনীন বলেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এক করে দেখেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সম্ভ্রান্ত সে যে সর্বাধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।[৫১৫]

এটা স্পষ্টভাবেই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক মানদণ্ডে সকল মানুষই এক। বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি, কিন্তু ভালো ও মন্দ কখনই এক হতে পারে না। মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে সততা এবং তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। তাকওয়া বলতে ব্যাপক অর্থে সকল ভালো কিছুকে বুঝায়। উপরের আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতিকে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা পরস্পর জানতে পারে, আল-কুরআনে বর্ণিত এ বিধিটি একটি নিয়ামত হিসেবে এসেছে যাতে মানব বৈচিত্র্য পূর্ণতা পেতে পারে বিভিন্ন ভাষা, গোত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্মিলনে। বিশ্বায়নের পরিভাষা চালুর প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম কতই না সুস্পষ্ট করে 'বিশ্বায়নের, ধারণা পেশ করেছে। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.) প্রকৃত পথে চিরন্তন অর্থে বাস্তবসম্মত এবং সার্বিক কল্যাণমুখী বিশ্বায়নের সফল প্রবর্তন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই কেবল তাঁকে মনোনীত করেছেন। মহানবী (সা.)তার গোটা জীবন মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য ব্যয় করেছেন। আজকের দিনেও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত পথেই কেবল বিশ্বায়নের সকল স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু সকল যুগ, দেশ, বর্ণ, ভাষার মূল হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারী, তাই মানুষ হিসেবে তারা সমান মর্যাদার অধিকারী। পরস্পরের পরিচয় জানার সুবিধার্থে তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

---

515 আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত: ১৩

উপসংহার

ইসলামে একমাত্র কালজয়ী ও সর্বজনীন আদর্শ। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পৃথিবীর যে কোনো জাতির মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। ইসলাম কোনো বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য নয়। সকল যুগ, দেশ, বর্ণ ও ভাষার লোকদের জন্য এর আবেদন ও আহ্বান সর্বকালীন।

বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন জোট ও সংস্থার আত্মপ্রকাশের ফলে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো প্রায় ১০টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মূলত, মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক যে সম্ভাবনা দেখা রয়েছে, নানা কারণে তাও বাস্তবায়িত হয় না। অতিরিক্ত পুঁজির অধিকারী ধনী মুসলিম দেশগুলো তাদের বাড়তি পুঁজি কখনো ওআইসিভুক্ত দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে না। তারা এই অতিরিক্ত মূলধন পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে বা সেখানকার ব্যাংকে জমা রাখে উচ্চ হারে সুদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর স্টক মার্কেটের অদক্ষতা এবং মুসলিম দেশসমূহের দুর্বল ব্যবস্থাপনা তাদের অনাগ্রহের কারণ। এ সকল ধনী দেশগুলো যদি নিজের উদ্যোগে অথবা ওআইসির মাধ্যমে দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর শেয়ার মার্কেটের ব্যবস্থাপনা ও ভিত্তি মজবুত করে গড়ে তোলে তাহলে অতিরিক্ত মুনাফা ও কাম্য নিরাপত্তার আশায় তাদেরকে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় না। বরং তাদের পুঁজি পাশ্চাত্যের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি মুনাফাবাহী হতে পারে।

ধনী মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ স্বল্পোন্নত মুসলিম দেশগুলোর পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব তাদের অতিরিক্ত পুঁজি দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ প্রদান করা। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ এবং পরিকল্পনার দ্বারা তাদের ইসলামী অভিন্ন বাজার গঠন, বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন, সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপ্রচলিত পণ্যের উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি, সম্পূরক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বেশি বেশি আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার করা প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র তুরস্ক, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে সফলতা অর্জন করলেও অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

বর্তমানে প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মূলধন ইসলামী ব্যাংকসমূহ হ্যান্ডেল করছে। আগামী কয়েক বছরেরর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিল ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এ

বিপুল পুঁজির যথার্থ বিনিয়োগের জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আরো সমন্বিত উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হলো ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তা ও অবিচলতা অবলম্বন করা। ইস্তিকামাত হচ্ছে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করা এবং আল্লাহর দ্বীন যেরূপ আছে তার ওপর পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস পোষণ করা এবং ধৈর্য্য সহকারে এর ওপর অটল থাকা। স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বীয় পরিমাপ, মুসলিম জাতির প্রকৃত মর্যাদা, তার শক্তির উৎস এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার মূলনীতি, মিশন ও বিশেষ কার্যকর প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনোরূপ আপোষ না করা। ষড়যন্ত্রমূলক বিশ্বায়নের মোকাবেলায় অবিচলতা হবে ইসলামী উম্মাহর কলা-কৌশলের প্রধান ভিত্তি। আর এর দাবি হচ্ছে, লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কোনো স্পষ্টতা ও অজ্ঞতা থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা দেখানো যাবে না। লক্ষ্য সর্বাবস্থায় সুস্পষ্ট হতে হবে, কোনো প্রকার অস্পষ্টতার অবকাশ থাকবে না।

দ্বিতীয়ত মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন করবেন। উদ্দেশের সঠিক উপলব্ধি, কর্মতৎপরতার পূর্ণ জ্ঞান, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিকল্পনা তৈরি করা, উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হাসিল করার কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ এবং গন্তব্যে পৌঁছার পর যত রকমের দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলোর পুরোপুরি জ্ঞান এবং কার্যত সেগুলো লাভ করে ও যথাসময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই হবে এক্ষেত্রে সমস্ত কর্মপ্রচেস্টার মূল চাবিকাঠি।

তৃতীয়ত, ব্যক্তি পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল অবস্থায় আদল ও ইহসানকে কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থত, ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কোনো অবস্থাতেই অমুসলিমদের হাতে দেয়া যাবে না। এর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিভাবে মুসলিম বিশ্বের হাতে রাখতে হবে। আর সফলতার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতের সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

এভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, ইসলাম প্রদত্ত নীতি ও দর্শন বিশ্বায়নের বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে এবং এ ব্যবস্থার সুনীতি, সদাচার, কল্যাণময়তা ও সর্বজনীনতার জন্য পৃথিবীর মানুষ সাধারণভাবে একেই গ্রহণ করবে। ফলে মহাবিশ্ব ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের অমিয় আদর্শে উদ্ভাসিত হবে। তখনই 'পৃথিবীর সকল আদর্শ ও দীনসমূহের উপর বিজয়ী হওয়ার যে লক্ষ্য নিয়ে

আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)কে ইসলামসহ প্রেরণ করেছেন' - সেই লক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন

অমীয়কুমার বাগচী, 'ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন, বিপন্ন গনতন্ত্র', সম্পাদনা গ্রন্থ wekvqb fvebv-' fvebv, wØZxq LÐ, কলিকাতাঃ ন্যাশনাল বুক কোম্পানী এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর, ২০০৮

আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইবন উমার আল-জামাখশারী, Avj-Kvkkvd Avb nvKwqwKj MvIqwgwRZ Zvbhxj Iqv Dqbj AvKvexj dx DRwnZ Zvõexj, (মিশরঃ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড

আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, তাফসীর-ই- কাবীর, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি

আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, Avj-RwgÔ Avm-mnxn Avj-gmbv' wgb Dgwi ivmj mvjøvjøvû ÔAvjvBwn Iqvmvjøvg wgb mbwbwn Iqv AvBqwgwn, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ১মখণ্ড

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, mnxn gmwjg, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি, খণ্ড-১,

আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি, Rv‡g AvZ-wZiwgwh, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী, ১৪২১হি.

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশ, mbwwb Ave 'vD', দারুল ফিক্‌র, তাবি

আবূ আব্দিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল, gmbv' Avng', কায়রো : মুয়াস্‌সাসাতু কুরতুবা, তাবি

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ, Avm-mbvb, দারুল ফিকর, বৈরুত, তাবি

আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুআইব আন-নাসাঈ, Avm-mbvb, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ১৯৮৫)

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ 'আব্দির রহমান আদ-দারিমী, Avm-mbvb, দারুল্ কিতাবিল আরাবী : বৈরুত, ১৪০৭

আফীফ আবুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, i/ûÏxb Avj-Bmjvgx, (লেবানন, বৈরুতঃ দারুল ই'ল্ম লিলমালাইন, ১৯৮৫ খ্রি.)

আশ-শাইখ মুস্তফা আব্দুর রাজ্জাক এর গবেষণা প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, (রিয়াদঃ দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়াহ, তারীখ বিহীন)

আল-রাগিব, Avj-gdiv'vZ©, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি

আবু আব্দুল্লাহ আল হাকিম, আল নিশাপুরী Avj gmZv'ivK ©Avjvm mnxnvBb, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

আবদে সাঈদ ও আবদে ইসমাঈল, আল-আওলামাহ ওয়াল আলম আল-ইসলামী : আরকাম ওয়া হাকায়েক, মিশরঃ মাকতাবাতুল ইহসান, ১৯৮৯

আমীর খসরু, 'বিশ্বায়ন ও উদার গণতন্ত্র' রতনধনু ঘোষ সম্পাদিত eûgwÎK wekvqb, ঢাকাঃ গ্রন্থ কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

আবুল কাশেম ফজলুল হক, RvZxqZvev' AvšÍRwZKZvev' wekvqb I fwel¨r, ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশন, ২০১৪

আবদুল মোবারক শিকদার, A_%bwZK wekvqb I evsjv‡'k, ঢাকাঃ সুবচন, ২০০৯

আব্দুল মোতালেব সরকার (সম্পাদিত), AvšÍRwZK m¤úK, ঢাকাঃ অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স, ২০১২

আবুল বারাকাত, 'বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশ', evsjv‡'k A_bxwZ mwgwZ mvgwqKx 2004, ঢাকাঃ ডিসেম্বর ২০০৪

আলী ইজ্জত, Avj-Bmjvg evBbvk-kviK Iqvj Mvie, বৈরুতঃ তুরাসুল আরাবিয়া আল ইসলাম, তাবি

আবেদা সুরতানা, 'বিশ্বায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারী; পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

আবুল বারাকাত (ও অন্যান্য), 'বিশ্বায়ন ও নারী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,' evsjv‡'k bvix cMwZ msN, ঢাকাঃ ফেব্রয়ারি, ২০০২

আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন (ড.), Avj-Kvjvg AvKv‡q‡' Bmjvgx, ঢাকাঃ অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৯

আহমাদ আইয়ূব সোলায়মান (ড.), ms¯wZi wekvqb I evsjv‡'k, ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশন, ২০০৯

আল-গাযযালী (ইমাম), এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ মওলানা মহিউদ্দীন খান, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০২

আব্দুল লতিফ মাসুম, 'সুনাগরিক ও আগামী প্রজন্মের দুর্ত্তায়ন' %'wbK bqv w'MšÍ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আহমাদ সাজ্জাদ, hvKvZ : bZb wekve¨e¯vi Av‡jv‡K, ঢাকাঃ দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৫

আহমদ মোস্তফা ওমর (ড.), Avj-g¯ÍvKwejj Avivex, (রিয়াদঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.)

ইউছুফ হামেদ আল-আলেম (ড.), Avj-gmwjnvZj ÔAv¤§v wjk kixAwZj Bmjwgqv, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি

ইবনু মানযুর, wjmvbj Avive, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি, ১২ খণ্ড

ইযযত সাইয়্যেদ আহমদ (ড.), Avj-wnhviæ gvhwqwgj AvIjvgvn, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)

ইবন তাইমিয়া, BKwZhvDm-wmiwZj g¯ÍvKxg, (বৈরূতঃ দারু আলিমুল কুতুব, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ খণ্ড

ইয়াসির নাদীম, wekvqb mv¤vR¨ev‡`I bZb ÷¨v‡UwR, (ঢাকাঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৮ খ্রি.)

ইকবাল কবীর মোহন, gmwjg we‡k AvMvmb, ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন, ২০০২

ইকবাল কবীর মোহন, †`‡k †`‡k gmwjg RwZqZvev`, ঢাকাঃ ইকরা ফাউন্ডেশন, ২০০৯

ইউসূফ আল কারযাভী (ড.), Bmjv‡gi hvKvZ weavb, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রাহীম, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম খণ্ড, ২০০০ ইং)

এমাজউদ্দীন আহমদ (ড.), ‘সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন’, ‰`wbK mgKvj, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

এমাজউদ্দীন আহমদ (ড.), ‘সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন’, ‰`wbK hMvšÍi, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

এ.কে এম সালাহউদ্দিন, ‘বিশ্বায়ন আতঙ্ক; বিশ্ব সমস্যার সমাধান ও জটিলতা’, মাসুদুজ্জামান ও এস.আমিনুল ইসলাম, Ôwekvqb cwi‡cwÿZ mgvRweÁvb, রতনতনু ঘোষ সম্পাদিত বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, ঢাকাঃগ্রন্থ কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

খুরশীদ আহমদ (অধ্যাপক), Av‡gwiKvi AvMvmb gmwjg D¤§vni Kg‡KŠkj, ঢাকাঃ ইসলামী ল’ রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, মে ২০০৩

জামাল ক্বান্নান (ড.), মাসিক-আল মুস্তাকবিলুল আরাবী, wbhvgb Avjwgqb Avg mvqZvivZb G‡¯Ígwiqvb RvZx`vZb, সংখ্যা-১৮০ ফেব্রো-১৯৯৪

জয়নাল আবেদিন (ড.), ‘ইকলবালের রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বায়ন’, ‰`wbK bqv w`MšÍ, ১৪ আগস্ট ২০০৭

জয়নাল আবেদিন (ড.), ‘জামালুদ্দীন আফগানী ও তার প্যান ইসলামিক মতবাদ’, ˆ`wbK bqv w`MšÍ, ২০ আগস্ট ২০০৭

জগলুল আলম, পেরেস্ত্রোয়িকা, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯

দেবাশিষ চক্রবর্তী, ivóweÁvb ZË¡ I cwZôvb, কলিকাতাঃ নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সী (প্রা) লিমিটেড, ১৯৯৭

দাউদ হায়দার, 'অভিবাসী ও মানবিকতা এবং রাজনীতি', ‰'wbK mgKvj, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

নাসিরুদ্দীন আলবানী, gvRgD gAvjøvdwZj Avjevbx, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ১৯৮৯)

নাজির আহমদ ও রুহুল আমিন, gmwjg ms¯‹…wZi BwZnvm, ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯

ফেরদাউস হোসেন সম্পাদিত wekvqb msKU I m¤¢vebv, ঢাকাঃ মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, নভেম্বর,২০১২

বিশ্বজিৎ ঘোষ রায়, 'বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ', রতনধনু ঘোষ সম্পাদিতগ্রন্থ eûgwÎK wekvqb ২য় খণ্ড, ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ১৯৯৯

বিবেক দেব রায়, "বৈষম্যই স্বাভাবিক, জোর করে সাম্যবাদ আনার দরকার নেই" †'k, কলিকাতাঃ ২৫ নভেম্বর ২০০০

বন্দনা শিবা, 'বিশ্বায়ন এবং পরিবেশ', রতনধনু সম্পাদিতগ্রন্থ eûgwÎK wekvqb, ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

মোঃ রেজাউল করিম (ড.), Bmjvg I AvaywbK wek, ঢাকাঃ সুচয়ন, ২০০৮

মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ˆ'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০

মুহাম্মদ আবদুর রহীম (মাওলানা), wk¶v-mwnZ¨ I ms¯‹…wZ, খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, Bmjvg wk¶v I ms¯‹…wZ, ঢাকাঃ সোনালী সোপান, ঢাকা, ১৯৯৫

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, BKev‡ji ivR‰bwZK 'kb, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৯

মুহাম্মদ এনামুল হক (ডক্টর) ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪ইং

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ (ড.), Av'Øxb, (মিশরঃ আসসায়াদাঃ ১৩৮৯ হিজরী)

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (ড.), মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, gmwjg e¨w³MZ AvBb (ঢাকাঃ পানকৌড়ি প্রকাশন, তা.বি.)

মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-মাবরুক, Avj-Avlj vgv Iqvj Bmjvg, (মিশরঃ মাকতাবাতুল ইহসান, ১৯৯৯ খ্রি.)

মুহাম্মদ তকী উসমানী, Bmjvg Avli-Rv'x'-gvqxkvZ Iqv wZRviZ, লাহোরঃ ২০০১

মোহাম্মদ আবদুল হাই, 'বিশ্বায়ন যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন সম্পাদিত গ্রন্থ wekvqb : msKU I m¤¢vebv, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ২০১২

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, Avgv‡`i ms¯‹wZ: wePvh welq I P¨v‡jÄmgn, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০১

মাসুম মুতাসিম বিল্লাহ, nv`x‡mi Av‡jv‡K be¨ RvwnwjqvZ, চট্টগ্রামঃ রাহবার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬

মুহাম্মদ কুতুব, wesk kZvãxi RvwnwjqvZ, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪

মো. আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া (ড.), wekvqb, ঢাকাঃ আনন্দ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৫

মিখাইল এস, গর্বাচভ, †c‡i‡¯¿vqKv: wØZxq iæk wecøe, মিউনিখঃ ডিটিভি, ১৯৮৭

মো. শামীম আহসান, KUbxwZ‡KvI, ঢাকাঃ এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০১৪

মঞ্জুর মোর্শেদ (ড.), evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK A_bxwZ, ঢাকাঃ আনন্দ প্রকাশন, আগস্ট ২০১৫

মো. আব্দুল হালিম, Vv÷v h‡×vËi Avš—ÍRvwZK m¤úú‡Ki BwZnvm ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ডিসেম্বর, ২০১১

রাগিব আলী, Avm-mvKvdvn, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী,১৯৯৬,২য় সংস্করণ)

শাফেয়ী (ইমাম), Avi-wimvjv, (বৈরূতঃ দারুর ফিকর, তা.বি.)

শিবলী নু'মানী, mxivZbex (mv.), (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তা.বি.), ৪খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡KvI, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২) ৫খণ্ড

সাইয়েদ আস-সাবিক, wdKûm-mbvn, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ২৫ তম সংস্করণ. ১৯৮৫)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত Bmjvgx wek‡KvI, ২১শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯৯

সালেহ আর-রাকাব (ড.), Avj-AvIjvgvn, (দিল্লিঃ দারুল হাদীস, তা.বি.)

সরদার সৈয়দ আহমদ, 'বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি' evsjv‡`‡ki A_bxwZ mwgwZ mvgwqKx, ২০০৭ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, ডিসেম্বর,২০০৭

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ড.), 'বিশ্বায়ন নাকি আন্তর্জাতিকতা' ‰`wbK bqv w`MšÍ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, wekvqb bwK Avš—ÍRvwZKZv, দৈনিক আমার দেশ, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আহসান আলী, m‘, cwRev‘ I cwðgv wek, ঢাকাঃ টাউন লাইব্রেরি, জুন ১৯৯৬

সোহরাব উদ্দীন, gmwjg we‡ki BwZnvm, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬

সেলিনা জাহান, ami i g‡¯w, কলিকাতাঃ ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭

হাম্মাদ আল-জুহানী, Avj-AvIjvgvn Iqv ZvQxiænv-Avjvj-Avjg-Avj-Bmjvgx, পাক্ষিক আর-রায়েদ, (লক্ষ্ণৌ), সংখ্যা যিলহজ্জ-১৪১৯ হি.

হাসান হানাফী ও সাদেক জালালুল আযম, Avj AvIjvgvn, (করাচীঃ কুতুব খানাহ, তা.বি.)

হাসান জামান (ড.), mvs¯‹wZK wekvqb, ঢাকাঃ নোভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭

হাসান মতিউর রহমান, wekvq‡bi A_bwZ I gmwjg wek, ঢাকাঃ ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, মার্চ ২০০২

হায়দার আকবর খান রনো, cwRev‡`i gZ¨NÈv, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১

A. A. Memeco, *Communicating for Development,* New York: 1994

Andrew A. Michta, *The Government and Politics of Postcommunist Europe,* London: Praeger, 1994

Antonio Gramsci, *Selections from Political Witngs* (1921-1926), ed By Quintin Hoare, London, 1978

Andrenic Migraniyan, *Gorbachevs Leadership : A Soviet View,* Heuweet & Winston: 2009

Adam Smith, *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations,* Oxford University Press 1976; World Bank Debt Tables: External Finance for Developing Countries, World Bank Washington, 1994

Arabinda Singhal, *India's Communication Revolution,* Delho: Gupta Publications, 2008

Ambarto Eco, *The multiplication of the media,* London: 1986

Antony Smith, *The Geopolitics of Information,* Oxford University Press: 2002

Alice Amsden, *Asia's Next Giant: South and Late Industrialization,* Oxford University Press, New York, 1989; Sahamat, *Culture and Globalization,* Safder Hasmi memorial Lectural Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1990

A. Zaki Badawi (Dr.), *A Dictionary of the Social Sciences, English-Franch-Arabic,* Bairut: Librairie Du Liban, 1978

Atef Suhain Siddiqi, *Questions in Crisis,* Lahore: Al-Kitab, 1999

Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939,* London: Oxford University Press, 1970

Ash Narayan Roy, *The Third World in the Age of Globalization,* Delhi: Maddhom Books & London-New York: Zed Books, 2000

Buzan Barry, *An Introduction Relations,* London: Macmillan, 1987

David Felix, *Asia and Crisis of Financial Globalization,* Cambridge University Press, 1998

Edward S. Harman, *The Threde of Globalization,* from new Politics, vol. 7 no. 2, new series, whole no. 26, winter 1999

Earle Edward Mead (ed). *Makers of Modern Strategy? Military Thought from Machiavelli to Hitler,* Princeton University Press, Princetion, 1960

Ellen Wood, *Globalization or Globaloneny?* Cambridge University Press, 1997

Emanuel Walarstin, *The Oxford Companion to Politics of the World,* Oxford: 1997

Frasoan Huter, *The Globalization of Resistence : The Social Dimention,* London: 1998

Fransisco Alberni, *Movement and Institution,* Menila: 2008

Garry Day, Quted in Eric Thor becke, *The Tendency Towards* Gilbart Achcer, *The Globalization of Rezistance: The Militarization of the World and the New Conditions for Peace,* London: 2003

Gordon B. Smith, *Soviet Politics: Struggling with change,* New York. St. Martin's Press, 1992

Harold Innis, *World Politics : Today and Tommorow,* Manchester: Robson & Sons, 2002

Jhaon E. Spero and Jeffrey A. Hart, *The Politics of International Economic Relation,* New York. 1997

John Ravenhill, *Global Political Economy,* Oxford University Press, 2007

J. Keri, Communication as Culture: Essays on Media and Society, New York: 1998

Jonathon Freedman, *Globalization : New World Conception,* London: 2012

Jan Pul Sattro and Sree Nibash Melkott, *Communication for Development in the Third World,* London: 1998

Jems Yall, *Political System of the World*, London: Hudson Pulications, 2011

John Thomson, *Realization of Globalization*, London: Books Harber, 2001

James Foreman-Peck, *Historical Foundations of Globalization,* UK/USA: Edward Dlgar Publishing Limited, 1998

Jems Yall, *Media, Communication and Culture*, Global Aproch Polity Press:2001

John B. Thomson, *The Media and Modernity – A Global Theory of Media*, London: Polity Press, 2000

Jonathon Freedman, *Cultural Identity and Global Prosess,* Manila: Milinium Books, 2009

K. Stade, *Maneging Development : State, Society and International Context,* New Bari Park: Sege, 2000

Karl Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie,* Europaeische Verlasanstalt, Frankfurt/Europa Verlag, Vienna, 1941

Karl Marx, *Das Kapital,* MEW Marx/Engels Collected Works in German Language, vol. 23, Dietz Verlag, Berlin: 1988

Khurshid Ahmed (Dr.), 'Why Global Capitalism Why not pluralist economy' *Impact International,* Jan-February, 2004

Kenechi Omae, *The End of the Nation States : The Rise of Regional Economy,* New York: Harper Leans Publishers, 2002

M. Walckot, *Globalization and Third World,* Oxford Press, May 2002

Mahbub ul Haq, *The Poverty Curtain: Choices for the Third World,* NewYork, 1976

Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid*, A Modern Arabic English Dictionary, Dar-El-Ilm-Lil-Malayen, Bairut, 1985

Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,* Lahore:S.M Ashraf, 1944

Murad Mahfuz, 'Westernism, Islam and Muslim World : A Critical Study', *Al-Islam*, Issu-32, April-June 2002

Nikki R. Keddie, *An Islamic Response to Imperialism: Political and Religous Writings of Sayyed Jamal ad din ad-Afghani*, Berkeley: University of California Press, 1983

Noam Chomsky, *Deterring Democracy, Verso, Third World, United States Foreign Policy 1945-1980,* New York: Pantheon, 1980

'O Sulivan, Key Concept of Mass Communication, Manchashter University Press: 1998

Philip Trueman, N*ew York Times,* 4 August 1999

Philip G. Cerny, "*Globalization and the changing Logic of Collective Action",* International Organization, Vol. 49, No. 5, 1995

Patricia Adams and Lorence Solomon, *Globalization : The Ultimate Futer of the World,* London: 2011

Patricia Adams and Lorence Solomon, *In the May of Progress : The Underside of Foreign Aid,* London: Arthscan Publications 1991

Paul Hirst and Grahame Thomson, *Globalization in Question. The Internaitonal Economy and the Possibilities of Governance,* Cambridge/Malden: Polity Press, 1998

Paul Cammack, David Pool and William Todorffl. *Third World Politics: A Comparative Introduction,* London: MacMillan Press, 1993

R. Milner, *Globalization and Territorial Identities,* ed Avebury: Aldershot, 1992

Ray Cline, *World Power Assessment,* Boulder, Westview Press, 1980; *The World Fact Book*, 1988, Washington D.C, Central Intelligence Agency, 1988

Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues,* University Press Limited, Dhaka, 1993

Ray Maghroori, *Introduction: Major Debates in International Relations,* Ray Maghroori and Bennett Ramberg (ed). Clobalism Versus Realism, Colorado, Westview Press, 1982

Roland Robertson, 'After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization,' in Bryan S. Turner (ed), Theories of modernity and Postmodernity, London/ thousand Oaks/New Delhi s: SAGE Publications

Rawland Lorimar, *Mass Communication,* Manchashter University Press: 1998

Remond Williums, *Technologicla Determinism,* London: MacMillan & Co, 1975

Rzen al-Mahdi, *Philosophy of Moududi : Modernization of Islam,* London: IRA, 1996

Regionalization in International Trade, 1928-1956 The Hague : Martinus Nijhoff, 1960

Sreenibash Melcot & Lesly Stivs, *Communication for Development in the Third World,* London: Sage Publications, 1998

Sirajus Salekin, 'Globalization : Perspective Aisa', *The Times of India,* 23 Nov. 99

Shamloo, ed., *Speeches and Statements of Iqbal,* Lahore: Al_Manar Academy, 1949

Sharif al Mujahid, "Muslim Nationalism: Iqbal's Synathesis of Pan-Islamism and Nationalism", *Ameridcan Journal of Islamic Social Sciences,* vol.2,no.1, July 1985

Samir Amin, *The Globalization of Rezistance: The State of Stragals in the World*, London 2003

The World Trade Organizaiton Mellenium Round, Free Trade in the Twenty First Centry, Klaus Gnter Deutsch & Bernhard Speyer lan Livingstone, Development Economic and Policy Readings, London, 1981

Vinod K. Aggarwal, *Debt Games: Strategic Interaction in International Debt Rescheduling,* New Your, 1996

World Development Report, 1995, World Bank, Washington D.C. 1995, *Der Fishcher Weltalmanch,* 1999, Frankfurt am Main, 1998

Zafar Ishaq Masri, "Iqbal and Natonalism," *Iqbal Review,* April, 1961

Zurgen Hebarmas, The Stractural Transformetion of the Public Reaction, Downing: Becon Press, 2002